মাসুদ রানা

অন্তর্যামী

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ

ইসমাইল আরমান

সেবা প্রকাশনী



মাসুদ রানা

অন্তর্যামী

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী: ইসমাইল আরমান

মেয়েটাকে দেখে চমকে উঠল রানা।
ঠিক যেন লুবনা... লুবনা আভান্তি!
ইটালিয়ান সেই মিষ্টি কিশোরী,
যে রানার মন জয় করে নিয়েছিল...
যে ওকে একটা গান উপহার দিয়েছিল...
যাকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল রানা।
সেই কষ্ট আজও তাড়া করে ফেরে ওকে।
লুবনার মত এ-মেয়েটিও বিপন্ন।
নিষ্ঠুর একদল খুনি তাড়া করছে তাকে,
ছুটতে ছুটতে রাতদুপুরে রানার বুকে
আছড়ে পড়েছে সে।
এরপর কি আর চুপ করে থাকা যায়?
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রানা।
জড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর বিপদে।

সেবা প্রকাশনী



মাসুদ রানা ৪৫৯

অন্তর্যামী

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

ইসমাইল আরমান



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7459-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৯
রচনা: বিদেশি কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে কোলাজ
ইসমাইল আরমান
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-459
AUNTORYAMI
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Ismail Arman

একশ' আটত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆

কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির ◆ কালো কুয়াশা ◆ ধর্মগুরু ◆ নরপশু ◆ দুরাত্মা ◆ টপ টেরর ◆ গুপ্তবিদ্যা ◆ মহাপ্লাবন ◆ অন্তর্যামী ।

মাসুদ রানা – ৪৫৯

অন্তর্যামী

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগীঃ ইসমাইল আরমান

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— **লেখক**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় মাসুদ রানা। কোনও অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হলে যখন ক'টা দিন ছুটি পেয়ে অলস সময় কাটায়, কিংবা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়; মাথায় তখন ভিড় করে আসে কত কথা, কত স্মৃতি। চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে হতাশায় ভারাক্রান্ত হয় ও, কোনও কিছুরই অর্থ বোঝা যায় না—কী পেল, কী হারাল সবই ঘোলাটে লাগে। আর দশজন মানুষের মত নিরুপদ্রব একটা জীবন, আর সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা সংসারের স্বপ্ন তো ও-ও দেখেছে। কিন্তু তা আর হলো কই? দেশ সেবার নেশায় কোথায় ভেসে গেছে সব স্বপ্ন! কত কিছু যে বিসর্জন দিতে হয়েছে ওকে, হারাতে হয়েছে কত শত প্রিয় বন্ধু, আপনজনকে। সে সব মনে হলে অসহ্য বেদনায় দিশেহারা বোধ করে ও।

এখন তেমনই একটা পর্ব চলছে।

শেষ মিশনটায় মরতে বসেছিল ও, দীর্ঘদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছে। অবশেষে শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেও ডাক্তার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, মানসিক ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্যে হাওয়া বদল করতে হবে। সব ধরনের কাজকর্মে বিরতি দিয়ে অন্তত মাসদুয়েক নির্জন, নির্মল, শান্ত পরিবেশে নিতে হবে পূর্ণ বিশ্রাম। এড়িয়ে চলতে হবে

পরিচিত মানুষের সঙ্গ। অগত্যা প্রশান্ত মহাসাগরের পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট শহর *এল্ সেডেরো*-র এক হলিডে রিসোর্টে এসে উঠেছে ও। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল ওর, ছাড়া পাবার পর দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয়নি। তা ছাড়া মেডিকেল চেকআপের জন্যে প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দূর থেকে বার বার আসা-যাওয়া কঠিন। অগত্যা এল্ সেডেরোই ভরসা।

রিসোর্টে আজ রানার সতেরোতম দিন। রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে। শরীর পুরোপুরি সুস্থ, এ-অবস্থায় কাঁহাতক আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়? দিনভর বইপত্র পড়া, ঘুরে বেড়ানো আর অল্প-স্বল্প ইনডোর গেমস্ ছাড়া করবার কিছু নেই। ফলে, হাতে অফুরান অলস সময়। যথারীতি মাথায় ভিড় জমাচ্ছে নানান রকম চিন্তা। আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ছে ও।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। ঘড়ি যখন তিনটে বাজার সঙ্কেত দিল, দুত্তোর বলে উঠে পড়ল ও। অযথা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার কোনও মানে হয় না। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল রানা কটেজ থেকে। জগিং করতে শুরু করল সাগরপারের বোর্ডওয়াকে, খোলা বাতাসে মাথাটা পরিষ্কার করে নেবার ইচ্ছে।

হিম হিম কুয়াশা জড়িয়ে ধরল রানাকে, বামে ঘোলাটে দেখাচ্ছে শহরের আলো, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে—যেন কুয়াশা কেটে ভেসে চলেছে একটা জাহাজ। ডানে প্রশান্ত মহাসাগর—কালচে দেখাচ্ছে পানি, ঢেউ আছড়ে পড়ছে বিরান সৈকতে। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও, নিথর হয়ে আছে বিশ্বচরাচর। বোর্ডওয়াকের পুরনো কাঠের পাটাতন মচমচ করছে রানার প্রতিটি পদক্ষেপে, এ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

দৌড়াতে দৌড়াতে বোর্ডওয়াকের একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল ও। সৈকত ঘেঁষে এগিয়েছে একটা শাখা, অন্যটা চলে গেছে মেইন রোডের দিকে। এখান থেকে রাস্তাটা মাইলখানেক দূরে। গতি কমাতে কমাতে থেমে গেল রানা। জায়গাটায় পৌঁছুলে প্রতিবারই থামে। কেন, তা বলতে পারবে না। ইন্টারসেকশনটা একেবারে নির্জন, একটু বেশিই ছায়ায় ঢাকা। হয়তো বা সেই শূন্যতাই আকৃষ্ট করে ওকে।

কাঠের রেলিঙে কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল রানা, সাগরের দিকে মুখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে শুনতে পেল নানা ধরনের চাপা শব্দ—বালিয়াড়ির ওপারে রাস্তায় টায়ারের ঘর্ষণ, ঝোপঝাড়ে সরীসৃপের নড়াচড়া, ঢেউয়ের চাপা গর্জন। কয়েক মিনিট পেরোলে নতুন আরেকটা আওয়াজ এল কানে। পায়ের শব্দ... বোর্ডওয়াকের ওপর দিয়ে এদিকে দৌড়ে আসছে কেউ।

আরেকজন জগার? এক মুহূর্তের মাথায় বুঝল, না, তা নয়। বড় দ্রুত ফেলছে পা, যেন প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে মানুষটা। কুয়াশায় দৃষ্টিসীমা সংকুচিত, ভারী বাতাসে পদশব্দও ভোঁতা শোনাচ্ছে। বোঝা মুশকিল, কোন্‌দিক থেকে আসছে শব্দটা। ডানে-বাঁয়ে ইতি-উতি তাকাল রানা, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। উল্টো ঘুরতেই ইনল্যাণ্ডের দিকে চলে যাওয়া শাখাটা ধরে একটা ছায়ামূর্তি উড়ে চলে এল ওর দিকে, আছড়ে পড়ল বুকে।

আঁতকে ওঠার আওয়াজ শুনল রানা—অল্পবয়েসী মেয়ের কণ্ঠ। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল রানা। পরক্ষণে টের পেল, ওর আলিঙ্গনের ভেতর যুদ্ধ করছে মেয়েটা। মোচড়ামুচড়ি করে ছাড়া পেতে চাইছে। ফাঁদে পড়া প্রাণীর মত আচরণ।

'শান্ত হও,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। কী হয়েছে?'

লড়াই থামাল মেয়েটা। মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল রানার। মেয়েটার সঙ্গে লুবনার চেহারার অদ্ভুত মিল! লুবনা আভান্তি—ইটালিয়ান সেই মিষ্টি কিশোরী... রানাকে একটা গান উপহার দিয়েছিল, ওকে নতুন করে জীবনের অর্থ শিখিয়েছিল। ওকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল রানা, বাঁচাতে পারেনি মানুষরূপী একদল পশুর হাত থেকে। এখনও সে-ব্যর্থতার কষ্টে ক্ষত-বিক্ষত হয় ও। কয়েক ঘণ্টা আগেও বিছানায় নির্ঘুম শুয়ে লুবনার কথা ভাবছিল রানা... এটা কি তবে ভাগ্যের পরিহাস, নাকি নিছক কাকতালীয় ঘটনা যে, লুবনার মত দেখতে একটি মেয়ে ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে?

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বয়স বারো-তেরোর বেশি হবে না। পরনে জিন্স আর টি-শার্ট। গোলগাল মুখ, চেহারায় রাজ্যের সরলতা। মাথার ঘন কালো কেশ এলোমেলো হয়ে আছে, আয়তাকার চোখদুটোয় বাসা বেঁধেছে ভয়। দৃষ্টি দিয়ে মাপল রানাকে, তারপরেই তার আড়ষ্ট ভঙ্গিটা শিথিল হলো। এখনও আতঙ্কিত, তবে রানার কারণে নয়। ছাড়া পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনে। রানাও তাকাল, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু দেখল না। বোর্ডওয়াক ওদিকে হারবার রোডে গিয়ে মিশেছে, দু'পাশে উঁচু বালিয়াড়ি আর ঝোপঝাড়—কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। সব শান্ত, চুপচাপ।

'তুমি এদিকেই থাকো?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা, 'কে ধাওয়া করছে তোমাকে?'

'সব বলব, তবে এখন না।' আকুতি ফুটল মেয়েটির কণ্ঠে। 'প্লিজ, আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে। কোথাও লুকাতে হবে আমাকে!'

‘তোমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু...’

‘না-আ!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। ‘পুলিশের কাছে না।’

ভ্রূকুটি করল রানা। বুঝতে পারছে, বাজে ধরনের একটা ঝামেলা উদয় হয়েছে সামনে। ঝামেলাটা এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু মনের সায় পেল না।

রানাকে দ্বিধা করতে দেখে এগিয়ে এল মেয়েটি, চেপে ধরল ওর হাত। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে অনুনয়। ‘আমি পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে আসিনি। বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা সে-রকম নয়।’

ঝট্ করে আবার পেছনে তাকাল সে। রানা চোখের কোণেও ধরা পড়েছে কীসের যেন আভাস। ও-ও তাকাল। এতক্ষণ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে ছিল বালিয়াড়ির সারি, কিন্তু এখন ওগুলোর পেছন থেকে ভেসে আসছে আবছা আলোর আভা।

কেঁপে উঠল মেয়েটা। বলল, ‘কী করবে, বলো। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।’

ওর কণ্ঠে মেশা আতঙ্কটা পরিষ্কার টের পেল রানা। ছোটখাট বিপদ নয়, এই মেয়ে প্রাণভয়ে ভীত।

আবারও বালিয়াড়ির দিকে তাকাল রানা। আলোর আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো! বালিয়াড়ির ওপাশ থেকে উঠে আসছে কারা যেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল... রানা বুঝল, মিথ্যে বলছে না এই মেয়ে, সত্যিই বড় ধরনের বিপদে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত লাগল না, কারণ অসহায় একটা মেয়েকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। নাক গলাতেই হচ্ছে।

মেয়েটির হাত ধরল রানা। বলল, ‘এসো।’

বোর্ডওয়াক ধরে ছুটতে শুরু করল দু’জনে, রিসোর্টের দিকে চলেছে। দৌড়াবার গতি সামান্য কমাতে হলো রানাকে,

মেয়েটা যেন ওর সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। দৌড়ের ফাঁকে বালিয়াড়ির দিকে একটা চোখ রাখল ও। পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই ফ্ল্যাশলাইটের তীক্ষ্ণ এক শিখা দেখতে পেল, রিজের ওপরে উঠে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মাঝে ওটার সঙ্গে যোগ দিল আরও তিনটে। খুব বেশি দূরে নয় লোকগুলো।

ঠিক সামনেই একটা ওভারহেড মারকারি লাইট। থেমে গেল রানা, টান দিয়ে থামাল সঙ্গিনীকে।

'কী হলো, থামলে কেন?' ভয়ার্ত গলায় বলল মেয়েটা।

লাইটটার দিকে ইশারা করল রানা। 'বাতির তলা দিয়ে গেলে ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলবে।'

'তাই বলে এখানে দাঁড়িয়েও তো থাকা যায় না।'

পেছনটা দেখল রানা। দলে আরও ভারী হয়েছে ধাওয়াকারীরা। মোট ছ'টা ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচানাচি করে নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। মাথা ঘুরিয়ে রেলিঙের ওপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল এবার। কয়েক ফুট নিচে সৈকত—যাবার মত জায়গা এখন ওই একটাই।

নিজের অজান্তে ইশারা দিয়েছে কি না জানে না, মেয়েটাকে রেলিঙের তলা গলে নেমে যেতে দেখল রানা। নিজেও পিছু নিল। নিচে বিছিয়ে রাখা পাথরসারির ওপর নেমে এল দু'জনে। সামনে বালিময় সৈকত, ত্রিশ গজ দূরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। সৈকতের বালি ভেজা, মসৃণ। নামলেই পায়ের ছাপ পড়বে, ধাওয়াকারীরা অনুসরণ করতে পারবে ওদেরকে।

কজওয়েরর নিচে বিছানো পাথরগুলোর দিকে নজর দিল রানা, কিন্তু ভরসা রাখতে পারল না। সমান করে বিছানো হয়নি পাথর—উঁচু-নিচু, নড়বড়ে... ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে বলে ঠিকমত দেখাও যাচ্ছে না। বেকায়দা পা পড়লে গোড়ালি মচকে যাবে নির্ঘাত। বাধা হিসেবে আরও আছে

একের পর এক সাপোর্ট বিম। দশ ফুট অন্তর অন্তর কজওয়ের পিলারগুলোর মাঝে ক্রসের মত করে বসানো হয়েছে ওগুলো, পুরো কাঠামোকে মজবুত করার জন্যে। বোঝা যাচ্ছে, পাথরের ওপর দিয়ে, সাপোর্ট বিম টপকে এগোনোর চেষ্টা বৃথা। দশ গজ যাবার আগেই ওদের ঘাড়ের ওপর এসে যাবে শত্রুরা।

মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিল রানা। বালিয়াড়ি থেকে নেমে এসেছে লোকগুলো, বোর্ডওয়াকে উঠবে এক্ষুনি। হাতে সময় আছে বড়জোর ত্রিশ সেকেণ্ড। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে কজওয়ের তলায় নজর বোলাল। মোটা মোটা কাঠের পিলারের ওপর বসানো হয়েছে পুরো কাঠামো। সেটা দেখতে অনেকটা শুইয়ে রাখা একটা মইয়ের মত—দু'পাশে লম্বা লম্বা বিম, মাঝে মইয়ের ধাপের মত আড়াআড়ি ছোট বিম। কাঠের পাটাতন বসানো হয়েছে লম্বা বিমগুলোর ওপর। ছোট বিম আর পাটাতনের মাঝে কয়েক ইঞ্চি ফাঁকা রয়েছে—কোনও মানুষের জায়গা হবে না, তবে হাত-পা ঢোকানো যাবে।

মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল ও। বলল, 'শক্ত করে ধরো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দু'পায়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল মেয়েটা, দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল গলা। ওকে নিয়ে কজওয়ের তলায় ঢুকে গেল রানা, লাফ দিয়ে একটা ছোট বিম ধরল, এরপর কসরৎ করে পা-দুটো তুলে গুঁজল আরেকটা বিমের ফাঁকে। হ্যামকের মত একটা আকৃতি পেল ওর দেহ—দুটো বিমের মাঝে ধনুকের মত ঝুলছে, তার ওপর উপুড় হয়ে আছে মেয়েটা।

কয়েক মুহূর্ত যেতেই রানা টের পেল, পজিশনটা মোটেই জুৎসই হয়নি। মোটা বিমটা মুঠো করে ধরা যাচ্ছে না, পুরো ভার পড়েছে আঙুলের ওপর। হাতের পেশিতে যেন আগুন

ধরে গেছে। শরীর সোজা রাখতেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। দ্রুততর হয়ে গেল শ্বাস-প্রশ্বাস।

ওর কানের কাছে মুখ নিল মেয়েটা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'শব্দ কোরো না। ওদের কাছে বন্দুক আছে... আমাদেরকে খুন করে ফেলবে।'

ক্ষণকাল পরেই পাটাতনের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলো। বোর্ডওয়াকে উঠে এসেছে লোকগুলো, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছে। কানে ভেসে এল তাদের পায়ের আওয়াজ।

একটা কণ্ঠ শোনা গেল। রুক্ষ, ভারী কণ্ঠ—আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

'সৈকতে সার্চ করো। কজওয়ের নিচেও দেখবে।'

ধুপধাপ শব্দ তুলে কয়েকজন নেমে এল নিচে। চোখের কোণে ফ্ল্যাশলাইটের আভা দেখল রানা, সার্চলাইটের মত সৈকতের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা, মুখ গুঁজল বুকে। হাতের পেশির জ্বালাপোড়া বেড়ে গেছে কয়েকগুণ, তবে সেটা মূল সমস্যা নয়। শারীরিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করবার অসংখ্য কায়দা জানা আছে রানার, সবক'টাই খাটাচ্ছে এখন। কিন্তু এভাবে অনন্তকাল চলতে পারে না। খুব শীঘ্রি হার মানবে ওর দেহ, মনের জোর দিয়ে হাতের মুঠো আটকে রাখা যায় না।

ঝুঁকি নিয়ে মাথা একটু কাত করল রানা। সৈকত দেখা শেষ হয়েছে লোকগুলোর। ফ্ল্যাশলাইটের আলো এবার ঘুরে যাচ্ছে এদিকে। আলো ফেলে কজওয়ের তলা দেখতে শুরু করল ওরা। মাথা সোজা করে ফেলল ও, যাতে আলোর আভায় চোখের মণি চকচক করে না ওঠে। ওদের ঠিক তলা দিয়ে ঘুরে গেল আলোকরশ্মি... কপাল ভাল যে, তলার পাথরের ওপর ফেলা হয়েছে আলো, দু-তিন ফুট উঁচু করলেই দেখে ফেলত ওদেরকে। এখনও সে-ভয় কাটেনি, দুরু দুরু

বুকে অপেক্ষা করতে থাকল রানা, এই বুঝি কেউ চেঁচিয়ে ওঠে ওদেরকে দেখতে পেয়েছে বলে।

চেঁচাল না কেউ।

তার বদলে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলো। অন্ধকার আবার গ্রাস করল ওদেরকে। মাথা ঘুরিয়ে শত্রুদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল রানা। উত্তরদিকে সরে গেছে লোকগুলো—বোর্ডওয়াকের উপর-নিচ দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। আর অপেক্ষা করা চলে না, এখুনি নেমে পড়ে অন্যদিকে পালানোর চেষ্টা করা উচিত। যত দেরি করবে, ততই বাড়বে হাত-পায়ের বাঁধন খসে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। শব্দ শুনে ছুটে আসবে লোকগুলো।

ধীরে ধীরে বিমের ফাঁক থেকে একটা পা বের করতে শুরু করল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে একটা শব্দ শুনে স্থির হয়ে গেল। পদশব্দ... দক্ষিণ দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। একেবারে রানার মাথার ওপরে এসে থামল। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে ঝুর ঝুর করে ওর মুখে খসে পড়ল কিছু বালি।

'শ্যাভেজ! শুনে যাও!' ডাকল লোকটা। ভারী কণ্ঠ—এ-ই লোকগুলোর লিডার। বাকিদের তল্লাশিতে পাঠিয়ে নিজে রয়ে গেছে বোর্ডওয়াকে।

সৈকত থেকে একজন উল্টো ঘুরল। ছুটে এল লিডারের কাছে। বালির ওপর নাচানাচি করছে তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কজওয়েের কিনারে এসে থামল সে, মাথা উঁচু করে তাকাল লিডারের দিকে। দম বন্ধ হয়ে এল রানার, একটু নিচু হলেই ওদেরকে দেখে ফেলবে লোকটা। লিডারের চোখ যেন ধাঁধিয়ে না যায়, সেজন্যে ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিয়েছে, নইলে সত্যি সত্যি দেখে ফেলত।

দেহের অবয়ব ছাড়া শ্যাভেজ নামের লোকটার চেহারার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। সাগর আর আকাশের

পটভূমিতে সে স্রেফ একটা ছায়ামূর্তি। ছিপছিপে দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে গাঢ় রঙের পোশাক। কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলছে—আকৃতি দেখে আন্দাজ করল রানা, এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান... ব্যারেলের ডগায় লাগানো হয়েছে হেভি সাউণ্ড সাপ্রেসর।

ওপরে, বোর্ডওয়াক থেকে কথা বলল লিডার। 'ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভ্যানে ফিরে যাও, বিশ মাইল রেডিয়াসে সব ধরনের পুলিশ চ্যানেল মনিটর করতে শুরু করো। ড্যানবারকে বলবে, এলাকায় যত পুলিশ অফিসার আর ফেডারেল এজেন্ট আছে, সবার পার্সোনাল ফোনে আড়ি পাততে। ওদের কথাবার্তার মাঝে যদি অল্পবয়েসী মেয়ে, কিডন্যাপিং বা সাইক ওয়ার্ড জাতীয় কোনও কথা শোনা যায়, তা হলে ডিটেইলস্ সংগ্রহ করতে হবে।'

'সাইক ওয়ার্ড?' দ্বিধা করল শ্যাভেজ। 'তোমার কি ধারণা, মেয়েটার কথা শুনে ওকে মানসিক রোগী মনে হতে পারে?'

হঠাৎ আঁতকে উঠল রানা, হাতের আঙুলগুলো পিছলাতে শুরু করেছে... বিমটা ধরে থাকতে পারছে না ও!

'সম্ভাবনা আছে,' বলল লিডার।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা, আঙুল দিয়ে খামচাতে চাইল কাঠের বিম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

'আর আমরা যদি ওকে খুঁজে না পাই?' জিজ্ঞেস করল শ্যাভেজ।

এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল লিডার। তারপর বলল, 'তা হলে ওর বদলে আমাদেরকেই কবরে যেতে হবে।'

হাল ছেড়ে দিল রানা পড়ে যাচ্ছে, ঠেকাবার উপায় নেই। পড়ার পর এক লাফে উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না, সেটা ভাবছে এখন। চমক সামলে ওঠার আগেই শ্যাভেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে হয়তো কিছু করা সম্ভব। নাহ্,

তাও লাভ নেই। বোর্ডওয়াকের ওপর লিডার দাঁড়িয়ে আছে, সে-ও নির্ঘাত সশস্ত্র। অথচ রানার কাছে কিচ্ছু নেই। অসহায়ভাবে গুলি খেয়ে মরতে হবে ওকে।

আচমকা নড়ে উঠল মেয়েটা। ওর শরীরের ওপর উঁচু হলো, তারপর হাত বাড়িয়ে বিমের ওপর দিয়ে চেপে ধরল রানার হাত। সামান্য ওটুকু চাপেই কাজ হয়ে গেল, পিছলানো বন্ধ হয়ে গেল আঙুলগুলোর। বিস্মিত হলো রানা—মেয়েটা বুঝল কী করে?

কথা শেষ হয়েছে শ্যাভেজের। ফ্ল্যাশলাইট কোমরে গুঁজে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বোর্ডওয়াকে। যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে তার চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নড়ল না লিডার। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়, তীক্ষ্ণ চোখে দৃষ্টি বোলাল পুরো সৈকতে। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল সে। হাঁটতে শুরু করল উত্তর দিকে। তল্লাশিরত সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দেবে।

লোকটার পদশব্দ ক্ষীণ হয়ে এলে নিচে নামল রানা। মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে পিলারে ঠেস দিল। হাঁপাচ্ছে, কাঁপছে সারা শরীর। আড়ষ্ট পেশিগুলোয় যেন আগুন ধরে গেছে, ধীরে ধীরে সাড়া ফিরছে হাতে-পায়ে। মেয়েটাকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দেখে নিজেও তাকাল। শত্রুরা একশো গজ দূরে সরে গেছে।

'ধন্যবাদ,' ভাঙা গলায় বলল মেয়েটা। গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো, কাঁদছে। 'অনেক উপকার করলে তুমি আমার।'

এক গাদা প্রশ্ন জমা হয়েছে রানার মনে, তবে সেগুলো পরে জিজ্ঞেস করা যাবে। ঘুরে সৈকতের উল্টো পাশটায় নজর বোলাল—নিরাপদে সরে যাবার পথ খুঁজছে। বোর্ডওয়াক আর হারবার রোডের মাঝখানটা যথেষ্ট অন্ধকার, গা-ঢাকা দিয়ে উঠে পড়তে পারবে রাস্তায়। এরপর ঘুরপথে

রিসোর্টে ফিরতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। ওর কটেজটা এখান থেকে মাত্র আধমাইল দূরে।

'এসো আমার সঙ্গে,' মেয়েটাকে বলল ও। এরপর দু'জনে এক ছুটে ঢুকে পড়ল বালিয়াড়ির গোড়ার ঘাস আর ঝোপঝাড়ের মাঝে।

দুই

সৈকত থেকে দু'মাইল দূরে যাবার আগে কথা বলল না কেউ। ততক্ষণে শহরের উত্তরে, পুরনো অংশটায় পৌঁছে গেছে ওরা। চোখ-কান খোলা রাখছে রানা, শ্যাভেজের সঙ্গে যেন দেখা হয়ে না যায়। ভ্যান নিয়ে লোকটা এদিকেই কোথাও আছে কি না কে জানে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে রাস্তাঘাট, কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না কোথাও। মনে হলো, এ-মুহূর্তে ওরা দু'জন ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই চরাচরে।

'ওরা কারা?' একসময় নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন তোমার পিছু নিয়েছে? তুমি কি ওদের কোনও অপকর্ম দেখে ফেলেছ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'জানি না।'

ভ্রূকুটি করল রানা। 'এতগুলো লোক তোমাকে ধাওয়া করছে... অথচ কেন করছে, তা তুমি জানো না?'

'ব্যাপারটা বেশ জটিল,' ইতস্তত করল মেয়েটা। 'শোনো, এখনও দেরি হয়নি, তুমি চাইলে এসবের সঙ্গে

নিজেকে না জড়ালেও পারো। এমনিতেই যা করেছ, তা যথেষ্ট...'

'তোমাকে একা ছাড়ছি না আমি,' ওকে বাধা দিল রানা। 'তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমার।'

কথাটা বলে নিজেই অবাক হলো। চেনে না, জানে না... এমন একটা মেয়েকে রক্ষার কথা কেন বলতে গেল? একটু ভাবতেই টের পেল, অবচেতন মনে সিদ্ধান্তটা অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে—মেয়েটার সঙ্গে লুবনার মিল দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে। লুবনাকে ও বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু একে বাঁচাবে... অতীতের ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করবে। যেমন করে হোক।

মেয়েটাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল খানিক পর। জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চাও?'

'পুলিশের কাছে যাবে? আর যা-ই করুক, পুলিশ স্টেশনে হামলা করার সাহস পাবে না ওরা।'

'না, প্লিজ... পুলিশকে জড়িয়ো না।'

'কিন্তু কেন?'

'সেসব তুমি বুঝবে না।'

'চেষ্টা করে দেখো। আমি বুদ্ধিমান... সত্যি।'

চুপ হয়ে গেল মেয়েটা। মাথা নিচু করে হাঁটছে। রানা নরম গলায় বলল, 'আমাদের এখনও পরিচয় হয়নি। আমি রানা... মাসুদ রানা।'

'অ্যালিসন,' নিজের নাম জানাল মেয়েটা। 'আমাকে তুমি অ্যালি বলে ডাকতে পারো।'

'আমার ওপর আস্থা রাখো, অ্যালি। যা-ই বলো, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করব না। ওই লোকগুলোকে আমি দেখেছি... ওদের কথা শুনেছি। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। নির্ভয়ে সব খুলে বলো আমাকে।'

চুপ করে রইল মেয়েটা। মাথা নিচু করে হাঁটছে।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' খানিক পর জানতে চাইল রানা। 'বাড়িতে কে কে আছে? মা, বাবা, ভাই, বোন...'

'জানি না,' মাথা নাড়ল অ্যালি। 'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু বাধা পড়ল কাছ থেকে বিকট একটা আওয়াজ ভেসে আসায়। খপ্ করে রানার হাত চেপে ধরল ও, তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। রানাও তাকাল। মাটিতে কাত হয়ে পড়েছে একটা ডাস্টবিন, ঢাকনাটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা বেড়ালকে দেখা গেল উল্টে পড়া জঞ্জালের দিকে এগোতে। তাই বলে ভয় কাটল না অ্যালির, রানার বাহু আঁকড়ে ধরে থাকল।

'ভয়ের কিছু নেই,' রানা বলল। 'ওটা বেড়ালের কাণ্ড। কী যেন বলছিলে?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল অ্যালি, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল রানার হাত ধরে। বলল, 'আমার কিচ্ছু মনে নেই। গত দু'মাসের বেশি কিছুই মনে করতে পারি না। এই দু'মাসে... না, কোনও আত্মীয়স্বজন দেখিনি আমি।'

ক্লান্তি-মাখা সুরে কথা বলছে ও—একটা বাচ্চা মেয়ের জন্যে তা বেমানান। এ-ধরনের সুর শুধুমাত্র যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকের গলায় শোনা যায়।

'আজ রাতে তুমি কোথায় ছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোত্থেকে ওই লোকগুলো তোমাকে ধাওয়া করে নিয়ে এল?'

'যেখানে আমাকে আটকে রেখেছিল,' বলল অ্যালি। 'গত দু'মাস ধরে ওখানেই বন্দি ছিলাম আমি। আজ রাতে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা, তাই পালিয়েছি।'

আবর্জনা ঘাঁটতে থাকা বেড়ালটাকে পেরিয়ে এল ওরা। থেমে ওদের দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল প্রাণীটা—এদের আবার ভাগ বসাবার মতলব নেই তো! তারপর আবার ব্যস্ত

হয়ে পড়ল নিজের কাজে। পড়ে থাকা ঢাকনাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আচমকা একটা ভাবনা এল রানার মাথায়, জেগে উঠল আতঙ্ক। অ্যালির দিকে তাকাতেই দেখল, মেয়েটার চোখ বড় হয়ে গেছে। খটকা লেগে গেল ওর, বুঝল কী করে?

'এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদেরকে,' বলল ও।

কথাটা শেষ করেই দ্রুত পা চালাল। অ্যালিকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ছায়ায়, দুই বিল্ডিঙের মাঝ দিয়ে পেছনে পৌঁছুবার চেষ্টা করছে। ওই ডাস্টবিন থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

'শব্দটা শুনে ছুটে আসবে ওরা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল অ্যালি।

'হ্যাঁ।'

পরক্ষণে কংক্রিটের ওপর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সামনে, বিল্ডিঙের গোড়ায় বুনো ঝোপ দেখতে পেল রানা, অ্যালিকে নিয়ে চট্‌ করে বসে পড়ল ঝোপ আর দেয়ালের মাঝখানে। একটু অপেক্ষা করে উঁকি দিল বাইরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো ডাস্টবিনের পাশে।

ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে অ্যালিকে ইশারা দিল রানা। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকল দু'জনে।

টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল লোকটা, ডাস্টবিন আর ঢাকনা দেখল। ম্যাঁও করে বিরক্তি প্রকাশ করল বেড়ালটা।

'ভাগ্‌!' মারমুখী একটা ভঙ্গি করল লোকটা।

হার মেনে দৌড়ে পালিয়ে গেল বেড়াল। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা। কোমর থেকে কী যেন একটা তুলে আনল। পরক্ষণে স্পিকার থেকে খসখসে শব্দ হওয়ায় বোঝা গেল, ওটা ওয়াকি-টকি। মুখের কাছে তুলে কথা বলল সে, রাতের নীরবতায় পরিষ্কার শোনা গেল তার কণ্ঠ।

'দিস ইজ থ্রি-সিক্স, নর্থ অভ থ্রি-ফোর'স পজিশন। নো কণ্ট্যাক্ট।'

আরেকটা কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে। খসখসে

আওয়াজের মাঝেও শ্যাভেজের গলা চিনতে পারল রানা।

'দিস ইজ থ্রি-ফোর। আমিও কিছু পাইনি। ভ্যানে ফিরে যাচ্ছি।'

'নেগেটিভ, থ্রি-ফোর,' তৃতীয় একটা কণ্ঠ শোনা গেল। এটা লিডারের। 'স্ট্রিট সার্চ চালিয়ে যাও। আমাদের ধারণা, মেয়েটা আবার শহরের দিকে ফিরে গেছে। এদিকটায় দ্বিতীয়বার তল্লাশি চালিয়ে আমরা একটা লিড পেয়েছি।'

'কপি,' বলল ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়ানো লোকটা। 'কী পেয়েছ?'

'একটা ওয়ালেট,' জানাল লিডার। 'কজওয়ের নিচে পাওয়া গেছে। ঠিক যেখানে আমরা মেয়েটার ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

মুখের ভেতরটা তেতো লাগল রানার। চেক করার দরকার নেই, প্যান্টের পেছনের পকেটের হালকা ভাবটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, কী সর্বনাশ ঘটেছে। তাও অভ্যাসবশে হাত দিল। নেই ওর ওয়ালেট।

'দু'জোড়া পায়ের ছাপ পেয়েছি আমরা,' বলে চলেছে লিডার। 'কজওয়ের তলা থেকে তোমাদের পজিশনের দিকে গেছে। থ্রি-সিক্স, পুরো টিম আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ওদেরকে নিয়ে পুরো এলাকা সুইপ করো। থ্রি-ফোর, ভ্যানে যাও, আমিও আসছি। ওয়ালেটে আই.ডি. আর একটা কি-কার্ড পাওয়া গেছে। কার্ডে এখানকার এক হলিডে রিসোর্টের নাম লেখা। আমার ধারণা, ওয়ালেটের মালিক ওখানেই থাকে।'

তিন

নিজের অফিসের প্রাইভেট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালেক্স লিয়ারি। মুঠোয় সেলফোন... এত শক্ত করে ধরেছে যে, ফোনের স্ক্রিনটা মড়-মড় করছে।

দক্ষিণমুখী ব্যালকনিটা বিল্ডিঙের একদম ওপরতলায়। ওখানে দাঁড়িয়ে সানসেট বুলেভার্ড থেকে পুরো লস অ্যাঞ্জেলেস দেখা যায়। লিয়ারির চোখের সামনে এখন মিটমিট করছে রাত্রিকালীন মহানগরীর শত-সহস্র বাতি। আলোকিত রাস্তাগুলো যেন শিরা-উপশিরার মত বিছিয়ে রয়েছে পুরো শহরের বুকে। কিন্তু কিছুই দেখছে না সে।

চোখ বন্ধ করে গলার কাছে দলা পাকিয়ে ওঠা উদ্বেগটা গিলে ফেলার চেষ্টা করছে লিয়ারি... চেষ্টা করছে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে। মিনিটতিনেক আগে একটা ফোনকল পেয়ে সূচনা হয়েছে এর।

সিসকো-র দল মেয়েটাকে হারিয়ে ফেলেছে!

উল্টো ঘুরল লিয়ারি। স্লাইডিং ডোর পেরিয়ে নিজের ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নামিয়ে রাখল ফোনটা। মনে মনে চাইছে, আবার বেজে উঠুক ওটা। খবর আসুক, সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার ব্যালকনিতে ফিরে গেল সে।

শঙ্কা আর উত্তেজনায় মুখের ভেতরটা বিস্বাদ ঠেকছে লিয়ারির। এমন অনুভূতি আগেও হয়েছে তার—জীবনে

প্রথমবার মানুষ খুন করার পর। সেটা ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা—কলেজের পাট চুকিয়ে তখন সে আর্মিতে ঢুকবে বলে ঠিক করেছে। থাকত বস্টনে। এক সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে বেসবল গেম দেখতে গিয়েছিল, খেলাশেষে সবাই মিলে ফেনওয়েের একটা বারে গিয়ে ঢুকেছিল ফুর্তি করার জন্যে। মদ্যপান একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল, কখন সবাই ওকে ফেলে বেরিয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি। মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল... বিশেষ করে বারে পরিচয় হওয়া এক সুন্দরী মেয়ের কথা ভেবে। তার সঙ্গে খোশগল্প বেশ ভালই জমেছিল, ভেবেছিল মেয়েটাকে পটিয়ে বিছানায় নিয়ে যেতে পারবে। অথচ হুঁশ ফিরতেই নিজেকে পার্কিং লটে আবিষ্কার করল লিয়ারি—বারের লোকজন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। মেয়েটাও কেটে পড়েছে ওকে কিচ্ছু না বলে। খিস্তিখেউড় করতে করতে বাস স্টপের দিকে রওনা হলো সে, পথ হারিয়ে একসময় পৌঁছুল নদীর ধারে... হার্ভার্ড ব্রিজের কাছে। তলপেটের চাপ কমাবার জন্যে প্রস্রাব করার একটা জায়গা খুঁজছিল, এরপরেই ঘটল ঘটনাটা।

এত বছর পর সেসব আর পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারে না লিয়ারি। আবছাভাবে মনে পড়ে, একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল... লোকটার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি, তাকে আরেকজন মাতাল কিংবা ভবঘুরে ভেবেছিল। ঝগড়া বেধেছিল দু'জনের—কী নিয়ে, কে জানে! লিয়ারি নিজেই হয়তো বাধিয়েছিল। মাতাল হয়ে গেলে নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না তার, সামান্যতম বিষয় নিয়ে যার-তার সঙ্গে লেগে যায়।

সে-রাতে স্রেফ ঝগড়ায় সীমাবদ্ধ থাকেনি ব্যাপারটা, হাতাহাতিতে গড়িয়েছিল। কিল-ঘুষি আর লাথি ছুঁড়তে শুরু করেছিল দু'জনে। হঠাৎ কায়দামত প্রতিপক্ষের চোয়ালে একটা আঘাত হানতে পেরেছিল লিয়ারি, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে

জ্ঞান হারায়। পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। তার দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে, হাঁটতে শুরু করেছিল বিজয়ের আনন্দ নিয়ে। দশ মিনিট পর... দশটা ব্লক পেরিয়ে একটা চিন্তা এসেছিল মাথায়—ব্যাটা পানিতে পড়েনি তো? শরীরের নিচের অংশ মাটিতে পড়েছে, কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু মাথা? উপুড় হয়ে পড়তে দেখেছে, যদি মুখটা পানিতে পড়ে থাকে...

খুঁতখুঁতানি লেগে গেল লিয়ারির মনে। কেন যেন মনে হলো, পানিতে পড়ার মত একটা আওয়াজ শুনেছিল। ফিরে যাবার সাহস পেল না। যদি অমন কিছু ঘটে থাকে, ততক্ষণে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। একটা বাস ধরে ফিরে গেল নিজের ডরমিটরিতে। নিজেকে প্রবোধ দিল, পানির আওয়াজ শোনেনি... ওসব ওর কল্পনা। কিন্তু রাতভর দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না সে।

পরদিন দুপুরে পাওয়া গেল দুঃসংবাদ। টিভির খবরে বলা হলো, নদীর ধারে এক গ্র্যাড স্টুডেন্টের লাশ পাওয়া গেছে—পানিতে ডুবে মরেছে সে। পুলিশের সন্দেহ, মারধরের পর খুন করা হয়েছে তাকে। খুনির ব্যাপারে কেউ কিছু জানলে থানায় ফোন করতে বলা হলো। ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দশা হলো লিয়ারির। মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকল নানা রকম দুশ্চিন্তা—নদীর ধারে যেতে-আসতে কতগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরায় দেখা গেছে ওকে? ক্যাব-ড্রাইভার, বাসের কণ্ডাক্টর, আর রাতের পথচারীরা মিলে কতজন দেখেছে ওকে? ঘটনাস্থলে কিছু ফেলে আসেনি তো?

পরের কয়েক মাস মুখের ভেতরটা বিস্বাদই হয়ে রইল লিয়ারির—ঠিক যেমন এখন হচ্ছে। লক্ষণটা মস্ত বিপদে পড়ার... সেই ধরনের বিপদ, যেখানে অপেক্ষা ছাড়া নিজের কিছু করার থাকে না।

সেলফোন বেজে উঠল। দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে গিয়ে

ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিল লিয়ারি।

'আশা করি ভাল খবর দেবার জন্যে ফোন করেছ, সিসকো।'

'শহরে চিরুনিতল্লাশি চালাচ্ছে আমাদের টিম,' ওপাশ থেকে জানাল টিম লিডার সিসকো। 'কিছু পেলেই আমাকে জানাবে। আমি আর শ্যাভেজ এসেছি মাসুদ রানার কটেজে। ও এখানে নেই।'

'রিসোর্টে ঢুকলে কীভাবে? গেটে কী বলেছ?'

'গেট দিয়ে ঢুকিনি। বাউণ্ডারি টপকে।'

'কেউ দেখতে পায়নি তো? কটেজ খুঁজে পেতে নিশ্চয়ই সময় লেগেছে?'

'উঁহুঁ। কি-কার্ডের গায়ে কটেজ নাম্বার দেয়া ছিল। আমরা সতর্ক ছিলাম। কটেজে ঢুকে সব পর্দা টেনে দিয়েছি। ভেতরের বাতি জ্বালিনি, টর্চ জ্বেলে তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছি। অবশ্য... লোকটা ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এলে এতক্ষণে চলে আসত। বিচের খুব কাছেই রিসোর্ট। এত সময় লাগার কথা না। বোধহয় ওয়ালেট খোয়া যেতে দেখে বিপদ আঁচ করেছে।'

'ওই লোক যদি মেয়েটাকে সাহায্য করে, কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?'

'খুবই বিশ্রী টাইপের সমস্যা... বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

চোয়াল শক্ত হলো লিয়ারির। 'ব্যাখ্যা করো।'

'ওয়ালেটে ভিজিটিং কার্ড আছে,' বলল সিসকো। 'লোকটার নাম মাসুদ রানা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভ রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। একটা আই.ডি. কার্ডও আছে—নুমা, মানে ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি থেকে ইস্যু করা। সে ওখানকার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর। মানেটা বুঝতে পারছেন? একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর... নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র চালাতে জানে। নুমার

সূত্রে সরকারের ওপরের লেভেলেও ভাল কানেকশন থাকার কথা। একে আণ্ডার-এস্টিমেট করা একদম ঠিক হবে না।

নিচু গলায় গাল বকে উঠল লিয়ারি। 'এ-লোক এল্ সেডেরোয় কী করছে?'

'এখনও জানি না। আমাদের কপাল খারাপ, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে মেয়েটা কিনা গিয়ে পড়ল এরই হাতে! সাধারণ কোনও সিভিলিয়ান হলে সহজে সামাল দেয়া যেত।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল লিয়ারি। একটা হাতে আঁকড়ে ধরেছে ব্যালকনির রেলিং। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সামনে বিস্তৃত মহানগরীর মিটমিটে আলোর দিকে।

'স্যর?' ডাকল সিসকো।

জবাব দিল না লিয়ারি। ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখছে সমস্যাটা। মেয়েটা উধাও, তাকে সাহায্য করছে একজন দক্ষ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। কতটা দক্ষ? খোঁজ নেয়া দরকার। তবে যতটুকু শুনেছে, তাতেই বুঝতে পারছে, মোটামুটি কঠিন একজন প্রতিপক্ষ উদয় হয়েছে রঙ্গমঞ্চে।

'কটেজটা ভাল করে সার্চ করো,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল সে। 'রানার লাগেজ, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র... সবকিছু ভাল করে দেখবে।'

'শ্যাভেজ সে কাজেই ব্যস্ত।'

'সাহায্য করো ওকে,' বলে লাইন কেটে দিল লিয়ারি। একটু অপেক্ষা করে ডায়াল করল নতুন একটা নাম্বারে।

কয়েকবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে শোনা গেল একটা ঘুম-জড়ানো কর্কশ গলা। ওয়াশিংটনে এখনও ছ'টা বাজেনি।

'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত,' বলল লিয়ারি।

'কেন ফোন করেছ, বলে ফেলো।'

লোকটা সোজা কথার মানুষ, ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। তাকে এজন্যে পছন্দ করে লিয়ারি। তবে পত্র-পত্রিকা আর টেলিভিশনে তাকে নিতান্তই আহাম্মকের ভূমিকায় উপস্থাপন

করা হয়। যারা করে, তারা লোকটার সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানে না।

ঝটপট তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করল লিয়ারি—কোনও ধরনের লুকোছাপার মাঝে গেল না। ওর কথা শেষ হলে ওপাশে নেমে এল নীরবতা। খানিক পর শোনা গেল গ্লাসে কিছু ঢালার আওয়াজ। পানি নয়, বুঝতে পারল লিয়ারি। এ-পরিস্থিতিতে আরও কড়া কিছু প্রয়োজন হয় মানুষের।

'এখন কী চাও তুমি?'

'স্যাটেলাইট কাভারেজ দরকার আমার,' জানাল লিয়ারি। 'সবগুলো মিরাণ্ডা চাই। আমার হাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে ওগুলোর। হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি আর ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স যেন নাক গলাতে না আসে। আমি যতক্ষণ না বলছি, ওদেরকে কিছুই জানানো যাবে না।'

টেলিফোনের অপর প্রান্তের মানুষটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হলো, সম্ভবত সোফায় বসেছে সে।

'ওপরে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল লোকটা।

কতটা সময় লাগবে, তা আর জানতে চাইল না লিয়ারি। লোকটার ওপরে খুব বেশি মানুষ নেই।

'আমি আপনাকে আবার ফোন করব,' বলল সে। 'পনেরো মিনিট পর।'

চার

ছোট্ট একটা পার্কের ধারে, সিডার গাছের সারির আড়ালে

দাঁড়িয়ে আছে রানা ও অ্যালি। সতর্ক চোখে নজর বুলাচ্ছে আশপাশে। এর মাঝে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে, কিন্তু প্রথম যেখানে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে তিন ব্লকের বেশি এগোতে পারেনি ওরা। এখনও এল্ সেডেরোর রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার গভীরে আটকা পড়ে আছে দু'জনে, চারপাশে ঘুরতে থাকা শত্রুদের মাঝখানে।

শেষ রেডিও ট্রান্সমিশনটার কয়েক মিনিট পরেই ছায়ার মত উদয় হয়েছে লোকগুলো। কাজেকর্মে অত্যন্ত দক্ষ—তল্লাশি চালাচ্ছে নিঃশব্দে, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালছে না... ফলে তাদের লোকেশন আন্দাজ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। ফলে প্রচুর সময় নিয়ে, ভালমত দেখেশুনে আড়াল থেকে বেরোতে হচ্ছে ওদেরকে। শ্লথ হয়ে গেছে এগোবার গতি। যতটা এগিয়েছে, তার পেছনে সতর্কতার চেয়ে ভাগ্যের ভূমিকাই বরং বেশি। একেবারে প্রথম শ্রেণীর ট্রেইণ্ড প্রফেশনাল এরা, হাবভাবে পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছে দক্ষতা। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, বাড়তি মুভমেণ্ট বা আওয়াজ নেই, ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে।

পার্কটা ভাল করে দেখল রানা। একপাশে সারিবদ্ধ বাড়ি ও আঙিনা; অন্যপাশটা উন্মুক্ত, রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। চল্লিশ গজ দূরে, দোলনা আর স্লিপারের সামনে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে হেঁটে যেতে দেখল। বাড়িঘরের সারির দিকে তাকাল ও। ওদের বামে রয়েছে ওগুলো, সাগরের উল্টোদিকে। ওদিকেই যাবার ইচ্ছে—আবাসিক এলাকা পেরুলেই হাইওয়ে, তার ওপাশে এল্ সেডেরোর কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্ট। আর কিছু না হোক, সেটা মস্ত বড় এলাকা। দোকানপাট, ওয়্যারহাউস, আর নানা ধরনের কারখানার মেলা। লুকানো সহজ, কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। একবার ও-পর্যন্ত পৌঁছুনো গেলে পরের পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

পার্কে দেখা লোকটা রাস্তার দিকে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে তাকে দূরের বাড়িগুলোর ছায়ায় হারিয়ে যেতে দেখল রানা। উল্টোদিকে নজর ফেরাল ও। সিডারের সারি আর বাঁয়ের বাড়িগুলোর মাঝখানের অংশটা খুঁটিয়ে দেখল। মোটামুটি সত্তর ফুট দূরত্ব পেরোতে হবে ওদেরকে। ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে জায়গাটা, কিন্তু কোনও আড়াল নেই। কেউ এদিকে নজর রাখলে দেখতে পাবে ওদেরকে।

শেষবারের মত রাস্তা আর বাড়িগুলোর দিকে তাকাল রানা। সুনসান পরিবেশ, কোথাও কেউ নেই। অ্যালির হাত ধরল ও, ইশারায় বুঝিয়ে দিল কোন্দিকে দৌড়াতে হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালি। ছুট দিতে যাবে রানা, এমন সময় মুঠো শক্ত হয়ে গেল মেয়েটার, হালকা টান দিল পেছনদিকে—সঙ্কেত দিচ্ছে। ঘাড় ফেরাল না রানা, কিছু জিজ্ঞেস করল না... স্থির হয়ে গেল মূর্তির মত।

ঠিক তিন সেকেণ্ড পর সিডারের সারির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একটা লোক—ওরা যেখানটায় লুকিয়েছে, তার বড়জোর দশ ফুট সামনে দিয়ে। পাশ থেকে এসেছে লোকটা, গাছের সারির জন্যে দেখা যায়নি তাকে। শিশিরে ভেজা ঘাসে কোনও পদশব্দ হয়নি—এখনও হচ্ছে না। অবাক হলো রানা, লোকটার উপস্থিতি অ্যালি বুঝল কী করে? ও নিজেই তো কিছু টের পায়নি!

অপেক্ষা করতে থাকল রানা। পার্কের মাঝখানে গিয়ে থামল লোকটা। ঘুরে চারপাশ দেখল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সিডারের সারির ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি, এরপর আবার ঘুরে গেল। গাছপালা, বাড়িঘর আর গলি-ঘুপচি মিলিয়ে লুকানোর জায়গার অভাব নেই আশপাশে। এতসব জায়গা অল্প কয়েকজনের পক্ষে তল্লাশি করা কঠিন। এরা সম্ভবত তাই খোলা জায়গায় মুভমেণ্ট ডিটেক্ট করতে চাইছে।

সময় নিয়ে চারপাশ দেখল লোকটা। তারপর ঘুরে

হাঁটতে শুরু করল। একটু আগে তার সঙ্গী যেদিকে গেছে, সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবারও নিথর হয়ে গেল চারপাশ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারল না রানা। খানিক আগেও এমনই নিথর লাগছিল, হঠাৎ লোকটা বাতাস ফুঁড়ে উদয় হলো। তাই বলে এখানে গাছের আড়ালে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। ঝুঁকি বাড়ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যালির দিকে তাকাল রানা। এবার আর কোনও সঙ্কেত দিল না মেয়েটা। বরং মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল, সে তৈরি।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। ছুটতে শুরু করল প্রাণপণে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল অ্যালি। থামল না রানা, ওকে কোলে তুলে নিল, ছুটে চলল জোর কদমে। দশ মিনিট লাগল হাইওয়ের কাছে পৌঁছুতে। রাস্তার ঢালের গোড়ায় পৌঁছে থামল। অ্যালিকে নামাল কোল থেকে। বসে পড়ল ছায়ায়।

কপালের দু'পাশ দপ দপ করছে রানার। ঠিক ব্যথা বলা যাবে না, যেন হিমশীতল কিছুর স্পর্শ পাচ্ছে ওখানটায়। শরীর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি, আন্দাজ করল ও। নইলে হালকা-পাতলা একটা বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে দশ মিনিট দৌড়ালে কিছুই হবার কথা নয় ওর।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল কিছুক্ষণের ভেতর। এবার কান পাতল ও। থেকে থেকে রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়ির আওয়াজ, এই অসময়ে খুব বেশি যানবাহন নেই হাইওয়েতে। মনে মনে প্রার্থনা করল, হেলিকপ্টারের আওয়াজ যেন শুনতে না হয়। শত্রুপক্ষের ক্ষমতা সম্পর্কে যতটা আঁচ করতে পেরেছে, তাতে হেলিকপ্টার জোগাড় করা কঠিন হবার কথা নয় তাদের জন্যে। আকাশ থেকে নিচের দিকে একটা থারমাল ক্যামেরা তাক করলেই ওদের দু'জনকে

জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে।

বিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু শঙ্কিত হবার মত কিছু শুনতে পেল না। তার মানে এই নয় যে, বিপদ কেটে গেছে। মাথা তুলে রাস্তার ওপারে শুরু হওয়া কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিক্টের দিকে তাকাল। কপ্টার আসুক বা না-আসুক, লুকাতে হবে ওদেরকে। অ্যালির দিকে ফিরতে শুরু করেছিল, হঠাৎ থমকে গেল। বিপদের আভাস দিচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। তাড়াতাড়ি আশপাশে তাকাল। না, কিছুই নেই। তা হলে?

স্থির হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল রানা। কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই, নইলে মনের ভেতর বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠত না। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশাতে থাকায় ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। আগেভাগেই অনেক কিছু টের পেয়ে যায়। এখানেও নির্ঘাৎ কোনও ঝামেলা আছে। তারমানে... এল্ সেডেরোর ত্রিসীমানাতেই থাকা উচিত হবে না ওদের।

অ্যালি ওকে দেখছে। চোখের তারায় ফুটে আছে শঙ্কা, তবে মুখে কিছু বলছে না।

হাইওয়ের দিকে ইশারা করল রানা। উল্টোপাশের গাছপালার সারি পেরিয়ে, সিকি মাইল দূরে ঝলমল করছে একটা সুপারস্টোরের আলো—সারা রাত খোলা থাকে ওটা।

'এসো,' অ্যালিকে ডাকল ও।

লিয়ারির অফিসের এক ফ্লোর নিচে কম্পিউটার রুম। কামরার ভেতরে কোনও বাতি জ্বলছে না, আবছা আলো ছড়াচ্ছে ন'টা প্লাজমা মনিটর। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে লিয়ারি, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে তার চিফ টেকনিক্যাল অফিসার রব হুপারের দিকে। কম্পিউটারগুলোর সেটআপ নিয়ে ব্যস্ত সে, যাতে নির্বিঘ্নে মিরাণ্ডা স্যাটেলাইটের ইমেজ স্ট্রিম রিসিভ করতে পারে। এ-মুহূর্তে মনিটরগুলো শূন্য, কোনও ডেটা আসছে না। স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাকসেস

এখনও পায়নি লিয়ারি, প্রতি মুহূর্তে তার হৃৎস্পন্দন বাড়ছে।

'সিগনেচারস্ লকড,' খানিক পর সোজা হয়ে জানাল হুপার। 'স্ট্রিম পেলেই ডিসপ্লে করতে পারব।'

পৃথিবীর অরবিটে আজ পর্যন্ত যত কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে, তার ভেতর মিরাণ্ডা সবচেয়ে অনবদ্য। ওগুলোর থারমাল ইমেজিং ক্ষমতা দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের কল্পনার চেয়েও অন্তত দশ বছর এগিয়ে আছে। মিরাণ্ডার চোখ দিয়ে ভূপৃষ্ঠে দাঁড়ানো যে-কোনও মানুষের আকার-আকৃতি, নারী না পুরুষ—নিখুঁতভাবে বোঝা যায়। এ-কাজ যে অন্য কোনও স্যাটেলাইট করতে পারে না, তা নয়, কিন্তু সেটা খুবই সীমিত পরিসরে। ভুলভ্রান্তি থেকে যায় প্রচুর। তা ছাড়া এ-ধরনের ডিটেকশনের জন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ একশো ত্রিশ মাইল ওপরে থাকতে হয় ওগুলোকে। কিন্তু দু'হাজার মাইল ওপর থেকেও ডিটেকশনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে মিরাণ্ডা—নিখুঁতভাবে। উঁচুতে থাকার ফলে সাধারণ স্যাটেলাইটের চেয়ে অনেক বড় এলাকা কাভার করতে পারে।

পৃথিবীর চারপাশ জুড়ে তাই ওড়ানো হয়েছে অনেকগুলো মিরাণ্ডা। ওভারল্যাপিং কাভারেজের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি ইঞ্চি মনিটর করে চলেছে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা—অনেকটা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস-এর মত। যে-কোনও মুহূর্তে, দুনিয়ার যে-কোনও বিন্দুর ওপর অন্তত তিনটে... কখনও কখনও চারটা বা পাঁচটা মিরাণ্ডা তাক করে নজরদারি করা সম্ভব। মুভিং টার্গেটের ওপরেও লক করা যায় মিরাণ্ডার দৃষ্টি—হোক্ সেটা কোনও জগার কিংবা ক্রুজ মিসাইল। একবার যদি সিগনাল লক করা যায়, কারও পক্ষে মিরাণ্ডার চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। যেখানেই যাক, যত দূরেই যাক, আঠার মত তার ওপর সেঁটে থাকবে মিরাণ্ডার ক্যামেরা।

তবে এসব করার আগে টার্গেটকে খুঁজে পাওয়া চাই।

এখনও এল্ সেডেরোয় আছে রানা আর মেয়েটা, কিন্তু দেরি হলে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মত। সেজন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে লিয়ারি। মিরাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ পেতে যত দেরি হচ্ছে, ততই বাড়ছে ওদের পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল কামরার সবক'টা মনিটর। একের পর এক মেসেজ বক্স ভেসে উঠতে শুরু করেছে। লিয়ারির সেলফোন বেজে উঠল।

'সবগুলো মিরাণ্ডা তোমাকে দেয়া হলো,' ওপাশ থেকে শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ, 'বেস্ট অভ লাক।'

এক দৌড়ে সুপারস্টোরের পার্কিং লটের কাছে পৌঁছেছে রানা আর অ্যালি। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছে চারপাশ। লট প্রায় খালি। বিল্ডিঙের সামনে জটলার মত দাঁড়িয়ে আছে কিছু গাড়ি। সম্ভবত রাতের শিফটের কর্মচারীদের গাড়ি ওগুলো। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, সেগুলোর মালিকেরা সম্ভবত ডাবল শিফটে কাজ করছে—বিকেলে যখন ডিউটিতে এসেছিল, তখন ভরা ছিল পার্কিং লট, বিল্ডিঙের সামনে কোনও জায়গা পায়নি।

অ্যালিকে নিয়ে সবচেয়ে কাছের গাড়িটার দিকে এগোল রানা। গাঢ় সবুজ রঙের একটা ফোর্ড টরাস। যত কমন মডেল হয়, ততই ভাল। গাড়ি চুরির খবর পুলিশের কাছে যেতে সময় লাগবে না, আর শত্রুপক্ষ পুলিশের রেডিয়ো কমিউনিকেশনে আড়ি পেতে বসে আছে। কমন মডেলের গাড়ি হলে সহজে মিশে যাওয়া যাবে অন্যান্য গাড়ির ভিড়ে। সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না চুরি হওয়া গাড়িটা।

কাছে গিয়ে দমে গেল রানা। টরাসটা একদম নতুন মডেলের। এগুলোয় স্মার্ট-কী থাকে, পুরনো গাড়ির মত তার জোড়া দিয়ে ইঞ্জিন চালু করা যায় না। অগত্যা মুখ ঘুরিয়ে

আরেকটা গাড়ির দিকে এগোল। চল্লিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

কি-বোর্ডে ঝড় তুলেছে হুপারের আঙুল, পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে লিয়ারি।

'নাম্বার টুয়েলভ—ওটার ফ্রেম তিন বাই তিন কিলোমিটারে নিয়ে এসো। নাম্বার ফিফটিনকে জুড়ে দাও টুয়েলভের সঙ্গে। ইনডেক্স—আউটডোর বায়োলজিক্স, হিউম্যান। নাম্বার ফোরকেও কানেক্ট করো টুয়েলভের সঙ্গে। সেইম কমাণ্ড।'

মিরাণ্ডা স্যাটেলাইট সিস্টেমের ক্ষমতা কল্পনাতীত। বড়-সড় একটা শহরকে অনায়াসে মনিটর করা যায় একেকটা স্যাটেলাইট দিয়ে। খোলা জায়গায় যত মানুষ আছে, তাদের সবাইকে ডিটেক্ট করা যায়। ডিটেকশনের পর প্রথমটার সঙ্গে আরও দুটো স্যাটেলাইটকে জুড়ে দিলে প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদাভাবে জুম করে দেখা যাবে, বের করা যাবে তাদের বৈশিষ্ট্য। আর এই পুরো প্রসেসে সময় লাগে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

ইতিমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে পনেরো নম্বর মিরাণ্ডা।

একটা মনিটরে ওয়াইড শটে ভেসে উঠেছে এল্ সেডেরোর থারমাল ম্যাপ। সাগরটাকে দেখাচ্ছে কুচকুচে কালো। ডাঙার অংশে জ্বলজ্বল করছে লাল-নীল-হলুদ... নানা রঙের বিন্দু। বিভিন্ন মাত্রার হিট সোর্স বোঝাচ্ছে বিন্দুগুলো।

আশপাশের স্ক্রিনগুলোয় এবার একে একে ক্লোজআপ শট উদয় হতে শুরু করল। বায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষগুলোকে আলাদা করছে, তাদের ছবি তুলছে ক্রমাগত। প্রথম শটটায় গোল হয়ে থাকা কয়েকজন মানুষকে দেখা গেল, মাঝখানে বড় একটা সাদা বিন্দু।

'ক্যাম্পফায়ার,' বলল হুপার। 'বিচে আড্ডা দিচ্ছে। বাদ

দেব এদেরকে?’

মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি। বোতাম টিপে টার্গেটটাকে অগ্রাহ্য করবার নির্দেশ পাঠাল হুপার।

পরের কয়েকটা শটে সিসকোর টিমের সদস্যদেরকে দেখা গেল—মিলিত হবার জন্যে ভ্যানের দিকে যাচ্ছে। আদেশটা লিয়ারিই দিয়েছে। দুই শিকারকে খুঁজে পাওয়ামাত্র ওরা যেন ভ্যান নিয়ে মুভ করতে পারে, সেজন্যে।

আরও স্ন্যাপশট আসছে—কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছে এক মহিলা, ডাস্টবিনে ময়লা ফেলছে এক লোক... পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে স্ক্যান করছে মিরাণ্ডা—সাগরের দিক থেকে ডাঙার অভ্যন্তরে। স্থির চোখে বড় স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে রইল লিয়ারি, পুরো এল্ সেডেরো শহর ভেসে উঠেছে ওতে। কোনার দিকে জ্বলজ্বল করছে শপিং সেন্টার জাতীয় কী যেন একটা। দশ থেকে পনেরো সেকেণ্ডের ভেতর ওখানে পৌঁছুবে মিরাণ্ডার চোখ।

লটের বাইরের দিকটায় নেবার মত একটা গাড়িই দেখতে পেল রানা। দূর থেকেই পছন্দ হয়ে গেল ওটা। এফ-১৫০ মডেলের একটা ফোর্ড পিকআপ। নব্বুই দশকের গাড়ি, ঝরঝরে। চুরি ঠেকানোর মত আধুনিক কোনও ব্যবস্থা নেই ওতে। চুরি হবার ভয় সম্ভবত মালিকেরও নেই। কে নেবে এই পুরনো গাড়ি? ড্রাইভারের পাশের দরজা লক করেছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জারেরটা করেনি।

রানার ইশারা পেয়ে ওপাশ দিয়ে উঠে পড়ল অ্যালি। ঝুঁকে খুলে দিল ড্রাইভারের দরজা। ঝট্পট্ স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে পড়ল রানা।

রকি পর্বতমালার দু'হাজার ত্রিশ মাইল ওপরে, সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে মেক্সিকো উপসাগরের দিকে ভেসে চলেছে

মিরাণ্ডা ফিফটিন। ওটার ক্যামেরা এল্ সেডেরোর দিকে তাক করা—ঝড়ের বেগে তুলছে হিউম্যান টার্গেটদের ছবি। সাত নম্বরটা তুলে পাঠিয়ে দিল নিচে। এরপর তুলল আট নম্বরটা। নয় নম্বরে গিয়ে থমকে গেল অনবোর্ড কম্পিউটার। প্রথম যেখানে ডিটেক্ট করা হয়েছিল, এখন সেখানে নেই টার্গেট নাইন।

মাস্টার ফ্রেম ধরে রাখার পাশাপাশি টার্গেট অ্যাসাইন করছে মিরাণ্ডা টুয়েলভ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওটার সঙ্গে যোগাযোগ করল ফিফটিন—সমস্যাটা জানাল। মিরাণ্ডা টুয়েলভের তরফ থেকে জবাব এল, দুই দশমিক তিন সেকেণ্ড আগে উধাও হয়ে গেছে টার্গেট নাইন। ওই লোকেশনে এখন আর খোলা জায়গায় দাঁড়ানো দু'জন মানুষের হিট সিগনেচার পাওয়া যাচ্ছে না; পাওয়া যাচ্ছে গাড়ির ভেতরে বসা দু'জন মানুষের সিগনেচার। নিরানব্বুই শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে গাড়ির মডেলও জানানো হলো—এফ-১৫০ মডেলের একটা ফোর্ড পিকআপ, ১৯৮৮ সালে তৈরি। গ্রাউণ্ড থেকে পাওয়া কমাণ্ডে উন্মুক্ত জায়গায় টার্গেট খোঁজার কথা বলা হয়েছে, কাজেই টার্গেট নাইন বর্তমানে অকার্যকর।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করল মিরাণ্ডা ফিফটিন। কম্পিউটার ব্রেন নিজের যুক্তি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে এল, যে-টার্গেট শর্ত পূরণ করছে না, তার ছবি তোলার প্রয়োজন নেই। নয় নম্বরকে অগ্রাহ্য করে পরের টার্গেটের ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল যন্ত্রটা।

পিকআপের গ্লাভবক্সে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পেল রানা। ওটার সাহায্যে খুলে ফেলল ইগনিশন হাউজিং। ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতর দুটো তার জোড়া দিয়ে ইঞ্জিন চালু করল।

অ্যালি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। কাষ্ঠ হাসি হেসে রানা বলল, 'চুরি করছি না। ধার নিচ্ছি গাড়িটা।'

চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এল মেয়েটার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

গিয়ার দিয়ে গাড়ি আগে বাড়াল রানা। দক্ষিণমুখী র‍্যাম্প ধরে দ্রুত উঠে পড়ল হাইওয়েতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যালি। কুয়াশার মাঝে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে শহরের আলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

রানা বলল, 'হ্যাঁ, এবার তোমার গল্প শোনাও।'

স্যাটেলাইটের পাঠানো ছবিগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লিয়ারি। জুয়ার টেবিলে শেষ কানাকড়ি হারানো একজন মানুষের মত লাগছে তাকে। টার্গেট এরিয়ার আউটডোরে চোদ্দটা কণ্ট্যাক্ট পাওয়া গেছে, কিন্তু সেখানে অল্পবয়েসী কোনও মেয়ে নেই।

পালিয়ে গেছে মেয়েটা!

টার্গেট এরিয়ার আয়তন খানিকটা বাড়িয়ে দ্বিতীয় দফার সার্ভেইল্যান্স শুরু করেছে হুপার, কিন্তু তাতে আশাবাদী হতে পারছে না লিয়ারি। পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। দেখতে না পাবার ব্যাখ্যা একটাই—গাড়িতে উঠে পড়েছে ওরা।

চেয়ার টেনে ধপ্ করে বসে পড়ল লিয়ারি। আঙুল দিয়ে চেপে ধরল কপালের দু'পাশ। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই চিন্তা: নাগালের বাইরে চলে গেছে অ্যালিসন... চলে গেছে মুক্ত দুনিয়ায়!

এখুনি কিছু মনে করতে পারবে না মেয়েটা, জানে লিয়ারি। কিন্তু তাতে স্বস্তি পাবার কিছু নেই। বড়জোর এক সপ্তাহ স্মৃতিভ্রষ্ট থাকবে সে। শরীর থেকে সমস্ত ড্রাগ বেরিয়ে গেলেই ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যাবে তার।

মুখের ভেতরে বিস্বাদ অনুভূতিটা বেড়ে গেছে লিয়ারির। মনে হচ্ছে, আবার ফিরে গেছে বস্টনে... ওর ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে, এই বুঝি দরজায় টোকা দেয় পুলিশ।

'স্যর?' ডাকল হুপার।

'বলে ফেলো,' তার দিকে না-তাকিয়েই বলল লিয়ারি।

'হেইল মেরি প্রসেসটা চালালে কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'সেটা আবার কী?'

'মিরাণ্ডার অপারেটিং সিস্টেমের নতুন সংযোজন। পেভমেণ্ট থেকে হিট ট্রেইল ডিটেক্ট করার একটা কৌশল। রাস্তায় গাড়ির চাকার ঘষায় তাপ উৎপন্ন হয়, জানেন নিশ্চয়ই? খুব ক্ষীণ তাপ, তবে মিরাণ্ডার ক্যামেরার সেনসিটিভিটি বাড়িয়ে সেই তাপ ষাট সেকেণ্ড পর্যন্ত ডিটেক্ট করতে পারি আমরা।'

'বলতে চাইছ, খানিক আগে যদি কোনও গাড়ি সার্চ এরিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারবে তুমি?'

'কোত্থেকে রওনা হয়েছে... আর কোন্ পথে গেছে, সেটা যদি বুঝতে পারি আর কী। তবে ষাট সেকেণ্ডের বেশি আগে হলে পারব না।'

চেয়ার ছেড়ে মনিটরের দিকে এগোল লিয়ারি। খুঁটিয়ে দেখল পুরো ম্যাপ। হঠাৎ চোখ চলে গেল এক কোণে। একটা সুপারস্টোরের কাঠামো দেখা যাচ্ছে ওখানে। সামনে বিশাল পার্কিং লট। আর পার্কিং লট মানেই গাড়ি।

'ওখানে,' আঙুল তুলল সে। 'ওখানে দেখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কি-বোর্ডের কয়েকটা বোতাম চাপল হুপার। পুরো স্ক্রিন জুড়ে চলে এল পার্কিং লটের ক্লোজআপ। দু'বার রিফ্রেশ হলো পর্দা। এরপরেই ভেসে উঠল একজোড়া নীল রেখা—পার্কিং লট থেকে শুরু হয়ে র‍্যাম্পের দিকে গেছে, এরপর উঠে পড়েছে হাইওয়েতে।

ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটল লিয়ারির। ‘পেয়েছি!’ বিড়বিড় করল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হুপারের দিকে। ‘এক মিনিট আগের ডেটা চেক করো। আমি জানতে চাই, ওখানে কোন্ গাড়িটা ছিল।’

পাঁচ

লেইন বদলে একটা ট্রেইলারকে পাশ কাটাল রানা। স্পিড লিমিট মেনে ড্রাইভ করছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে না কারও। ইন্টারস্টেট ১০১ ধরে দক্ষিণে ছুটছে পিকআপ, উপকূলের সমান্তরালে। এদিকটায় শহরের তুলনায় কুয়াশা অনেকখানি পাতলা, রাস্তাটাও উঁচুতে, ফলে সামনে দেখা যাচ্ছে অনেকদূর।

আপাতত এল্ সেডেরো থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে ও। কোথায় যাবে, তা নিয়ে পরে ভাববে। অ্যালির পুরো ব্যাপারটাও তার আগে জেনে নেয়া জরুরি। শত্রুপক্ষের পরিচয় জানার পর বুঝতে পারবে, কোথায় গেলে নিরাপত্তা আসতে পারে।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। চুপ করে আছে সে। চেহারা দেখে মনে হলো, মুখ খোলার আগে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে।

‘সব কথা বলার আগে আমাকে একটা কাজ করতে হবে,’ হঠাৎ বলল অ্যালি।

‘কী কাজ?’ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

‘তেমন কিছু না। আসলে... তুমি যেন আমার কথা বিশ্বাস করো, সেজন্যেই...’

‘মেশিনগান নিয়ে তোমাকে তাড়া করছিল একদল খুনি,’ রানা বলল। ‘নিশ্চিন্তে থাকো, মেয়ে, তোমার কোনও কথাই আমি অবিশ্বাস করব না।’

‘সব শোনার পর তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে পারে।’

মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে হাঁটুর ওপর অদৃশ্য আঁকিবুঁকি কাটছে মেয়েটা। নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, ‘যা করব, সেটা তোমার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে।’

‘কতটা অদ্ভুত?’

‘অনেকটাই।’

বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। রানা কিছু বলার আগেই বলল, ‘চার ডিজিটের একটা সংখ্যা কল্পনা করো—একেবারে বানোয়াট। মানে, তোমার ফোন নাম্বার, বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট নাম্বারের অংশ নয়, এমন। চেনা নাম্বার হলে সেটা অন্য কারও জানা থাকতে পারে। ঠোঁট চেপে রাখো, যাতে ভুল করে মুখটাও না নড়ে।’

ওর দিকে অপলকে তাকাল রানা। বুঝতে চাইছে, ঠাট্টা করছে কি না। নাহ্, ঠাট্টা নয়। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে, সিরিয়াস চেহারা। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে উদ্বেগের তোড়ে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাস্তার দিকে নজর ফেরাল রানা। দেখা যাক কী করে মেয়েটা। মনে মনে এলোমেলো একটা সংখ্যা ভাবল—৮৯২৩। একেবারেই কল্পনাপ্রসূত সংখ্যা। ভাবনাটা শেষ হবার সময় পেল না, তার আগেই কথা বলে উঠল অ্যালি।

‘আট হাজার নয়শো তেইশ।’

চমকে উঠল রানা, ঝট্ করে তাকাল ওর দিকে।

ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ টুটে গেল ড্রাইভিং থেকে, পিকআপের একপাশের চাকা নেমে গেল কাঁকর-বিছানো মাটিতে। ঝাঁকি খেল পুরো কাঠামো। তাড়াতাড়ি আবার সামনে তাকাল রানা, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তায় তুলে আনল সবক'টা চাকা। মুখের ভাষা হারিয়েছে। অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে মেয়েটা, কিন্তু সেটাকে অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই।

কোনও ধরনের কৌশল? আড়চোখে তাকাল অ্যালির দিকে। গভীর মনোযোগে ওর প্রতিক্রিয়া দেখছে মেয়েটা।

আবারও সামনে তাকাল ও। রাস্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মনে মনে ভাবল, 'দেখি, এটা বলতে পারো কি না—বাংলাদেশ পৃথিবীর সেরা দেশ।'

'রানা?' ডাকল অ্যালি।

'কী?'

'বাংলাদেশ কি সত্যিই পৃথিবীর সেরা দেশ?'

গাড়ির গতি নব্বুই মাইলে তুলে আনল সিসকো। রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই, দু-একটা যা আছে, অনায়াসে পাশ কাটাচ্ছে।

'ওরা সাড়ে চার মাইল সামনে,' সেলফোনে জানাল লিয়ারি। 'স্পিড লিমিট ক্রস করছে না, আশা করি কয়েক মিনিটের ভেতরেই ধরে ফেলতে পারবে। পরের এগজিটটা বিশ মাইল দূরে।'

লিয়ারিকে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের মত লাগে সিসকোর। লোকটার জ্ঞান বা ক্ষমতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, অথচ ঈশ্বরের মতই সে একটা ধূম্রজালের ভেতর বাস করে। এই তো, সেই লস অ্যাঞ্জেলেসে বসে নিখুঁতভাবে বলে দিচ্ছে শিকার কী করছে না করছে। পারে কী করে?

'শুনতে পেয়েছ যা বলেছি?' ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করা

হলো।

'হ্যাঁ,' বলল সিসকো।

লাইন কেটে গেল।

'তুমি আমার মন পড়তে পারছ!' বিস্মিতকণ্ঠে বলল রানা। ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। স্রেফ গল্প শুনেছে মাইণ্ডরিডিঙের; বাস্তবে দেখবে, কখনও কল্পনা করেনি। ম্যাজিশিয়ানরা তাদের স্টেজ শো-তে যা দেখায়, সবাই জানে সেটা সম্পূর্ণ সাজানো নাটক। কিন্তু... এখানে তো নাটকের কোনও সুযোগই নেই।

'ঠিক পড়া বলা যায় না একে,' অ্যালি বলল। 'পড়া বললে মনে হয় যেন আমি ইচ্ছে করে করছি কাজটা। আসলে তা নয়। বরং শোনা বলতে পারো। চাই বা না-চাই, তোমার মনের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি আমি। এটা বন্ধ করার কোনও কায়দা নেই।'

'সব শুনতে পাও? প্রতিটা চিন্তা-ভাবনা?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। 'হুঁ। মাঝে মাঝে মাথায় জট পাকিয়ে যায়। বুঝতে পারি না, চিন্তাটা আমার, নাকি অন্য কারও। যেমন ধরো, হঠাৎ ভয় ভয় করে উঠল; কিন্তু বলা মুশকিল, ভয়টা সত্যিই আমি পাচ্ছি, নাকি অন্য কেউ পাচ্ছে। অবশ্য... পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, এমন চিন্তার সংখ্যাও কম নয়। এই যেমন এখন তোমারটা বুঝলাম।'

'আরও অনেক কিছুই নিশ্চয়ই শুনেছ,' বলল রানা। 'কী বুঝলে?'

'বুঝলাম: আসলে তুমি খুব ভাল মানুষ। আমার ওপর মায়া পড়ে গেছে তোমার, আমাকে রক্ষা করা নিজের দায়িত্ব বলে ভাবছ। আমাকে দেখে অন্য কারও কথা মনে পড়ে যাচ্ছে... সেই স্মৃতি একই সঙ্গে আনন্দ আর কষ্টের। মেয়েটার নাম লুবনা, তাই না?'

টেনশনে পড়ে গেল রানা। এখন থেকে কি তা হলে ভাবনা-চিন্তার লাগাম টানতে হবে? সেটা কি আদৌ সম্ভব?

‘খামোকা দুশ্চিন্তা করছ,’ বলল অ্যালি।

থতমত খেয়ে গেল রানা। মুখ দিয়ে কিছু বলার আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর।

‘সরি,’ অ্যালিকে বিব্রত দেখাল। ‘কাজটা ঠিক করিনি। এরপর থেকে তুমি মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।’

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল রানা। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সামনের রাস্তায়। একটু পর জিজ্ঞেস করল, ‘কীভাবে করছ তুমি এসব? কৌশলটা কী?’

‘আমার জানা নেই।’

‘কতদিন থেকে মাইণ্ডরিডিং করতে পারছ তুমি?’

‘অন্তত গত দু’মাস। এর আগের কথা বলতে পারি না।’

অ্যালির গলায় অনিশ্চয়তার ছাপ। অদ্ভুত ক্ষমতাটা নিয়ে সে নিজেও বোধহয় অস্বস্তিতে ভুগছে।

‘ইয়ে... একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আমি কিছু শুনতে পাই না,’ অ্যালি জানাল। ‘তোমার যদি কখনও প্রাইভেসির প্রয়োজন হয়, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেয়ো।’

কপালের দু’পাশের ঠাণ্ডা দপদপানিটা এখনও যায়নি রানার। হাইওয়ের পাশে পৌঁছুনোর পর প্রথম টের পেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, তার আগেও ছিল। শহরে... বোর্ডওয়াকে... মানে, মেয়েটাকে প্রথম দেখার সময় থেকেই।

‘ওটার জন্যে আমি দায়ী,’ বলে উঠল অ্যালি। ‘আমার ব্রেন যা করছে, তার প্রভাবে ওই দপদপে ব্যথা হয়। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?’

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে কথাটা বলল ও। রানা বুঝল, মনে মনে ভয় পাচ্ছে বেচারি। ভাবছে, ওর বিদঘুটে ক্ষমতার কথা শুনে ঘাবড়ে যেতে পারে রানা... ওকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে।

‘নাহ্, ব্যথাটা খুব সামান্য,’ মেয়েটাকে আশ্বস্ত করল ও। ‘খেয়াল না করলে টেরই পাচ্ছি না।’

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। সিটের ওপর তুলে আনল দু’পা। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে পা-দুটো জড়িয়ে ধরল দু’হাত দিয়ে। কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে ওকে।

চার মিনিট লাগবে পিকআপটাকে ওভারটেক করতে। কোস্ট হাইওয়ের আঁক-বাঁকের কারণে এখনও ওটার টেইললাইট দেখতে পাচ্ছে না সিসকো, তবে মনে মনে হিসেব কষে নিয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনটা এক ঝলক দেখে নিল সে। ভ্যানের মাঝখানের সিটে বসে আছে তার দলের তিন সদস্য, হাতে লোডেড ওয়েপন। লোকগুলোর মুখ অভিব্যক্তিহীন। যন্ত্রের মত দায়িত্ব পালন করতে চলেছে, সেখানে আবেগের কোনও স্থান নেই।

‘গাড়িটাকে থামাবার কোনও প্রয়োজন নেই,’ ওদেরকে বলল সিসকো। ‘খুন করার জন্যে গুলি ছুঁড়বে। প্রথমে টার্গেট করবে মেয়েটাকে।’

‘হাসপাতালের মত একটা জায়গায় আটকে রেখেছিল আমাকে,’ নীরবতা ভেঙে বলল অ্যালি। ‘তবে ওটা হাসপাতাল না। আমি ছাড়া অন্য কোনও রোগী ছিল না ওখানে। আর ছিল কিছু লোক—আমাকে দেখাশোনার জন্যে।’

‘আজ রাতে ওখান থেকেই পালিয়ে এসেছ?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি।

জায়গাটা কোথায় হতে পারে, ভেবে দেখল রানা। শহর হিসেবে এল্ সেডেরো বেশ ছোট। পরিত্যক্ত কোনও

হাসপাতাল নেই ওখানে। তবে যেদিক থেকে মেয়েটা দৌড়ে এসেছে, সেদিকে বেশ বড়-সড় একটা অফিস কমপ্লেক্স আছে। বিশাল একটা এলাকা জুড়ে ছোট ছোট অসংখ্য বিল্ডিং, তাতে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের অফিস, গুদাম, শো-রুম, ইত্যাদি। এসব জায়গায় সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, পাশের বিল্ডিঙে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

'হ্যাঁ, বিল্ডিংটা ওখানেই,' অ্যালি বলল। 'কমপ্লেক্সের একদম পেছন দিকে। কাছাকাছি আর কোনও বিল্ডিং ছিল না।'

চুপচাপ শুনছে রানা। এখনও হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে মেয়েটা। চোখ সামনের দিকে।

'দু'মাস আগে ওখানে জেগে উঠি আমি,' বলে চলল অ্যালি। 'চোখ খুলতেই দেখি, হাসপাতালের বিছানায় বেঁধে রাখা হয়েছে আমাকে। নিজের পরিচয়, বা কীভাবে ওখানে গেলাম—কিচ্ছু মনে করতে পারিনি। মাঝে মাঝে সোনালি চুলের একজন ডাক্তার আসত... আমাকে ইঞ্জেকশন দিত, কিংবা হাতে লাগিয়ে দিত স্যালাইন। আজ আমাকে যারা ধাওয়া করছে, এরাও আসত কখনও কখনও। বাঁধন খুলে আমাকে হাঁটাচলা করতে দিত, তারপর আবার বিছানায় শুইয়ে আটকে দিত সব স্ট্র্যাপ। একটা কথাও বলত না কেউ, অস্ত্র তাক করে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকত। কতবার ডেকেছি ওদের... কতবার প্রশ্ন করেছি... অথচ কিচ্ছু বলেনি। কী ঘটছে, কেন ঘটছে, তার কোনও ধারণাই ছিল না আমার।'

দম নেবার জন্যে একটু থামল ও। এই সুযোগে রিয়ারভিউ মিররে চোখ বুলিয়ে নিল রানা।

'কয়েকদিন কেটে গেলে হঠাৎ লক্ষ করলাম, অদ্ভুত সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়,' আবার বলতে শুরু করল অ্যালি। 'প্রথমে ভেবেছিলাম, বোধহয় স্মৃতি ফিরে আসছে।

কিন্তু পরে টের পেলাম, আসলে তা নয়। চিন্তাগুলো বড্ড এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। ওগুলো আমার হতেই পারে না। যেমন ধরো, বউকে নিয়ে ভাবনা—ওটা আমার মাথায় আসবে কেন? কিংবা ধরো, বেতনের টাকা জমানোর চিন্তা। সোনালিচুলো ওই ডাক্তার বা অন্যেরা কামরায় এলেই ওসব বেশি বেশি শুনতাম। একটা সময় বুঝে ফেললাম কী ঘটছে।'

আরেকটা ট্রেইলারকে পাশ কাটাল রানা। সামনের রাস্তা একদম ফাঁকা, দৃষ্টিসীমার মাঝে কোনও গাড়ি নেই।

'যা কিছু জেনেছি, সব ওই লোকগুলোর মাথা থেকে,' বলল অ্যালি। 'খুব বেশি জেনেছি বলা যাবে না, কারণ ওরা নিজেরাই কিছু জানত না। ওদেরকে পাঠানো হয়েছিল স্রেফ আমাকে ওখানে আটকে রাখার জন্যে। আমি কোত্থেকে এসেছি, বা আমার সত্যিকার পরিচয় কী—তা জানা ছিল না ওদের। তবে ওরা আমার ক্ষমতার কথা জানত... ওদেরকে কাজে পাঠাবার আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল আমার ব্যাপারে। কিন্তু কীভাবে পেলাম এই ক্ষমতা, বা কীভাবে পুরো ব্যাপারটা কাজ করে, সেসব জানা ছিল না লোকগুলোর। আমিও তাই জানতে পারিনি।'

'কিন্তু অন্যান্য বিষয় তো জানত?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে... কার হয়ে কাজ করছে, সেটা? আমেরিকান সরকার, নাকি কোনও প্রাইভেট ফার্ম?'

'সরি, তাও জানতে পারিনি। আমার কাছে বেশি সময় থাকত না ওরা। আর থাকলেও ওসব নিয়ে কখনও ভাবত না। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, বুঝলে? বেশিরভাগ সময়ে মানুষের মাথায় আবোল-তাবোল চিন্তা খেলা করে। ধরো, কারও সঙ্গে কখনও ঝগড়া হয়েছে, সেই ঝগড়াই মাথার ভেতর ঘুরপাক খায়। কী করলে ঝগড়াটা এড়ানো যেত, বা কী বললে রাগ ভাঙানো যেত—এসব নিয়ে ভাবে। কখনও বা মনে মনে পছন্দের গান গায় বা ছোটবেলার কথা ভাবে।

কোনও ধরনের দুশ্চিন্তা যদি মাথায় ঢোকে, সেটা বার বার উল্টেপাল্টে দেখে। আমার যেটা দরকার ছিল... মানে, লোকগুলোর নাম, বা কোথায় কাজ করে... সেসব কখনোই কাউকে ভাবতে শুনিনি। তুমি নিজের কথাই ভাবো। শেষ কবে মনে মনে নিজের নাম উচ্চারণ করেছ তুমি?'

'কথা সত্য,' স্বীকার করল রানা।

'আর যখন মানুষ সচেতনভাবে চিন্তা করে, তখন সে অজানা বিষয় বা অনিশ্চয়তা নিয়ে মাথা ঘামায়। আমার মত ওদের মাথাতেও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খেত—আমি কে? কোত্থেকে এসেছি? ওদের জানা ছিল না। তবে হ্যাঁ, একবার একটা লোকের নাম শুনেছি ওদের চিন্তায়। খুব ক্ষমতাবান এক লোক—ওরা সম্ভবত তার হয়ে কাজ করে—লোকটার নাম লিয়ারি।'

নামটা চেনা চেনা লাগল রানার। পরিষ্কার মনে পড়ছে না, তবে মনে হচ্ছে, আমেরিকার প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারি যেসব ফার্ম কাজ করে, তারই কোনোটার শীর্ষপদে আছে এ-লোক। ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টর বলে এদেরকে। তবে নামেই বেসরকারি, আসলে এসব ফার্ম আমেরিকান সরকারের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। যেসব অনৈতিক কাজ সরকারিভাবে করা যায় না, সেগুলো করানো হয় বেসরকারি ফার্মের ছায়ায়।

'লোকটাকে সবাই ভয় পায়,' অ্যালি বলল। 'ওকে নিয়ে কমবেশি ভাবতে শুনেছি সবাইকে। সবচেয়ে বেশি ভাবত আমার ডাক্তার। লিয়ারির কথা মনে পড়লেই ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত সে। এই ডাক্তারের মাথা থেকেই সবচেয়ে বেশি তথ্য পেয়েছি আমি। আমার কামরার পাশেই ছিল তার অফিস। সে ভেবেছিল, ওটা আমার রেঞ্জের বাইরে, কিন্তু তা নয়।'

'কী কী জেনেছ তার কাছ থেকে?'

চোখ বন্ধ করল অ্যালি। মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে কথা। খানিক পর বলল, 'আমার কাছ থেকে ইনফরমেশন আদায় করার দায়িত্ব পেয়েছিল ওরা। সেজন্যেই আমাকে ইঞ্জেকশন আর স্যালাইন দিচ্ছিল। ওসব ওষুধ দিলে নাকি ঘুমের মধ্যে কথা বলে মানুষ—অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে আসে সব সত্য। অনেকটা সম্মোহনের মত একটা ব্যাপার। স্মৃতি চলে যাওয়া... এটা ওই ওষুধগুলোর সাইড-ইফেক্ট। ডাক্তারের চিন্তা থেকে জেনেছি, ওষুধের কারণে জেগে থাকা অবস্থায় স্মৃতিগুলো চাপা পড়ে যায়, কিন্তু ঘুমালে সব আবার ভেসে ওঠে। তখন যা কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, তার জবাব ঠিক ঠিক দিতে পারি আমি।'

কথাগুলো বলতে বলতে কেঁপে যাচ্ছে মেয়েটার কণ্ঠ। ভয় পাচ্ছে সে।

'কিন্তু ঘুমের ভেতর যা যা বলছ, তা তো ডাক্তার শুনতে পাচ্ছে,' রানা বলল। 'ওর মাথা থেকে সেসব জানতে পারোনি?'

'না,' অ্যালি মাথা নাড়ল। 'কারণ ও আমাকে জেরা করত না। আমি ঘুমিয়ে গেলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন একদল লোক আসত, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। তখন কামরায় কাউকে থাকতে দিত না ওরা। আমার ঘুম ভাঙার আগেই আবার চলে যেত লোকগুলো। ডাক্তার বা নিরাপত্তারক্ষীরা ওদের পরিচয় জানে না। আমাকে কী নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, বা আমি কী জবাব দিচ্ছি—সেসব জানার কোনও উপায় ছিল না ওদের।' একটু থামল ও। 'আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত লাগছে তোমার?'

রাস্তা থেকে চোখ সরাল না রানা। অ্যালির কথাগুলো অদ্ভুত নয় মোটেই। ও নিজে অন্তত তিনটে নারকোটিক এজেন্টের নাম বলতে পারবে, যেগুলোর সাহায্যে ঘুমন্ত মানুষকে ইন্টারোগেট করা যায়... যেগুলো সাবজেক্টের

স্মৃতিভ্রংশ ঘটায়। এমন ঘটনা রানার নিজের জীবনেই ঘটেছে—ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের দেয়া ওষুধের প্রভাবে পুরোপুরি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিল ও, সুস্থ হবার জন্যে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছিল অ্যাসপেন নামে এক ছোট্ট পাহাড়ি শহরে।*

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল অ্যালি। সন্দেহ নেই, রানার চিন্তাটা শুনতে পেয়েছে।

'আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা বাকি তোমার,' অভয় দেবার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'সময়মত খুলে বলব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সামনে তাকাল মেয়েটা।

'যে-ইনফরমেশন ওরা তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছে...' বলল রানা, '...সেটা কি ভয়ঙ্কর কিছু? কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি নিজেও ভয় পাচ্ছ।'

মুখে জবাব দিল না, শুধু মাথা ঝাঁকাল অ্যালি।

'কেন ভয় পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমার তো কিছু মনে নেই।'

'আমি ভয় পাচ্ছি ওদেরকে ভয় পেতে দেখে। ওই ইনফরমেশনের ব্যাপারে যাদের ধারণা আছে... মানে, লিয়ারি ও তার সঙ্গীসাথীরা... তাদের অনেককেই চেনে আমার ডাক্তার আর গার্ডেরা। ওদের চিন্তা থেকে জেনেছি, লোকগুলো ভয়ানক আতঙ্কের মধ্যে আছে—বড় ধরনের কোনও দুর্যোগ, যুদ্ধ বা মহামারীর খবর পেলে যেমন ভয় পায় মানুষ, ঠিক সেরকম! ওদের হাবভাবে মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা আসছে... একমাত্র আমিই জানি তার খবর।'

নিজের অজান্তে কেঁপে উঠল রানা। কথাগুলো হালকাভাবে নিতে পারছে না।

বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। 'ব্যস, যা যা জানি, সব খুলে বললাম তোমাকে। তুমি ঠিকই ধরেছ, রানা, আমার

---

* *অখণ্ড অবসর* দ্রষ্টব্য।

সত্যিই খুব ভয় করছে।'

ওকে কিছু বলতে চাইছিল রানা, কিন্তু থেমে গেল আয়নায় নতুন একজোড়া হেডলাইট উদয় হতে দেখে। দূর থেকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা, বেপরোয়া গতিতে ওভারটেক করল একটা গাড়িকে। অ্যালিও টের পেয়েছে ব্যাপারটা—রানাকে দেখে কিংবা ওর মনের কথা পড়তে পেরে। পা নামিয়ে সামনে ঝুঁকল ও, চোখ রাখল প্যাসেঞ্জার সাইডের মিররে।

রিয়ারভিউ মিরর থেকে চোখ সরায়নি রানা, বুঝতে চাইছে নবাগত গাড়িটার উদ্দেশ্য। ওভারটেক করা গাড়িটার সামনে চলে এসেছে ওটা, পেছন থেকে আলো পড়ায় ফুটে উঠেছে অবয়ব।

হুইলের ওপর রানার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। ওটা একটা ভ্যান।

মনিটরে ভেসে ওঠা ফোর্ড পিকআপটার দিকে তাকিয়ে আছে লিয়ারি, থারমাল ইমেজে ওটার ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট আর ক্যাব ছড়াচ্ছে নীলচে দ্যুতি। তিনটা ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল থেকে ট্র্যাক করা হচ্ছে গাড়িটাকে। চতুর্থ আরেকটা মিরাণ্ডাকে ইতিমধ্যে কাজে নামানো হয়েছে—ওটা থেকে পাওয়া যাচ্ছে ওয়াইড ভিউ, ফলে দেখা যাচ্ছে সিসকো ও তার দলের ভ্যানটাকেও। দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওরা। হাবভাবে মনে হচ্ছে, ধাওয়াকারীদের দেখতে পায়নি রানা; আগের গতিতেই এগোচ্ছে তার পিকআপ।

লিয়ারির সেলফোন বেজে উঠল। ফোনের স্ক্রিনে জ্যাকসনের নাম ভেসে উঠতে দেখল সে। লোকটা তার সহকারী, তাকে মাসুদ রানার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে বলেছে সে। সে-বিষয়েই সম্ভবত রিপোর্ট দেবার জন্যে ফোন করেছে। কল রিসিভ করল না লিয়ারি, এখন ওসব

তথ্যের প্রয়োজন নেই। সামনের মনিটরে যে-নাটকের সূত্রপাত হতে চলেছে, এ-মুহূর্তে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। লিয়ারি আশা করছে, দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটা সম্পন্ন করবে সিসকোর টিম। রানা একজন অভিজ্ঞ ইনভেস্টিগেটর হতে পারে, কিন্তু সশস্ত্র লড়াইয়ে ওদের সঙ্গে তার কোনও তুলনা চলে না। সিসকোর দলের প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিক... আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত... সবচেয়ে বড় কথা, অপ্রস্তুত অবস্থায় শিকারকে চমকে দিতে চলেছে ওরা।

পিকআপের পাঁচশো গজের ভেতর পৌঁছে গেছে ভ্যান। পালাবার কোনও পথ নেই রানার।

রিং হতে হতে থেমে গেল লিয়ারির ফোন।

ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে ভ্যান—রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে রানা। শুরুতে গতি কমিয়েছিল, যাতে সন্দেহ না জাগে, তবে খানিক পরেই আবার বাড়িয়েছে গতি। গত পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে অর্ধেক দূরত্ব কমিয়ে এনেছে পিকআপের সঙ্গে।

'কীভাবে ওরা খুঁজে পেল আমাদের?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অ্যালি।

হাইওয়ের পাশে অপেক্ষা করার সময় কীসের আভাস দিচ্ছিল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, তা এবার বুঝতে পারছে রানা। তিক্ত গলায় বলল, 'স্যাটেলাইট... স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে ওরা। একটা, কিংবা আরও বেশি।'

সমস্যাটা ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখতে শুরু করল ও। কতটা আধুনিক স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে লিয়ারি, জানা নেই। তবে আকাশ থেকে যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই গাড়ি ফেলে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করা বৃথা।

স্যাটেলাইটের থারমাল ক্যামেরায় ওদেরকে ট্র্যাক করতে পারবে লোকটা, পেছনে লেলিয়ে দেয়া খুনিদের গাইড করতে পারবে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, সমীকরণ থেকে সরাতে হবে ওই খুনিগুলোকে... আর সেটা বেশ বাজে কায়দায়।

অবাক ব্যাপার, অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করল রানা। অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন হলো ফিল্ডের বাইরে ও... শরীরে যেন জং ধরে গিয়েছিল, নিজেকে দুর্বল-অক্ষম মনে হচ্ছিল। কিন্তু আজ, বিপদের মুখে আবারও সচল হয়ে উঠেছে দেহ-মন। উন্মুখ হয়ে উঠেছে অ্যাকশনে নামার জন্যে। এটাই ওর জীবন, এই সংঘাত ওর অস্তিত্বের অংশ।

'তুমি দেখছি আর ভয় পাচ্ছ না,' বলে উঠল অ্যালি। 'খুব ভাল। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না—তুমি এখনও গাড়ির স্পিড বাড়াচ্ছ না কেন?'

'ওদেরকে বোকা বানাবার জন্যে,' বলল রানা। 'ওরা ভাববে, আমরা কিছু টের পাইনি... আমাদেরকে চমকে দিয়ে হামলা করা যাবে। আসলে চমক অপেক্ষা করছে ওদেরই জন্যে!'

সামনে একটা বড় ট্রাক দেখা গেল। ওটাকে ওভারটেক করার মত যথেষ্ট সময় আছে কি না কে জানে। ভ্যানটা প্রায় ঘাড়ের ওপর উঠে এসেছে। হঠাৎ রানা বুঝে ফেলল, কী করতে হবে ওকে। রাস্তাটা সেজন্যে একদম আদর্শ—দুটো মাত্র লেইন, বামে কংক্রিটের ডিভাইডার, ডানে গার্ডরেইল... রেইলের ওপারে বিপজ্জনক ঢাল, সাগরে গিয়ে মিশেছে। রাস্তার দু'পাশে কোনও বাড়তি জায়গাও নেই। ফ্রিওয়ে হলেও রাস্তাটার সঙ্গে একটা টানেলের বিশেষ পার্থক্য নেই। এমনটাই তো চাই!

অ্যালির দিকে এক পলক তাকাল রানা। 'আমার প্ল্যান তুমি জেনে গেছ, তাই না?'

নার্ভাসভাবে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। শক্ত করে আঁকড়ে

ধরল প্যাসেঞ্জার ডোরের আর্মরেস্ট। ঝড়-ঝাপটা শুরু হবে এখুনি।

ঝুঁকি নিয়ে স্পিড সামান্য বাড়াল রানা। ইণ্ডিকেটর জ্বেলে লেইন বদলাল, ওভারটেক করতে শুরু করল ট্রাকটাকে। পেছনে ভ্যানটাও লেইন বদলাল, এরপর খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল দু'পক্ষের মাঝখানের দূরত্ব ঘোচাতে।

মনিটরের ওপর আঠার মত সেঁটে রয়েছে লিয়ারির দৃষ্টি। থারমাল ইমেজের রঙিন বিন্দুগুলো দেখে বুঝতে চাইছে ঘটনা। টেনশন কেটে গেছে অনেকখানিই। বিশ্রী সমস্যাটার সমাধান হতে চলেছে খুব শীঘ্রি।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ হলো। করিডোর থেকে এক টেকনিশিয়ান ঢুকেছে কামরায়। হাতে কর্ডলেস ফোন।

'মাফ করবেন, স্যর,' বলল সে। 'জ্যাকসনের ফোন। খুব নাকি জরুরি।'

পর্দা থেকে চোখ সরাল না, হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল লিয়ারি। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'কী এমন ঘটেছে যে, ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে পারছ না তুমি?'

'সরি, স্যর। কিন্তু ইনফরমেশনটা আপনার জানা থাকা উচিত,' ওপাশ থেকে বলল জ্যাকসন। 'সেলফোনেই ট্রাই করেছিলাম, আপনি ধরলেন না...'

'অযথা সময় নষ্ট করছ। যা বলার, ঝটপট বলে ফেলো।'

'ব্যাপারটা মাসুদ রানাকে নিয়ে, স্যর। আমি ওর ফাইল জোগাড় করেছি। লোকটা সাধারণ কোনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নয়। সিসকো যদি ওর পেছনে লেগে থাকে, তাকে সাবধান করে দেয়া দরকার।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নয়?' ভ্রূকুটি করল লিয়ারি। 'তা হলে কে ও?'

'এসপিয়োনাজ এজেন্ট, স্যর। বাংলাদেশ কাউণ্টার

ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট এই মাসুদ রানা। ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিটা আসলে বিসিআইয়ের কাভার, এই লোক ওটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে ওর। এক্স-আর্মি অফিসার, সৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট, চ্যাম্পিয়ন কার-রেসার, দক্ষ স্নাইপার, ফার্স্ট ক্লাস কমাণ্ডো, ইউএন অ্যান্টি-টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট... লিস্টটা আরও অনেক-অনেক লম্বা। এর কোয়ালিফিকেশনের সামনে সিসকো বা তার টিমের লোকজন কিছুই না।'

আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল লিয়ারির শিরদাঁড়া বেয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল মনিটরে। স্পিড লিমিট বজায় রেখে অলসভাবে চলছে রানার পিকআপ। পেছন থেকে গতি বাড়িয়ে ওটাকে ধরতে যাচ্ছে সিসকোর ভ্যান। গলদটা এতক্ষণে ধরতে পারছে লিয়ারি। রানার মত অভিজ্ঞ লোক ভ্যানটাকে দেখতে পায়নি, তা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা করবে সে... অপ্রত্যাশিত কিছু। কী সেটা?

কর্ডলেস ফোনটা ফেলে দিল লিয়ারি, তাড়াতাড়ি হাতে নিল নিজের সেলফোন।

ছয়

ট্রাকটার নাকের পাশে পৌঁছে গেছে পিকআপ, দেখতে পেল সিসকো। পেছনের কাঁচ ভেদ করে ফুটে উঠেছে রানা আর মেয়েটার অবয়ব।

‘ওরা ডানের লেইনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব,’ সঙ্গীদের বলল সে। ‘এরপর বামের লেইন ধরে ওদের পাশে হাজির হব আমরা। বলামাত্র গুলি করবে।’

মাঝখানের সিটে বসা তিন খুনি ডানে ঘুরে গেল। পেছনের সিটে বসা একজন ধরল স্লাইড ডোরের হাতল, সঙ্কেত পেলেই ঝটকা দিয়ে খুলে দেবে দরজা।

সিসকোর সেলফোন বাজতে শুরু করেছে। লিয়ারির কল। ধরতে গিয়েও ধরল না সিসকো। কথা বলার সময় নেই এখন, মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। সামনে, রানাকে ডানের লেইনে চলে যেতে দেখল সে; পিকআপটা ঢাকা পড়ে গেল ট্রাকের আড়ালে। অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল সিসকো, তুমুল বেগে পেরোতে শুরু করল ট্রাকটাকে। পিকআপের পাশে পৌঁছুতে দশ সেকেণ্ডও লাগবে না। হাত তুলে ইশারা দিল, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল স্লাইড ডোর। উদ্দাম বাতাস ঢুকে পড়ল ভ্যানের ভেতরে। খুনিরা তাদের এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান উঁচু করল, সঙ্কেত পেলেই ট্রিগার চাপবে।

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল সিসকোর। ব্যাপারটা ছেলেখেলা হতে চলেছে। বেচারা মাসুদ রানা, কোত্থেকে কী হলো বোঝার সময়ই পাবে না। তার আগেই রওনা দেবে পরপারে। এই তো, তাকে ধরে ফেলেছে প্রায়। ট্রাকের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পিকআপটাকে।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল তার। ইণ্ডিকেটর জ্বেলেছে রানা। আস্তে করে চলে এল বামের লেইনে... একেবারে ভ্যানের সামনে। কারণটা কী? সামনে আর কোনও গাড়ি নেই যে, ওভারটেক করবে। তা হলে?

‘ব্যাটা করছেটা কী!’ নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠল সিসকো।

আয়নায় ভ্যান আর ট্রাকের পজিশন দেখে নিল রানা।

পিকআপের ঠিক পেছনে রয়েছে ভ্যান। টেইলগেট থেকে ভ্যানের নাকের দূরত্ব মোটামুটি দশ ফুট। ট্রাকটা বামের লেইনে, আরও দশ গজ পেছনে। ঠিক এমনটাই চেয়েছিল ও। এখন টাইমিংই সব। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভেতর চাল দিতে হবে ওকে। তারপর যা ঘটবে, তা আর ভাবতে চাইল না।

পাশ থেকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল অ্যালি। সিটবেল্ট টেনে শক্ত করে বাঁধল।

'রেডি?' ওকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তা হলে শুরু করা যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপল ও—হার্ড ব্রেক। শরীরের পুরো ওজন চাপিয়ে দিল ব্রেক প্যাডালের ওপর। বিশ্রী একটা শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে, রাস্তার পেভমেণ্টে ঘষা খাচ্ছে টায়ার। দেখা দিল ধোঁয়া। ড্যাশবোর্ডের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা আর অ্যালি, সিটবেল্ট বাঁধা না থাকলে নাক-মুখ ঠুকে যেত।

ভ্যানের আরোহীদের জন্যে ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। সামনের গাড়িটাকে থমকে যেতে দেখে আঁতকে উঠল তারা—এখুনি পিকআপের পেছনে গিয়ে বাড়ি খাবে ভ্যান। ডানে গার্ডরেইল, কিন্তু ওদিক ছাড়া আর কোনও দিকে যাবার উপায় নেই। বনবন করে ওদিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল সিসকো, কোনোমতে এড়াল সংঘর্ষ। আধ ইঞ্চির জন্যে ঘষা লাগল না পিকআপের গায়ে, কোনাকুনিভাবে ডানের লেইনে ঢুকে পড়ল ভ্যান। ওটার নাক নিজের জানালা বরাবর আসতে দিল রানা, পরক্ষণে ব্রেক ছেড়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল, একই সঙ্গে ডানে ঘোরাল হুইল। ধাম করে ভ্যানের সামনের অংশে ধাক্কা দিল পিকআপ।

ব্যস, যা হবার ওতেই হয়ে গেল। সত্তর মাইল স্পিডে ছুটছিল ভ্যান, ওই অবস্থায় ধাক্কা খেয়ে বেসামাল হয়ে গেল।

গিয়ে আছড়ে পড়ল ডানের গার্ডরেইলে। নাক তুবড়ে গেল, পেছনটা উঁচু হয়ে গেল, কিন্তু থামল না। প্রবল গতিবেগের কারণে কাত হয়ে গড়ান দিল কয়েকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দুটো দেহকে বাইরে উড়ে যেতে দেখল রানা... খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়েছে—কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়ল, কে জানে।

সর্বনাশের তখনও বাকি ছিল। দুর্ঘটনা দেখেই ব্রেক কষেছে ট্রাকের ড্রাইভার, কিন্তু বিশাল যন্ত্রদানব ওই অল্পখানি দূরত্বে থামতে পারল না। চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে ক্রুদ্ধ পশুর মত ঢুঁস মারল গড়াতে থাকা ভ্যানের গায়ে। ফুটবলের মত ছিটকে গেল ভ্যানের পুরো কাঠামো, কয়েক গজ উড়ে গিয়ে পেভমেন্টের ওপর পড়ল, এরপর গড়াতে শুরু করল নতুন উদ্যমে। শেষে যখন থামল, গাড়ি বলে চেনা যায় না আর। লোহার একটা তালে যেন পরিণত হয়েছে। ভেতরে আটকা পড়েছে সিসকো ও তার বাকি সঙ্গীরা। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ফেটে গেছে ফিউয়েল ট্যাঙ্ক... গড়ান খাবার সময় ফুলকি তুলেছিল ভ্যান, সেই ফুলকি থেকে আগুন লেগে গেছে তেলে। ধীরে ধীরে লেলিহান শিখা গ্রাস করছে ভ্যানের ধ্বংসস্তূপকে।

পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গাড়ি থামাল রানা। দরজা খুলে নেমে এল পিকআপ থেকে। উল্টো ঘুরে ভালমত দেখল দৃশ্যটা। চেসিসের ভেতরে আটকা পড়া খুনিরা জ্যান্ত কাবাব হতে শুরু করেছে। আবছা একটা আর্তনাদ ভেসে এল, তারপর সব চুপ। ট্রাক ড্রাইভারকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখল। বেচারা হয়তো ভাবছে, দুর্ঘটনার জন্যে পুলিশ তাকেই দায়ী করবে। ভ্যান থেকে ছিটকে বেরুনো মানুষদুটোকেও দেখতে পেল রানা, অ্যাসফল্টের ওপর মুখ থুবড়ে নিশ্চল পড়ে আছে। মারা গেছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। তবে বেঁচে থাকলেও লিয়ারির কাজে আসবে না আর কোনোদিন।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে পিকআপে আবার উঠে

বসল রানা। চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালি।

'সরি,' ওকে বলল রানা। 'ওদেরকে ঠেকাবার আর কোনও উপায় ছিল না।'

আরও কিছু বলবে ভেবেছিল, কিন্তু বলল না। ওর মনের কোনও কথাই অজানা নেই মেয়েটার। তা ছাড়া সময়ও নেই হাতে। স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় গ্রাউণ্ড টিমের পরিণতি দেখতে পেয়েছে লিয়ারি, খুব শীঘ্রি নতুন টিম পাঠাবে... আর সেটা আকাশপথে। বাঁচতে চাইলে স্যাটেলাইটের চোখকে ফাঁকি দিতে হবে, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব, এখনও জানে না রানা। কিছু কৌশল জানা আছে ওর, সেগুলো সবই সময়সাপেক্ষ। অত সময় পাবে কি না, বলা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি গিয়ার দিয়ে পিকআপকে ছোটাতে শুরু করল। স্পিড লিমিটের পরোয়া করছে না আর।

খানিক পর ঘাড় ফেরাতেই অ্যালির চোখ ছলছল করতে দেখল ও।

'কী হয়েছে, অ্যালি?'

তাড়াতাড়ি চোখ মুছল মেয়েটা। বলল, 'কিছু না।'

'তা হলে কাঁদছ কেন? আমি তো...'

'জানি। যা করেছ, তা আমাকে বাঁচাবার জন্যে করেছ। আর কোনও বিকল্প ছিল না। কাঁদছি নিজের কারণে।'

'চাইলে আমাকে খুলে বলতে পারো। কথা বললে মন হালকা হবে।'

একটু অপেক্ষা করল অ্যালি। তারপর বলল, 'তুমি যখন ওদেরকে ধাক্কা দিলে, আর ওরা গিয়ে ডিভাইডারে বাড়ি খেল... ভ্যানটা তখন একদম কাছে ছিল। এত কাছে যে, আমি ওদের সবার মনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। অ্যাকসিডেণ্ট হতে দেখেই ওরা বুঝে ফেলেছিল, মারা যেতে বসেছে। আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরটা ওলটপালট

হয়ে গিয়েছিল ওদের। সাহস, শক্তি, পৌরুষ, ট্রেইনিং... ভুলে গিয়েছিল সব। মৃত্যুভয় ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না ওদের মাঝে।'

রানার দিকে ঘুরে বসল মেয়েটা।

'জানো,' বলল ও, 'ওদের অবস্থা দেখে একটুও খারাপ লাগেনি আমার, বরং আনন্দ হয়েছে। মনে মনে বলেছি, *মর, শয়তানেরা! এটাই তোদের প্রাপ্য!* কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওভাবে ভাবা ঠিক হয়নি। কেন ওদের মৃত্যু কামনা করলাম? কেন ওদেরকে মরতে দেখে আনন্দ পেলাম? কেন যেন খুব খারাপ লাগছে এখন।'

আবার চোখ মুছল অ্যালি।

'মন খারাপ কোরো না,' নরম গলায় বলল রানা। 'আক্রোশের কারণে ওভাবে ভেবেছ। এর মানে এই নয় যে, তুমি মানুষটাই অমন নিষ্ঠুর। তা ছাড়া... ওদের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। ওরা তোমাকে খুন করতে চাইছিল!'

'তাও... নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে আমার।' আবার সিটে পা তুলে হাঁটুতে থুতনি রাখল অ্যালি। 'দুঃখিত, এবার বোধহয় আমার বকবকানি থামানো উচিত। চিন্তা-ভাবনার জন্যে সময় দরকার তোমার।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' ড্রাইভিঙে মনোযোগ দিল রানা।

সাত

কম্পিউটার রুমে ব্যস্ততা। হুপারকে সাহায্য করার জন্যে

চারজন অ্যানালিস্ট ডেকে এনেছে লিয়ারি—ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তারা। ইন্টারস্টেট ১০১ ধরে শিকার কোথায় যেতে পারে, তা বিশ্লেষণ করছে। রানার পরবর্তী চাল্ল আঁচ করার ওপর নির্ভর করছে অপারেশনের সাফল্য। চালু লোক এই মাসুদ রানা... স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে ওদেরকে ট্র্যাক করা হচ্ছে, তা জানে নিঃসন্দেহে; নিশ্চয়ই মিরাণ্ডার চোখগুলোকে ফাঁকি দেবার উপায় খুঁজছে।

একটা সুবিধে অবশ্য পাচ্ছে লিয়ারি। আমেরিকান স্যাটেলাইটের প্রযুক্তি গত কয়েক বছরে কতখানি এগিয়ে গেছে, তা জানার কথা নয় একজন বাঙালি স্পাইয়ের। সাধারণ স্যাটেলাইটকে ধোঁকা দেবার কলাকৌশল হয়তো সে জানে, কিন্তু সেসব কৌশল মিরাণ্ডার বেলায় কাজ করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, মাত্র আধঘণ্টা রানাকে চোখে চোখে রাখলেই কার্যোদ্ধার হবে। ফ্রিওয়েতে ভ্যানের অ্যাকসিডেন্ট ঘটার সঙ্গে সঙ্গে লস অ্যালামিটোসের প্যাড থেকে একটা এএইচ-সিক্স হেলিকপ্টার গানশিপ উড়িয়েছে সে, এখন সেটা লস অ্যাঞ্জেলেসের ওপর দিয়ে দেড়শো মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে পিকআপটাকে লক্ষ্য করে। যদি সব ঠিক থাকে, সামনাসামনি দেখা হবে ওদের।

পায়চারি করতে করতে নিঃশব্দে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে লিয়ারি—মেয়েটার পালানোর খবর পেয়েই চপারটা পাঠায়নি বলে। তা-ই যদি করত, ভ্যানটা ধ্বংস হবার আগেই পিকআপের মাথার ওপরে থাকত ওটা। তবে তখন সেটা মাথায় আসেনি। সিসকোর ওপর অগাধ আস্থা ছিল তার; ভেবেছিল, মেয়েটার লোকেশন বের করে দিলেই কাজটা অনায়াসে সারতে পারবে সে। একবারও ভাবেনি, তার মত অভিজ্ঞ লোক ব্যর্থ হতে পারে।

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল লিয়ারি। চোখ রাখল দেয়ালে ঝোলানো মনিটরে। মিরাণ্ডার ফিড ভেসে উঠেছে

ওগুলোয়। একটায় ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টার গানশিপ... সেঞ্চুরি সিটি পার হচ্ছে ওটা। বাকি তিনটে স্ক্রিন লক হয়ে আছে ছুটন্ত পিকআপের ওপর। মাইলখানেক দূরে একটা এগজিট রয়েছে—এল্ সেডেরোর পর ওটাই প্রথম এগজিট, হাইওয়ে থেকে নেমে যাবার জন্যে। পিকআপ ওটার কাছাকাছি চলে আসায় ম্যাপ ছেড়ে চোখ তুলল অ্যানালিস্টরা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু সম্ভাব্য গন্তব্য বের করেছে ওরা। ওদের ধারণা, স্যাটেলাইটকে ফাঁকি দেবার জন্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে চাইবে রানা—কোনও বিল্ডিঙের বেজমেণ্ট, কিংবা সিউয়ারেজের টানেলে। বড়-সড় কোনও বিল্ডিঙের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে, অথবা জটিল কোনও টানেল নেটওঅর্কে যদি ঢুকতে পারে, বেরুবার জন্যে একাধিক রাস্তা খুঁজে পাবে সে। লিয়ারিও তা-ই চাইছে। থামুক রানা, ঢুকে পড়ুক কোথাও। আগের স্যাটেলাইটকে ওভাবে ফাঁকি দেয়া যেত, কিন্তু মিরাণ্ডারা একটা নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত মাটি ভেদ করেও দেখতে পারে। রানা যেদিকেই যাবার চেষ্টা করুক, সেখানেই আগেভাগে ওত পেতে বসে থাকা যাবে।

মনিটরে পিকআপকে এগজিট পেরিয়ে এগিয়ে যেতে দেখল সবাই। হাইওয়ে থেকে নামেনি রানা। তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশনের কাগজপত্র থেকে দুটো পাতা ফেলে দিল অ্যানালিস্টরা। পরের এগজিটগুলোর ওপর নজর দিল এবার।

কম্পিউটারে অনবরত দেখানো হচ্ছে পিকআপ আর এএইচ-সিক্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব। গতিবেগের যোগফল অনুসারে দুইশো ত্রিশ মাইল বেগে পরস্পরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে ওরা। রানা যদি হাইওয়ে না ছাড়ে, তা হলে খুব শীঘ্রি ওকে ইণ্টারসেপ্ট করবে হেলিকপ্টারটা। তবে সমস্যা হলো, ইতিমধ্যে জনবহুল একটা এলাকায় পৌঁছে গেছে পিকআপ। কেটে পড়ার জন্যে অন্তত আধ ডজন এগজিট রয়েছে রানার

সামনে।

উঠে আবারও পায়চারি করতে শুরু করল লিয়ারি। সিসকোর ব্যর্থতার পর তার আত্মবিশ্বাস টলে গেছে। এটা ঠিক যে, রানার পক্ষে মিরাণ্ডার চোখ ফাঁকি দেবার কোনও উপায় নেই, কিন্তু তারপরেও আরেকটা ব্যাকআপ প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে সে। সাবধানের মার নেই। করিডোরে বেরিয়ে এল সে। সেলফোন হাতে নিয়ে ডায়াল করল ওয়াশিংটনের নাম্বারটাতে।

'আবার কোনও দুঃসংবাদ দেবে না তো?' ওপাশ থেকে বলল পরিচিত কণ্ঠটা। তাকে সিসকোর দলের পরিণতির খবর আগেই জানিয়েছে লিয়ারি।

'এখনও তেমন কিছু ঘটেনি,' বলল লিয়ারি। 'যেন না ঘটে, সেটাই নিশ্চিত করতে চাই।'

'মানে?'

'রানা যদি কোনোভাবে মিরাণ্ডাগুলোকে ফাঁকি দেয়, বিপদে পড়ে যাব আমরা। পৃথিবীর বুক থেকে স্রেফ মিলিয়ে যাবে সে। ওর বন্ধুবান্ধবের পেছনে ফেউ লাগিয়ে, কিংবা ওদের ফোনে আড়ি পেতে কোনও লাভ হবে না। ও-ধরনের ছেলেমানুষি ভুল রানা করবে না। বসে বসে আঙুল চুষতে হবে আমাদেরকে।'

'আসল কথা বলো।'

'বলতে চাইছি যে, ওকে যদি হারাই, তা হলে বড় ধরনের কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদেরকে। সারা দুনিয়ার চোখ ঘুরিয়ে দিতে হবে রানার দিকে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে পত্রিকার পাতায় দিনের পর দিন ওর নাম আর ছবি ছাপা হয়।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল ওপাশে। তারপর প্রশ্ন এল, 'কী করা যেতে পারে, সেটা ভেবেছ?'

ঠোঁট কামড়াল লিয়ারি। 'হ্যাঁ। মোটামুটি।'

‘খুলে বলো, শুনি।’

প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করতে ত্রিশ সেকেণ্ড নিল লিয়ারি।

‘ঝুঁকি আছে,’ বলল লোকটা। ‘এদেশে রানার শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই। ওদেরকে ট্যাকেল করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে। শেষ পর্যন্ত সব যদি ঠিকঠাক না এগোয়, আমরাই ঝামেলায় পড়ে যাব।’

‘মেয়েটাকে কবজা করতে না পারলে আরও বড় ঝামেলা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।’

আবারও নীরবতা। বড় বড় শ্বাস ফেলছে লোকটা। অবশেষে বলল, ‘বেশ, হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটিতে ফুলারের সঙ্গে কথা বলছি আমি। কাজটা কখন করতে হবে, আমাকে জানিয়ো।’ লাইন কেটে দিল সে।

কম্পিউটার রুমে ফিরে এল লিয়ারি। অ্যানালিস্টরা ছোটাছুটি করছে। নতুন করে কমাণ্ড পাঠানো হয়েছে স্যাটেলাইটে। চারটে মিরাণ্ডাই এখন তাক করা হয়েছে পিকআপের ওপর।

‘হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে ওরা,’ হুপার জানাল। ‘পাঁচটা ক্যাণ্ডিডেট লোকেশনের একটা ক্লাস্টারের দিকে এগোচ্ছে। সম্ভাব্য ডেস্টিনেশন: একটা চারতলা হাসপাতাল... আধ মাইল দূরে।’

একটা মিরাণ্ডাকে হাসপাতালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো। ডেটাবেজ ঘেঁটে বিল্ডিংটার নকশা বের করে আনল সফটওয়্যার। বারোটা এগজিট আছে হাসপাতালে, তার ভেতর একটা মিশেছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলে—সেটা আবার রাস্তার তলা দিয়ে চলে গেছে ওপাশের দ্বিতীয় আরেকটা হাসপাতালে, সেখানে রয়েছে আরও সাতটা এগজিট। দুই বিল্ডিঙের মাঝখানে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে টানেলে ঢোকার পাঁচটা অ্যাকসেস পয়েন্ট।

সম্ভাব্য আরও যে-তিনটা বিল্ডিং রয়েছে, সবগুলোই

কমবেশি একই রকম। শেষ মুহূর্তের আগে বোঝার উপায় নেই, রানা ঠিক কোন্‌টায় ঢুকবে। তবে আশার বাণী একটাই—এখন পর্যন্ত অ্যানালিস্টদের অনুমান মোতাবেক কাজ করছে লোকটা।

'আয়, শালা,' বিড়বিড় করল লিয়ারি। 'ফাঁদে পা দে।'

প্রায় ফাঁকা রাস্তা ধরে পিকআপ ছোটাচ্ছে রানা। চারদিক এখনও অন্ধকার, ভোরের আভা ফুটতে অন্তত ঘণ্টাখানেক বাকি। সামনে, কালো আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রেখেছে কিছু মাঝারি উচ্চতার অফিস ভবন। সেগুলোর ছায়ায় রয়েছে ছোট ছোট কিছু বিল্ডিং—দোকান, রেস্টুরেন্ট, গুদাম, ইত্যাদি।

অস্বস্তি লাগছে রানার। স্যাটেলাইটের দৃষ্টি যেন অনুভব করতে পারছে ঘাড়ের ওপর। পুরো পথ ওগুলোকে নিয়েই ভাবছে ও। আমেরিকান স্পাই স্যাটেলাইট সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে ওর। গত কয়েক বছরে ওগুলোর টেকনোলজি অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কতটা?

রানার পাশে চুপচাপ বসে আছে অ্যালি। হাতদুটো কোলের ওপর রাখা। নার্ভাস, সন্দেহ নেই... কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করছে না।

সামনে ট্রাফিক লাইট সবুজ থেকে লাল হয়ে গেল। ব্রেক চেপে সাবধানে গাড়ি থামাল রানা।

'আর এক মিনিট লাগবে পৌঁছুতে,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। 'তোমার প্ল্যানটা আমার পছন্দ হয়েছে। ওটা... অন্যরকম।'

'অন্যরকমই হওয়া দরকার।'

উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে গন্তব্যের দিকে তাকাল অ্যালি। জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা তুমি চেনো কী করে?'

'আগেও এসেছি—চ্যারিটি ওঅর্কের জন্যে।'

‘বিপদ হবে না তো? মানে... ওখানে যারা থাকে, তাদের?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘না, না। এসবের প্র্যাকটিস আছে ওদের—ইর্মাজেন্সির জন্যে নিয়মিত মহড়া হয় ওখানে। আজও তেমনটাই ঘটবে।’

‘ওরা খুব রেগে যেতে পারে।’

‘সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হলে ওদের জন্যে একটা ডোনেশন পাঠিয়ে দেব।’

‘যদি সুযোগ পাও আর কী।’

মনিটরে পিকআপকে আবার চলতে দেখল লিয়ারি। ইণ্টারসেকশন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, স্পিড বাড়াচ্ছে না। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড চলল গাড়িটা, এরপর থেমে দাঁড়াল রাস্তার পাশে। হাসপাতাল এখনও তিন ব্লক দূরে। সম্ভাব্য বাকি ডেস্টিনেশনগুলোর দূরত্ব আরও বেশি। অ্যানালিস্টরা তাদের নোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কম্পিউটারে ডেটাবেজ খুলল হুপার—যে-বিল্ডিঙের সামনে থেমেছে রানা, সেটার পরিচয় জানতে চায়।

পিকআপের দরজা খুলে গেল। লাফ দিয়ে নামল রানা আর অ্যালি—দৌড় শুরু করেছে। লম্বা ওঅকওয়ে ধরে ছুটে যাচ্ছে বিল্ডিঙের মেইন এণ্ট্রান্সের দিকে। চোখ পিটপিট করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল লিয়ারি, বিল্ডিঙের ইনফ্রারেড ইমেজ ভেসে উঠেছে ওখানে। একতলা একটা হোটেলের মত লাগছে—সারি বাঁধা অনেকগুলো রুম, মাঝে লম্বা করিডোর। ঘোলাটে কিছু অবয়বও ভেসে উঠল, ছাদ ভেদ করে হিট সিগনেচার পড়ছে মিরাণ্ডা—বোঝা গেল, প্রতিটা কামরায় ঘুমাচ্ছে বেশ কিছু মানুষ। রাতের এই সময়টায় সেটাই স্বাভাবিক।

মনিটরের দিকে এগিয়ে গেল লিয়ারি। ঘুমন্ত আকৃতিগুলো

দেখে কেন যেন তার মন খুঁতখুঁত করছে।

'পেয়েছি,' হঠাৎ বলে উঠল হুপার। 'ওটা একটা বোর্ডিং স্কুল।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অ্যানালিস্টরা। বোর্ডিং স্কুলকে গোনায় ধরেনি তারা। ধরার প্রয়োজন ছিল না। একতলা একটা বিল্ডিং... যেটায় বেজমেন্ট নেই, সেখানে ঢুকে কেউ স্যাটেলাইটকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

আচমকা সচকিত হলো লিয়ারি। খুঁতখুঁতানির কারণ ধরতে পেরেছে। ঘুমিয়ে থাকা দেহগুলোর আকার দেখে অমনটা লেগেছে। ছোট ছোট দেহ... ওরা সবাই শিশু!

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল সে।

বোর্ডিং স্কুলের দরজা বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। তবে নিঃশব্দে ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন নেই, বরং রানা শব্দই করতে চাইছে। দৌড়ের ফাঁকেই ঝুঁকে ওঅকওয়ের পাশ থেকে একটা পাথর তুলে নিল ও। দরজা কাছে পৌঁছে ওটা ছুঁড়ে দিল পাশের একটা জানালার দিকে। বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল কাঁচ। ফোকরটা ওর জন্যে ছোট, তবে অ্যালি সহজেই ঢুকে যেতে পারল। কয়েক সেকেণ্ড পর ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল সে।

হলওয়ের প্রথম ইন্টারসেকশন পর্যন্ত দৌড়ে গেল দু'জনে। এরপর থামল। অ্যালির দিকে ফিরল রানা।

'কী করতে হবে, জানো তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'গুড,' বলল রানা। 'বাইরে পৌঁছুনোর পর যেদিকে আমরা যাচ্ছিলাম, মানে পুবদিকে, দৌড়াবে। এখান থেকে পাঁচ ব্লক দূরে গিয়ে মিলব আমরা। তবে কাছাকাছি হব না, একটু দূরত্ব বজায় রাখব।'

'বুঝতে পেরেছি।'

অ্যালির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'বেশ, চলো, এবার একটা শোরগোল তোলা যাক।'

দু'জনে দু'দিকের করিডোর ধরে ছুটল। বিশ গজ সামনে একটা ফায়ার অ্যালার্মের হ্যাণ্ডেল দেখতে পাচ্ছে রানা, তবে ওটা ধরার আগেই যেন নরক ভেঙে পড়ল। ওপাশের করিডোরে আরেকটা হ্যাণ্ডেল টেনে দিয়েছে অ্যালি। বিকট সুরে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম।

মনিটরের সঙ্গে কোনও অডিয়ো ফিড নেই, তবে তার দরকার হলো না। ঘটনা বুঝতে পারছে লিয়ারি। একসঙ্গে জেগে উঠেছে বোর্ডিং স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রী। থারমাল ইমেজে অদ্ভুত দেখাল দৃশ্যটা। সবগুলো কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য রঙিন বিন্দু, জমা হচ্ছে হলওয়েতে। অ্যালির বিন্দুটা হারিয়ে গেল তার মাঝে। হলওয়ে পরিণত হলো আলোর নদীতে।

রানাকে আরও কিছুক্ষণ ট্র্যাক করা গেল। বাচ্চাদের চেয়ে লম্বা ও। কিন্তু সংকীর্ণ করিডোরে বাচ্চাদের ভিড় বাড়ায় সে-ও হারিয়ে গেল রঙের ভিড়ে। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল বড়রা হাজির হওয়ায়। স্কুলে বেশ কিছু আবাসিক শিক্ষক রয়েছে, তারা ছুটে এসেছে আতঙ্কিত বাচ্চাদের সামলাতে। লিয়ারি বুঝতে পারছে, ভিড়টা যখন বিল্ডিং থেকে বেরুবে, তখন বাচ্চা আর শিক্ষকদের ভিড়ের মাঝ থেকে আলাদা করা যাবে না রানা বা মেয়েটাকে।

ভিড়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছে রানা। এগিয়ে চলেছে স্কুলের বাচ্চা আর শিক্ষকদের সঙ্গে। সবাই আতঙ্কিত, পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে সম্ভবত অ্যালিই দায়ী, কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছে রানা—আগুন নয়, গ্যাস লিক হয়েছে বিল্ডিঙের ভেতরে। যত দ্রুত সম্ভব, সবাইকে দূরে সরে যেতে

হবে! গুজবটা ও-ই ছড়াবে ভেবেছিল, কিন্তু ফায়ার অ্যালার্মের মত গুজব চালু করাতেও ওকে হারিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে পুরো ছক, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে মনিটরে তা প্রত্যক্ষ করছে লিয়ারি। হুড়মুড় করে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই, তারপর ছুটে পালাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে যদি জটলা পাকাত, তা হলেও আশা ছিল। ভিড়ের ওপর নজর রাখতে পারত মিরাণ্ডা, সেখান থেকে কেউ সটকে পড়ার চেষ্টা করলে ট্র্যাক করতে পারত।

কিন্তু থামাথামির কোনও লক্ষণ নেই ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকদের মাঝে। বিল্ডিং থেকে বেরিয়েই ছোটাছুটি করছে তারা। থামছে না এক ব্লক, দু'ব্লক বা পাঁচ ব্লক দূরে গিয়েও। ওদের কারণে দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা। হৈচৈ শুনে আশপাশের বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসছে আরও মানুষ। সার্চের পরিধি বাড়ছে ক্রমাগত। একসঙ্গে এত মানুষকে ট্র্যাক করা সম্ভব নয় স্যাটেলাইটের পক্ষে।

'হচ্ছেটা কী এসব!' হতভম্ব গলায় বলল হুপার। কি-বোর্ডের ওপর থেকে নিজের অজান্তেই হাত সরে গেছে তার। 'ফায়ার ড্রিলের সময় তো বাইরে বেরিয়ে বাচ্চাদের লাইন ধরে দাঁড়ানোর কথা... স্কুলে আমরা তা-ই শিখেছি।'

'রানা সেটা হতে দেয়নি,' বলল লিয়ারি। 'নিশ্চয়ই ওদেরকে এমন কিছু বলেছে, যার কারণে ভয় পেয়ে গেছে সবাই।'

'কিন্তু কেন? মিরাণ্ডা স্যাটেলাইটের ক্ষমতা তো ওর জানার কথা নয়।'

'হয়তো জানে না, কিন্তু অনুমান করে নিয়েছে। ওকে আসলে আমরা আণ্ডার-এস্টিমেট করেছি।'

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না,' গোঁয়ারের মত বলল হুপার। তাকাল সঙ্গীদের দিকে। 'জলদি আরও কয়েকটা

স্যাটেলাইট নিয়ে এসো এদিকে। পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজব। রানাকে পাওয়া যাবেই।'

'যাবে না,' শান্ত গলায় বলল লিয়ারি। সেলফোন হাতে আবার বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

আট

গোলাপি আকাশের নিচে নিথর হয়ে আছে মোহাভি মরুভূমি, অপেক্ষা করছে ভোরের আলোর জন্যে। আশপাশের যানবাহনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা চেরোকি জিপ চালাচ্ছে রানা, পামডেল থেকে বেরিয়ে উত্তরে মরু এলাকায় ঢুকেছে।

বোর্ডিং স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরের একটা পার্কিং লট থেকে জিপটা চুরি করেছে ও। দশ মাইল দূরে গিয়ে আরেকটা লটে থেমে অন্য একটা গাড়ির সঙ্গে লাইসেন্স প্লেট বদলেছে। এরপর পুবে সিমি ভ্যালি আর স্যান ফার্নান্দোর উত্তরের অংশ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে গিরিখাতে—লক্ষ্য: মোহাভি মরুভূমি। চলার জন্যে সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তা বেছে নিয়েছে ও, যাতে স্যাটেলাইট ইমেজে ওদেরকে আলাদা করা না যায়।

এক মুহূর্তের জন্যে সতর্কতায় ঢিল দেয়নি ও। স্যাটেলাইটের ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক জানা নেই, বোর্ডিং স্কুলের ধোঁকাটা কাজে লেগেছে কি না কে জানে। সামনে থেকে আসা প্রতিটা গাড়ির দিকে নজর রাখতে হয়েছে—এই বুঝি কোনোটা ঘুরে যায়... জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসে

আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যারেল! চলার পথের পুরোটা সময় রেসপন্স সিনারিয়ো নিয়ে ভাবছে ও—হামলার সব রকম কায়দা, এবং সেগুলো প্রতিরোধের কৌশল সাজাচ্ছে। আশপাশের পরিবেশ বদলালে কৌশলও বদলে নিচ্ছে।

এতক্ষণে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করছে রানা। আক্রমণ করতে পারলে এর ভেতর করে ফেলত প্রতিপক্ষ। বোধহয় ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছে না। মাথা থেকে জটিল হিসেবগুলো কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে রাখল ও।

মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল অ্যালি। সন্দেহ নেই, রানার প্রতিটা চিন্তা অনুসরণ করছিল সে। বলল, 'অদ্ভুত মানুষ তুমি। এতসব দিকে নজর রাখো কী করে?'

'অভ্যেস,' সংক্ষেপে বলল রানা।

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। মরুভূমি ও তার মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া হাইওয়ে এখনও ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে, তবে দূরে... স্যান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালার গায়ে লেগেছে সূর্যোদয়ের ছটা। পাহাড়চূড়াগুলো আলোয় ঝিকমিক করছে।

একটু পর রানা জানতে চাইল, 'তোমার ওপর ওরা যে-ড্রাগটা ব্যবহার করছিল, ওটার নাম জানো?'

অ্যালি মাথা নাড়ল। 'না। সোনালিচুলো ডাক্তার কখনও ওটার নাম নিয়ে ভাবেনি। নিশ্চয়ই ওষুধটা নিয়মিত ব্যবহার করে অভ্যস্ত, তাই নাম মনে করতে হতো না।'

'একটা ওষুধই দিত?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি।

'ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিত, নাকি স্যালাইনের মাধ্যমে?'

'স্যালাইন।'

'ওষুধের রঙটা কেমন?'

একটু ভাবল অ্যালি। 'স্বচ্ছই বলা যায়, একটু যেন নীলচে। ভালমত না তাকালে বোঝা যায় না।'

'ওটা দেবার দু-তিন মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে তুমি,

রাইট?'

'হ্যাঁ।'

'ঘুমিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে হাত কাঁপত... মুখের ভেতর একটা তিতকুটে স্বাদ পেতে?'

'ঠিকই বলেছ,' একটু যেন অবাক হলো অ্যালি। 'কী করে জানলে?'

'স্লিপ ইন্টারোগেশনের জন্যে খুব বেশি ড্রাগ নেই, ওগুলোর ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা আছে আমার। তোমাকে সবচেয়ে কমনটা দেয়া হচ্ছিল।' ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার স্মৃতি ফিরে আসবে, তবে এখুনি নয়। অন্তত এক সপ্তাহ লাগবে।'

মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অ্যালির মাঝে। প্রথমে স্বস্তি ফুটল চোখের তারায়, কিন্তু পরক্ষণে তা সরে গিয়ে ভর করল ভীতি আর দুশ্চিন্তা। কোনোকিছুর সঙ্কেত দিচ্ছে ওর অবচেতন মন। কী সেটা?

রোজামণ্ডের একটা ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টে থামল ওরা। জিপের ড্যাশবোর্ড হাতড়ে বেশ কিছু ভাঙতি কয়েন পাওয়া গেল। পরিমাণটা অল্পই, তবে ওগুলোর বিনিময়ে দুটো বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আর কোল্ড ড্রিঙ্কস কেনা গেল অনায়াসে। খাবারের ট্রে নিয়ে বাইরের সিটিং এরিয়ায় বসল দু'জনে।

দিনের আলোয় এই প্রথম অ্যালিকে দেখছে রানা। ভাল করে তাকাতেই বুঝল, রাতের আলো-আঁধারিতে যতটা মনে হয়েছিল, মেয়েটার সঙ্গে লুবনার মিল তারচেয়ে অনেক কম। চোখের মণি আর মাথার চুল... কোনোটাই পুরোপুরি কালো নয়, কালচে-বাদামি। চিবুক আর ঠোঁটের গড়নেও পার্থক্য রয়েছে। আরও কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ করল, যা আগে দেখেনি। মেয়েটা একেবারে হাড্ডিসার, চোখের তলায় কালি জমেছে। দু'হাতেই রয়েছে কালশিরে—স্ট্র্যাপে বন্দি থাকার

লক্ষণ। সুঁই ফোটানোর দাগও রয়েছে হাতে।

গত রাতের কথা ভাবল রানা। বোর্ডওয়াকে ও যদি না থাকত, তা হলে কী ঘটত? অসহায়ভাবে দৌড়ে মরত বেচারি, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যেত। তারপর?

ট্রে-র দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালি। বাতাসে উড়ছে ওর চুল। নিচু গলায় বলল, 'সরি, রানা।'

'কীসের জন্যে?'

'সবকিছুর জন্যে। এই যে, তোমাকে একটা ঝামেলায় ফেলে দিলাম। অযথা আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে তুমি। দুঃখিত।'

'কোনও ব্যাপার না। ইট'স ওকে।'

'কীভাবে বলছ এ-কথা? বাড়ি ফিরতে পারছ না তুমি। যেখানেই যাবে, ওরা তোমাকে...'

'অ্যাই!' ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'আমার দিকে তাকাও।'

মুখ তুলল অ্যালি।

'আমার সব চিন্তাই তো তুমি পড়তে পারছ,' বলল রানা। 'নিজেই বলো, কী ভাবছি আমি? যদি কোনোভাবে গত রাতে ফিরে যেতে পারতাম, তা হলে কি তোমাকে এড়াবার চেষ্টা করতাম আমি?'

কপালে ভাঁজ পড়ল অ্যালির। আবার নিচু করল মাথা। ফিসফিস করে বলল, 'ধন্যবাদ, রানা।'

রেস্টুরেন্টের ওপর ডানা ঝাপটে ঘুরপাক খাচ্ছে কিছু মরুভূমির পাখি। কয়েকটা নেমে এল ওদের টেবিল থেকে কয়েক গজ দূরে, লাফালাফি করছে। ওদের দিকে তাকাল অ্যালি। এই প্রথম মেয়েটার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটতে দেখল রানা। চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ফ্রাইয়ের টুকরো ছুঁড়ে দিল পাখিগুলোর দিকে। তারপর দ্রুত শেষ করল খাবার। তৈলাক্ত ফাস্ট ফুড... তবে গত দু'মাসে

যা খেয়েছে, তার চেয়ে ভাল।

খানিক পর উড়ে গেল পাখিগুলো। পার্কিং লটের ওপর দিয়ে বড় একটা বৃত্ত রচনা করে চলে গেল দূরের পাহাড়সারির দিকে। সেগুলোকে অনুসরণ করল অ্যালির চোখ। মন ভরে দেখছে চারপাশের বিস্তৃত, অবারিত প্রান্তর। দু'মাস একটা বিছানায় বন্দি থাকার পর এই মুক্ত পরিবেশ অভিভূত করছে ওকে।

'তুমি পালালে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিচের ঠোঁট কামড়াল অ্যালি। বলল, 'খারাপ একটা কাজ করতে হয়েছে। আসলে... আর কোনও উপায় দেখছিলাম না। যদি বলি অনুতাপ হচ্ছে, মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু কাজটা মোটেই ভাল করিনি।'

অপেক্ষায় রইল রানা।

বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। 'প্রতিদিন ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় ওষুধ দেয়া হতো আমাকে, গতকালও দেয়া হয়েছিল। বরাবরের মত ভোর তিনটার দিকে জেগে উঠি আমি। কিন্তু গতকাল একটা ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, আরেকটা ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছে সোনালিচুলো ডাক্তার—তাতে নতুন ওষুধ। ওটার কথা ভাবছিল সে। ওষুধটার নাম বার্বিচুরেট। ব্যাগে যে-পরিমাণ ওষুধ ছিল, তাতে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। মানে, আমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।'

'তারপর?'

'মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ডাক্তারকে বললাম, ও কী করতে চলেছে, আমি জানি। সেই সঙ্গে মিথ্যে করে বললাম, আমার পরে ওর কপালে কী ঘটবে, তাও জানা আছে আমার—আগের সন্ধ্যায় গার্ডেরা যখন আমার কাছে এসেছিল, তাদের মাইণ্ডরিড করে জেনেছি। ওদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমার লাশের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ডাক্তারকেও

একই ভ্যানে তুলতে হবে... তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে হবে, সবশেষে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে কবর দিতে হবে।'

'বিশ্বাস করেছিল তোমার কথা?'

'না করে উপায় আছে? যাদের হয়ে কাজ করছিল, তারা ও-রকম কাজ তো হরহামেশাই করে—বিশেষ করে যখন কারও মুখ বন্ধ করতে চায়।'

লোকটার মনের অবস্থা কল্পনা করল রানা। নিশ্চয়ই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল তার। 'হুম। এরপর কী ঘটল?'

'আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, বিল্ডিঙের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে তার আইডিয়া আছে কি না। সে মাথা নাড়ল। তাকে বললাম, আমি কিছুটা জানি—গার্ডদের মাথা থেকে জেনেছি। আসলে কিছুটা না, পুরোটাই জানতাম। যা হোক, লোকটাকে প্রস্তাব দিলাম: ওকে আমি পালাতে সাহায্য করতে পারি, যদি ওখান থেকে বেরুবার পর ও আমাকে মুক্তি দেবে বলে কথা দেয়। সরলমনে রাজি হয়ে গেল ডাক্তার। অন্য কোনও ফন্দি মাথায় আসেনি তার, এলেও লাভ হতো না। আমি জেনে যেতাম।

'আমার বাঁধন খুলে দিল সে। দু'জনে চলে গেলাম বিল্ডিঙের পেছনের দরজায়। ডোর-অ্যালার্ম অচল করার কোড আমি তাকে বলে দিলাম; কিন্তু এ-কথা বললাম না যে, দরজা পেরুলেই বাইরে মোশন ডিটেক্টর আছে... সেগুলোকে বন্ধ করার কোনও কায়দা নেই।'

পরের অংশটা আন্দাজ করতে পারছে রানা। হ্যাঁ, কাজটা খারাপই হয়েছে বটে... কিন্তু কিছু বলতে গেল না। চুপচাপ শুনে গেল অ্যালির কথা।

'ওকে বলেছিলাম, আমাদেরকে দৌড়ে পালাতে হবে।

তা-ই করল সে। দরজা খুলে নিঃশব্দে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপরেই লাগাল ভোঁ দৌড়। বিশ গজও যেতে পারল না, বেজে উঠল অ্যালার্ম, ফ্লাডলাইটের আলোয় ভরে গেল বিল্ডিঙের চারপাশ। থমকে গিয়ে উল্টো ঘুরল ডাক্তার। আমাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল কী ঘটেছে। ওকে টোপ বানিয়েছি আমি, ধোঁকা দিয়েছি... নিজে দৌড়াইনি। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। বেচারা বাধ্য হলো একাই দৌড়ে পালাতে। আমি গিয়ে লুকালাম আঙিনার একটা ঝোপের পেছনে। একটু পরেই গার্ডেরা বেরিয়ে এল, ধাওয়া করল ডাক্তারকে। ওরা চোখের আড়াল হতেই উল্টোদিকে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি। খানিক পরেই দূর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে ডাক্তার। বেশিদূর যে এগোতে পারিনি, সেটা বুঝলাম একটু পরেই পেছনে ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখে। আমাকে ধাওয়া করছিল ওরা। ছুটতে ছুটতে চলে গেলাম সাগরের ধারে। ওখানেই দেখা হলো তোমার সঙ্গে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যালি। এরপর বলল, 'জানি, ডাক্তারের ভাগ্যে যা ঘটেছে, সেটা ওর প্রাপ্য ছিল। ওকে এমনিতেও হয়তো মেরে ফেলত ওরা। তবু, একটা মানুষকে ধোঁকা দিলাম... তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম... ভাবলেই খারাপ লাগছে আমার।'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবার রাস্তায় নামল ওরা। হাইওয়ে ফিফটি এইট ধরে পশ্চিমে ঘুরল—স্যান গ্যাব্রিয়েলস্ আর বেকারস্‌ফিল্ডের দিকে চলেছে। ফেলে আসা মরুভূমির দিকে রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা। দিগন্তবিস্তৃত বালি ঝিকমিক করছে সকালের রোদে।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসা অ্যালি কেঁপে উঠল হঠাৎ। রানার দিকে তাকাল। বলল, 'স্মৃতি ফিরে আসার জন্যে এক সপ্তাহ

অপেক্ষা করতে হবে ভাবলেই কেমন যেন লাগছে। খারাপ কোনও খবর লুকানো আছে আমার মাথায়... ভয়ঙ্কর কোনও বিপদের পূর্বাভাস। যদি মনে করতে পারতাম, সবাইকে সাবধান করে দেয়া যেত।'

ওকে যে-ড্রাগটা দেয়া হয়েছে, সেটার কথা ভাবল রানা। যে-সব জায়গায় ওগুলোর ব্যবহার দেখেছে, মনে পড়ে গেল সেখানকার কথা। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো, ওসব অন্য কারও জীবনে ঘটেছে। সত্যি, এই ছোট্ট জীবনে যত কিছু দেখেছে ও, তা অবিশ্বাস্য। তাড়াতাড়ি মাথা ঝেড়ে দূর করল আজেবাজে ভাবনা। ড্রাগটা সম্পর্কে যা যা জানে, তার ওপর মনোযোগ দিল।

'আরও দ্রুত তোমার স্মৃতি ফেরানোর একটা কায়দা সম্ভবত আছে,' খানিক পর বলল ও।

নয়

ব্লুম হোয়্যার ইউ আর প্ল্যান্টেড।

কথাটাকে জীবনের একটা মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছে লিয়ারি বহুদিন থেকে। ওর কাছে এর অর্থ: যেখানেই থাকো, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সেটাকেই কাজে লাগিয়ে কার্যোদ্ধার করো। বীজ বোনার পর মাটির অবস্থা খারাপ হলে সেটাকে যেমন সরানো যায় না, তেমনি বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়লেও মানুষ সেটাকে রাতারাতি বদলে ফেলতে পারে না। কাজেই, মন্দ জমিনেই ফুল ফোটাবার চেষ্টা করতে হয়...

খারাপ পরিস্থিতিকেও নিজের অনুকূলে ব্যবহার করতে হয়।

মন্ত্রটা কলেজের এক বন্ধুর মুখে প্রথম শুনেছিল লিয়ারি। এখন সে একজন নামকরা ডিফেন্স অ্যাটর্নি। একবার সে জটিল এক সমস্যায় পড়েছিল, এমন একটা কেস নিয়ে বসেছিল, যেটায় হার নিশ্চিত। কলেজের পার্টিতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এক অল্পবয়েসী মেয়ে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সবই ছিল ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে। এ-অবস্থায় ভিকটিম মেয়েটাকে কাঠগড়ায় তোলে সে, প্রশ্নবাণে ফালা ফালা করে দেয়। কী ধরনের পোশাক পরেছিলে তুমি? ছেলেগুলোকে ঠিক কী বলেছিলে? ওরা কীভাবে তোমাকে ধরেছিল? কোথায় কোথায় স্পর্শ করেছে? কার পরে কে তোমার ওপর চড়াও হয়েছিল? সোজা কথায়, কাঠগড়ায় তুলে মেয়েটাকে দ্বিতীয়বার বাক্যবাণে ধর্ষণ করেছিল সে। তাকে বাধ্য করেছিল ভয়াবহ সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে... তাও আবার জনসমক্ষে! বলা বাহুল্য, আবেগের তোড়ে ভুলভাল বলতে শুরু করে মেয়েটি, দিতে শুরু করে পরস্পরবিরোধী তথ্য। তার মুখ দিয়েই বলিয়ে নেয় বন্ধুটি—উত্তেজক পোশাক পরেছিল সে, প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছিল, ছেলেগুলোর সঙ্গে খুনসুটি করেছিল। শেষে যা হবার তা-ই হলো, মামলায় হেরে গেল মেয়েটি। ছাড়া পেয়ে গেল ধর্ষকেরা। খুবই খারাপ একটা কাজ ছিল সেটা। কিন্তু কী আর করা... যেখানে বীজ বোনা হয়েছে, সেখানেই তো ফুল ফোটাতে হবে!

লিয়ারির কাছে তাই মন্ত্রটা ঘন জঙ্গলে ধারালো মাচেটির মত মূল্যবান। এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে সমস্যার ঘন ঝোপঝাড় কেটে পথ করে নেয়া যায়, কিংবা বাধার প্রাচীর কেটে পৌঁছুনো যায় অভীষ্ট লক্ষ্যে। কথাটা ওকে পুরনো পাপের স্মৃতিও চাপা দিতে সাহায্য করে। ভাবে, ওসব অন্যায় তাকে করতে হয়েছে ফুল ফোটানোর তাগিদে।

টোপাঙ্গা বিচের তিনশো ফুট ওপরে, ট্যুরিস্টদের জন্যে

তৈরি করা ভিউয়িং এরিয়ার পাশে, কয়েকটা পাম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছে লিয়ারি। চোখ প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ের দিকে—সাগরের পার ঘেঁষে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে রাস্তাটা। ভোরের আলোয় অপার্থিব দ্যুতি ছড়াচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের পানি। রাস্তা ধরে একটা কালো রঙের এস.ইউ.ভি-কে এগিয়ে আসতে দেখল সে, ক্যানিয়ন রোডে ঢুকল ওটা। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ওভারলুক ড্রাইভ ধরল, কয়েক মিনিট পরে এসে থামল লিয়ারির বি.এম.ডব্লিউ-র পাশে। ভোরের এ-সময়টায় আর কোনও গাড়ি বা মানুষ নেই আশপাশে।

এস.ইউ.ভি-র পেছনের দরজা খুলে গেল। নেমে এল আলবার্ট ফুলার। পরিপাটি মানুষ, বয়স পঞ্চাশের আশপাশে, মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। সাগরের দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে তার টাই আর কোটের ঝুল পতাকার মত পত পত করে উড়ছে। হেঁটে লিয়ারির পাশে চলে এল লোকটা, কিন্তু হাত মেলাল না; মুখ ঘুরিয়ে তাকাল না পর্যন্ত। অপ্রয়োজনীয় সৌজন্য বিনিময়ে আগ্রহী নয় সে। রেলিঙে হাত রেখে সাগরের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। লিয়ারিও ভদ্রতা দেখিয়ে জানতে চাইল না, ওয়াশিংটন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত আকাশভ্রমণটা কেমন কেটেছে তার। সেসবের প্রয়োজন নেই। জানে, একটা এফ-সিক্সটিন জেট ফাইটারে চড়ে মার্ক-টু বেগে ফুলারকে ছুটে আসতে হয়েছে এই মিটিংটার জন্যে। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো নিয়ে টেলিফোনে আলাপ চলে না; সামনাসামনি কথা বলতে হয়।

মুখ খোলার আগে ফুলারের মুখটা খুঁটিয়ে দেখল লিয়ারি। গত বিশ বছর ধরে তাকে চেনে সে। ভীষণ বাস্তববাদী মানুষ... হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান হতে গেলে সেটাই প্রয়োজন... লিয়ারির *বীজ-মাটি আর ফুল ফোটানো*-র মন্ত্রের ঘোর বিরোধী।

দুশ্চিন্তাটা সেখানেই।

গুরুত্বহীন লোকেরা সমস্যা বাধালে সেটা সহজে সামাল দেয়া যায়। যেমন ওই অপদার্থ ডাক্তারটা, যাকে অ্যালির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে *এল.এ. টাইমস্-*এর এক সাংবাদিকের সঙ্গে লাঞ্চে গিয়েছিল সে। আড়িপাতা যন্ত্র লাগানো ছিল... ডাক্তার কোনও গোপন তথ্য পাচার করছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া ভালমত খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই সাংবাদিক আসলে ডাক্তারের কাজিন। দু'জনে লাঞ্চে যেতেই পারে। কিন্তু তারপরেও ঝুঁকি নিতে চায়নি লিয়ারি। যে-দরজার পেছনে বিপদ লুকিয়ে আছে, সেটায় একটা ফুটোও রাখা চলে না। কিন্তু এ-ধরনের সহজ সমাধান ফুলারের বেলায় অচল।

'আমাদের বন্ধু ফোন করেছিলেন,' হঠাৎ বলে উঠল ফুলার। সাগরের দিক থেকে চোখ সরায়নি। 'আমাকে দিয়ে কী করাতে চাইছ, সেটা ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন।'

চুপ করে রইল লিয়ারি।

'আমার কথা একটাই,' বলল ফুলার। 'অন্ধের মত কুয়োয় ঝাঁপ দেব না আমি। কী ঘটেছে... কীসের মধ্যে পড়তে চলেছি, সব খুলে বলতে হবে আমাকে। স-অ-ব!'

'সবকিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' নিচুস্বরে বলল লিয়ারি। 'আমি নিজেই পুরোটা জানি না।'

'ওসব বলে পার পাবে না। কার বিরুদ্ধে লাগতে বলছ আমাকে, সেটা তো ভাবো! মাসুদ রানা কোনও সাধারণ মানুষ নয়। আমরাই অনেকবার তাকে বীরের সম্মান দিয়েছি... আজও বহু আমেরিকান তাকে নায়ক বলে মানে। চালে যদি সামান্যতম গড়বড় হয়, ওর বদলে ফেঁসে যাব আমি। বিশ্বাসঘাতক, আর জাতীয় পর্যায়ের ভিলেনে পরিণত হব আমি!'

লোকটাকে কড়া করে একটা ধমক দিতে ইচ্ছে হলো

লিয়ারির। বলতে ইচ্ছে হলো, বড় বড় রাঘব-বোয়ালেরা জড়িত পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে; সে-তুলনায় ফুলার নেহাত চুনোপুঁটি। তাকে অনুরোধ নয়, চাইলে হুকুমই দিতে পারে সে। এমন নয় যে, কাজটা করে দিলে কাউকে মস্ত বড় দয়া দেখানো হবে। ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল সে। নরম সুরে বলল, 'তোমাকে যে একটা বাজে পরিস্থিতিতে ফেলছি, তা আমি জানি, আলবার্ট। কিন্তু কাজটা করে দিলে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

এবার তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ফুলার। চেহারা দেখে বোঝা গেল, চিড়ে ভেজেনি। থমথমে গলায় সে বলল, 'সব খুলে বলো আমাকে।'

রেলিঙে কনুই রেখে হাইওয়ের দিকে তাকাল লিয়ারি। কতটুকু বলবে ফুলারকে... কোত্থেকেই বা শুরু করবে—ভাবছে।

'কিছু কিছু ব্যাপার আমার জানা আছে,' ফুলার বলল। 'আমি জানি, আসলে রানা তোমাদের টার্গেট নয়; টার্গেট একটা মেয়ে। গত দু'মাস থেকে ও তোমাদের কাস্টডিতে ছিল। আর এই মেয়ের সঙ্গে এক দশকের পুরনো ফোর্ট ডেট্রিকের রিসার্চ ওঅর্কের সম্পর্ক আছে, রাইট?' নিচু গলায় হাসল সে। 'অবাক হচ্ছ? আমি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম, অ্যালেক্স। ওখানে কানাঘুষোর ছলে অনেক কিছুই আলোচনা হয়। এককালে অ্যানিমেল টেস্টিং হতো ফোর্ট ডেট্রিকে। পরে শুনেছিলাম হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশনও শুরু করা হয়েছিল। বিশ্বস্ত এক সূত্র জানিয়েছিল, ওরা সফল হয়েছিল। কী, এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক বলতে পেরেছি তো?'

তার দিকে না তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি।

অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল ফুলার। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ক্রাইস্ট! মেয়েটা ওদের একজন? ও কি... ও কি

মাইণ্ডরিডার?'

নির্বিকার রইল লিয়ারি। রাস্তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাল না। মনে মনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে—ফুলার যদি ভেবে থাকে, মাইণ্ডরিডিং পর্যন্তই অ্যালির দৌড়; তা হলে বলতে হয়, তার জ্ঞানে যথেষ্ট খামতি রয়েছে। বাস্তবে মেয়েটার ক্ষমতা আরও বহুগুণ বেশি।

'হ্যাঁ,' লিয়ারি বলল। 'ও মনের কথা পড়তে পারে।'

এক হিসেবে মিথ্যে বলছে না সে। যতক্ষণ না স্মৃতি ফিরে আসছে, মাইণ্ডরিডিঙের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না মেয়েটা। ওটা ওর সহজাত ক্ষমতা—চোখ দিয়ে দেখা, বা কান দিয়ে শোনার মত। কিন্তু বাকি ক্ষমতাগুলো প্রদর্শন করতে চাইলে তাকে খাটতে হবে। স্মৃতি না ফিরলে ও জানবেই না, ওসব ক্ষমতা ওর আছে। কীভাবে কী করতে হবে, তাও মনে পড়বে না।

'বেশ,' বলল ফুলার। 'এবার তা হলে সব খুলে বলো। কী ঘটছে? কীসের মধ্যে নাক গলাতে হবে আমাকে?'

নিচের দিকে তাকিয়ে রইল লিয়ারি। হুডখোলা একটা হলুদ রঙের হামভি গাড়ি ছুটে চলেছে, তাতে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছে কয়েকজন তরুণ-তরুণী। হাসছে গলা ছেড়ে। সান্তা মনিকার দিকে চলে গেল গাড়িটা। ওদিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল সে। ভাবছে, ওদের মত নিশ্চিন্ত, মুক্ত জীবনযাপন করতে পারলে কতই না ভাল হতো!

'অ্যালেক্স?' ডাকল ফুলার।

সংবিৎ ফিরে পেল লিয়ারি। সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'ফোর্ট ডেট্রিকের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না, শুধু এটুকু জেনে রাখো, পাঁচ বছর আগেই গবেষণা থামিয়ে দিয়েছে ওরা। এরপর কাজটার ভার নিয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টরেরা।'

'একাধিক কণ্ট্রাক্টর?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি। 'হ্যাঁ। দুটো ফার্ম। প্রথমটা ফিল্ডিং-গেলার... আমি ওদের হয়ে কাজ করছি। অন্যটা সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্।'

কথাটা শুনেই ভুরু কোঁচকাল ফুলার। তার জানা আছে, ফিল্ডিং-গেলার আর সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ পরস্পরের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দুই ফার্মই রিসার্চের দায়িত্ব নিল?'

'স্বতন্ত্রভাবে,' তাকে জানাল লিয়ারি। 'মানে, দু'পক্ষের মাঝে কোনও ধরনের কানেকশন ছাড়া।'

'প্রতিযোগিতার মত?'

'প্রতিযোগিতাই—কে কার আগে কাজ শেষ করতে পারে। ওপরমহলের অদ্ভুত খেয়াল বলতে পারো, কম্পিটিশনের মাধ্যমে দ্রুত প্রজেক্ট শেষ করার একটা কায়দা। মাঝে মাঝে এতে কাজও হয়। যেহেতু একটা তাড়া থাকে, বাড়তি মোটিভেশন নিয়ে কাজ করে লোকে।'

'এবার কাজ হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি।

'তো... কে জিতল?' জিজ্ঞেস করল ফুলার।

অন্যদিকে মুখ ফেরাল লিয়ারি। তিক্ত স্বরে বলল, 'ওরা। গত পাঁচ বছরে আমাদের আউটপুট প্রায় শূন্য। কিন্তু শুরু থেকেই সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ সাফল্যের দেখা পেয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এ-মুহূর্তে ওরা আর রিসার্চে সীমাবদ্ধ নেই। ইন ফ্যাক্ট, ফাইনাল ট্রায়ালের জন্যে ফিনিশড প্রোডাক্ট রয়েছে ওদের হাতে।'

'কী ধরনের প্রোডাক্ট?' জানতে চাইল ফুলার।

'মানুষ,' বলল লিয়ারি। 'টেস্ট সাবজেক্ট নয়, সত্যিকার অপারেটিভ। বাধ্য, অনুগত... হুকুম তামিল করে।'

'প্রত্যেকেই মাইণ্ডরিডার?'

নিঃশব্দে সায় জানাল লিয়ারি। তবে বলল না যে, সাদার্ন

অ্যাসোশিয়েটসের অপারেটিভরা অ্যালির তুলনায় নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য শিশু। অনেকটা পাড়ার ফুটবলার আর আর্জেন্টিনার লিয়োনেল মেসির মত। খেলতে জানে দু'জনেই, কলাকৌশল সবই জানে, কিন্তু মাঠে তাদের আকাশ-পাতাল ফারাক।

'এর ভেতর তুমি এলে কীভাবে?' প্রশ্ন করল ফুলার। 'রিসার্চ-টিসার্চ তোমার লাইন নয় বলেই জানি।'

'কয়েক মাস আগে ফোর্ট ডেট্রিক থেকে এক পুরনো বন্ধুর ফোন পাই আমি—ছোট একটা ওঅর্কিং গ্রুপ নিয়ে সে ওখানকার পুরনো রিসার্চের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। সে-আমলের একজন টেস্ট সাবজেক্টের ইনফরমেশন খুঁজে পায় সে। অরিজিনাল রিসার্চের সব টেস্ট সাবজেক্টকে... ইয়ে, যাকে বলে... নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল; তবে এই সাবজেক্ট—একটা মেয়ে—বেঁচে যায়। পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। শুধু তা-ই নয়, গত পাঁচ বছর ধরে মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় রয়েছে মেয়েটি। বন্ধুটি জানতে চায়, ফিল্ডিং-গেলারের হয়ে আমি তাকে খুঁজে বের করে উঠিয়ে আনতে পারব কি না।'

'যাতে সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্‌কে টেক্কা দেয়া যায়?'

'হুঁ।'

'তাতে তুমি রাজি হয়ে গেলে? ছোট্ট একটা মেয়ে... কী করতে চাইছিলে তোমরা ওকে নিয়ে?'

'প্রয়োজনের বেশি কিছু নয়। বেশিরভাগ টেস্টই ওর রক্ত পরীক্ষা এবং ব্রেনের ফাংশানাল এমআরআই স্ক্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা ছিল। কিন্তু শুরুতে আমরা নারকোটিক ইন্টারোগেশন করব বলে ঠিক করি। আশা করেছিলাম, তাতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া যাবে ওর মাথা থেকে।'

'গিয়েছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়ারি। 'হ্যাঁ। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই বটে।'

'কী তথ্য?'

সাগরের দিকে তাকাল লিয়ারি। ম্যারিনা ডেল রে থেকে একটা ইয়ট বেরিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে।

'অ্যালেক্স,' ডাকল ফুলার। 'কী জেনেছ তোমরা ওর কাছ থেকে?'

আরেক দফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরোটা খুলে বলল লিয়ারি। তিন মিনিট পর ওর কথা যখন শেষ হলো, ফুলারের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'এসব কি সত্যি?' বলল সে। 'নাকি কোনও উর্বরমস্তিষ্ক মানুষের মাথা থেকে গজানো...'

তাকে থামিয়ে দিল লিয়ারি। বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে, পুরো ব্যাপারটা স্ট্যাণ্ডবাই অবস্থায় আছে, যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাকটিভেট করা হবে। এবার বুঝতে পারছ তো, কেন মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়? ওর পক্ষে প্ল্যানটায় বাগড়া দেয়া সম্ভব... আর সেটা মস্ত বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। এটা এখন আর ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টরদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ নেই। অনেক ওপর থেকে মেয়েটাকে শেষ করে দেয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমি। এ নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে।'

দুর্বলভাবে মাথা ঝাঁকাল ফুলার। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

'সঙ্গে থাকছ তো তুমি?' জিজ্ঞেস করল লিয়ারি। 'আমাকে সাহায্য করছ তো?'

আরেকবার মাথা ঝাঁকাল ফুলার। লিয়ারিকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের স্কাইলাইনের দিকে। যা শুনল, তার আলোকে দেখতে শুরু করেছে শহরটাকে।

'তা হলে আলোচনার এখানেই সমাপ্তি,' বলল লিয়ারি। 'কী করতে হবে, তা তুমি জানো।'

ফুলারের তরফ থেকে কিছু শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করল না সে। ঘুরে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। ইঞ্জিন চালু

করে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। রওনা দেবার আগে শেষবারের মত তাকাল ফুলারের দিকে, সে এখনও রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হজম করার চেষ্টা করছে পুরো ব্যাপারটা।

ওকে কতটা বিশ্বাস করা চলে? মনে মনে ভাবল লিয়ারি। কতটা বাস্তববাদী সে? ফুলারকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। চেহারা দেখে মনে হলো, সবকিছু মেনে নিয়েছে। আপাতত সেটুকুই যথেষ্ট।

ব্রেক থেকে পা সরিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল লিয়ারি। গাড়ি চলতে শুরু করল।

দশ

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো ছেলেটা অল্পবয়েসী। গভীর মনোযোগে নগ্ন নারীদেহের ছবি ভরা একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে সে। ম্যাগাজিনটা কাউন্টারের আড়ালে ঢাকা পড়ায় দেখতে পাচ্ছে না অ্যালি, কিন্তু অনায়াসে পড়তে পারছে তরুণ সেলসম্যানের মন। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে স্টোরে ঢোকা তরুণী-যুবতীদের দিকে তাকাচ্ছে সে, ম্যাগাজিনের মডেলদের ছেড়ে কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছে তাদের। শয়তান কোথাকার! প্রাণপণ চেষ্টা করছে অ্যালি, যাতে বদমাশটার চোখে না পড়ে। রানার শরীরের আড়াল নিয়ে শপিং কার্ট ঠেলছে। সুযোগ পেলেই চলে যাচ্ছে কোনও একটা র‍্যাকের আড়ালে।

বেকারস্‌ফিল্ডে রয়েছে ওরা। সকাল দশটা বেজেছে

খানিক আগে। স্টোরের কাঁচের দেয়াল ভেদ করে বিশাল পার্কিং লট, আর ওপারে পুরো শহরটা দেখতে পাচ্ছে অ্যালি। রোদে পুড়ছে সব। পার্কিং লটের একপ্রান্তে রাখা হয়েছে ওদের নতুন গাড়ি—একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টয়োটা জিপ। বেশ সস্তায় গাড়িটা কিনেছে রানা, কণ্ডিশনও ভাল। আগের জিপটা এয়ারপোর্টের লং টার্ম পার্কিঙে রেখে এসেছে। যেখানে-সেখানে ফেলে এলে পুলিশের চোখে পড়ত, ওটা জব্দ করা হতো। কোনও না কোনোভাবে খবরটা হয়তো চলে যেত লিয়ারির কাছে, দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে শুরু করত সে। সেটা এড়াবার জন্যেই বৈধ পার্কিং বেছে নেয়া। গাড়ির সূত্র ধরে ওদেরকে ট্র্যাক করতে পারবে না কেউ।

টাকার অভাব মিটে গেছে ওদের। বেকারস্‌ফিল্ডে ঢুকেই ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছিল রানা। সেখানকার একটা সেফ ডিপোজিট বক্স খুলেছে। ক্যানভাসের একটা ব্যাগ রাখা ছিল বক্সে। ওটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে আবার। অ্যালিকে ব্যাঙ্কে নেয়নি রানা, ব্যাগও খুলে দেখায়নি; তাই বলে ওতে কী রয়েছে, জানতে অসুবিধে হয়নি ওর। ব্যাগে আছে খামে ভরা দশ হাজার ডলার, একটা সিগ-সাওয়ার পিস্তল, বাড়তি ম্যাগাজিন, আর তিন সেট ভুয়া পরিচয়পত্র। বেশ অবাক হয়েছিল অ্যালি, জানতে চেয়েছিল, ওগুলো ব্যাঙ্কে এল কী করে। জবাবে রানা শুধু সংক্ষেপে জানিয়েছে, ইমার্জেন্সি সামাল দেবার জন্যে এ-রকম বেশ কিছু ব্যাগ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লুকানো আছে ওর। এসব নাকি ওর পেশার অংশ।

রানার পেশাটা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি অ্যালি। তবে এটুকু বুঝেছে, অত্যন্ত যোগ্য একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেছে ও। এমন একজন, যে ওর পেছনে লাগা মানুষগুলোর সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে পাল্লা দিতে পারে। বিস্মিতও হচ্ছে, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ও কিনা ঠিক এই মানুষটার কাছেই এসে পড়ল! ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয়,

নাকি অন্য কিছু? আর কোনোভাবে কি ব্যাখ্যা করা যায় ঘটনাটা? জানে না অ্যালি, ভাবলেই মাথা কেমন যেন করে।

এ-মুহূর্তে ফ্রিজ ড্রায়েড মিলের একটা শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তাকগুলোয় শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন আকারের ফয়েল প্যাকেট—ওপরে হাইকারদের ছবি, সেই সঙ্গে নানা ধরনের নাম: *লাসানিয়া উইথ মিট সস, চিকেন টেরিয়াকি উইথ রাইস*, ইত্যাদি।

রানা বলল, 'খেতে ভাল না, তবে প্যাকেটগুলো বেশ হালকা। আমাদের লাগেজ বাড়বে না। কয়েকটা নিয়ে নিই, কী বলো?'

শপিং কার্টে অনেকগুলো প্যাকেট নিল ও। কার্টের বাকি অংশে আছে দু'জনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের পোশাক, প্রোপেন স্টোভ, ওয়াটার পিউরিফায়ার, দুটো ব্যাকপ্যাক, দুটো স্লিপিং ব্যাগ আর দু'জোড়া হাইকিং বুট। সোজা কথায়, মোটামুটি এক সপ্তাহ পাহাড়ি অরণ্যে কাটাবার উপযোগী সব সরঞ্জাম। যতদিন অ্যালির স্মৃতি না ফিরছে, গা-ঢাকা দেবে বলে ঠিক করেছে রানা।

পাশ দিয়ে এক মাঝবয়েসী মহিলা হেঁটে গেল। তার চিন্তা পড়তে পারছে অ্যালি—ছেলের পছন্দের খাবার রান্না করবে, সেজন্যে মশলা খুঁজছে। খানিক দূরে কার্ট ঠেলছে এক যুবক, মনে মনে একটা গানের সুর গুনগুন করছে; মনে ভারি আনন্দ, নতুন চাকরি পেয়েছে সে। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেলসম্যানের দিকে তাকাল অ্যালি, এখনও সে তার ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত, মাথায় নোংরা দৃশ্য ঠাসা।

বড় করে শ্বাস ফেলে রানার দিকে ফিরল ও। এই মানুষটা সবার থেকে আলাদা। মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু সবকিছুর মূলে রয়েছে অ্যালি। এক মুহূর্তের জন্যে অন্য কিছু ভাবছে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত এক স্বস্তি জাগিয়ে তুলছে অ্যালির মাঝে। মনে হচ্ছে, এই মানুষটার

ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়... একে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। সারাক্ষণই যেন অদৃশ্য দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে লোকটা, কোনও আঘাত লাগতে দেবে না।

দশ মিনিট পর বিল মিটিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। জিপের পেছনে সদ্য কেনা সব জিনিস তুলে পথে নামল। শহর পেরিয়ে উত্তরের পাহাড়ি এলাকার দিকে চলেছে। পথে দু'জায়গায় থামবে বলে ঠিক করেছে রানা। প্রথমটা বেকারস্‌ফিল্ডেই—একটা ইলেকট্রনিকস্ স্টোর থেকে অডিয়ো রেকর্ডার কিনবে। দ্বিতীয় স্টপেজটা ভিসালিয়া শহরের একটা স্পেশালিটি শপ। ওখান থেকে বিশেষ দুটো আইটেম সংগ্রহ করবে ও। ইতিমধ্যে পে-ফোন থেকে কয়েক জায়গায় ফোন করেছে আইটেমদুটোর ব্যাপারে; সেগুলো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হবে ওদের। মনে মনে প্রার্থনা করছে অ্যালি, তেমন পরিস্থিতি যেন দেখা না দেয়।

একটা চৌরাস্তায় পৌঁছে বাঁয়ে মোড় নিল রানা। আধমাইল দূরে *বেস্ট বাই*-এর বিশাল সুপারস্টোর। আর তখুনি ঘটল ব্যাপারটা। দম আটকে এল অ্যালির, যেন কেউ কনুই দিয়ে আঘাত হেনেছে ওর বুকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানির আওয়াজ।

ঝট্‌ করে ওর দিকে তাকাল রানা। চোখে উদ্বেগ। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, অ্যালি?'

শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল আর নিল অ্যালি। বলল, 'কিছু না। আমি ঠিক আছি।'

আসলে ঠিক নেই ও। বুকের ওপর ভারী কী যেন চেপে বসেছে... সীমাহীন আতঙ্ক যেন ঘিরে ধরেছে ওকে! কিন্তু কেন? আশপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। দৃষ্টি আটকে গেল একটা সেলফোনের টাওয়ারের ওপর। সুপারস্টোরের ওপারে, ব্যস্ত শহরের ইমারতগুলোর মাঝ থেকে উঠে এসেছে ওটা, সগর্বে মাথা তুলে রেখেছে আকাশের বুকে। নিরীহদর্শন

একটা কাঠামো, অথচ ওদিকে তাকালেই হিম হয়ে আসছে বুকের ভেতরটা।

রানা বুঝতে পারছে ওর অবস্থা। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল অ্যালি। কিছু বলতে চাইছে না, রানা ওকে পাগল ভাবতে পারে। একটা টাওয়ার দেখে কেউ ভয় পায়?

ইণ্ডিকেটর জ্বেলে জিপকে রাস্তার পাশে নিয়ে গেল রানা, থেমে দাঁড়াল। তারপর ঘুরল মেয়েটার দিকে।

'আমার দিকে তাকাও,' নরম গলায় বলল ও। অ্যালির মনে হলো, অদৃশ্য হাতদুটোর বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়েছে। জোর করে টাওয়ার থেকে নজর ফেরাল, তাকাল রানার দিকে।

'ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন,' রানা বলল, 'তুমি আমাকে নির্দ্বিধায় খুলে বলতে পারো।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। বলল, 'ওই টাওয়ারটা... ওটার দিকে তাকালেই ভীষণ ভয় করছে। দম আটকে আসছে আমার।'

ভ্রূকুটি করে ওদিকে তাকাল রানা। বোঝার চেষ্টা করছে, ওতে সত্যিই কোনও ভীতিকর ব্যাপার আছে কি না।

'সম্ভবত ড্রাগের কারণে এমনটা হচ্ছে,' অ্যালি বলল। 'একটা টাওয়ার দেখে তো ভয়ের কিছু নেই।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা বলল। 'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এটা একটা কণ্ডিশনাল রেসপন্স।'

'সেটা আবার কী?'

'মানে হচ্ছে, স্মৃতি হারানোর আগে একটা কিছুকে ভীষণ ভয় পেতে তুমি, এখন সেটারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অবচেতন মনে এখনও রয়ে গেছে সেই আতঙ্ক, শরীর সে-অনুসারে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।'

‘কিন্তু সেলফোন টাওয়ার দেখে কেন ভয় পাব আমি?’

‘খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা।

এগারো

মাথার ভেতর ভুতুড়ে কণ্ঠটা শোনার আগে শেষ যে সুন্দর স্মৃতিটা মনে আছে অ্যাডাম নেপিয়ারের, সেটা বছরখানেকের পুরনো। দাদুর পিকআপ নিয়ে মরুভূমিতে গিয়েছিল সে, একটা কচ্ছপ খুঁজে বের করেছিল... পুরো বিকেল ধরে এঁকেছিল ওটার ছবি। ছবি আঁকার মাঝে অদ্ভুত এক প্রশান্তি খুঁজে পায় অ্যাডাম—দশ বছর আগে, হাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আঁকাআঁকির প্রতি তার অনুরাগ। সাদা কাগজের বুকে পেন্সিলের আঁচড়ে কোনোকিছুকে জীবন্ত করে তুলে সে অদ্ভুত আনন্দ পায়। জীবনের জটিল সময়গুলোয় মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোরও একটা পন্থা ওটা।

বোকা নয় অ্যাডাম—এ-কথা দাদুর মুখে বহুদিন আগে শুনেছে সে। একটা পুরনো গাড়ির গিয়ারবক্স মেরামত করেছিল সেদিন; কাজশেষে হাত থেকে তেল-কালি মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে শুনতে পেয়েছিল দাদুর কণ্ঠ—জিম নামে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। কয়েক মাইল দূরে, কোল্ড স্প্রিংসে জিমের একটা গ্রোসারি শপ রয়েছে। সেখান থেকেই ছবি আঁকার খাতা আর পেন্সিল কেনে অ্যাডাম।

‘বোকা নয় ও,’ বলেছিলেন দাদু। ‘কথাবার্তা একটু

বুঝিয়ে বলতে হয়, এই আর কী। ওর মাথা কিন্তু খুব ভাল। গাড়ির কলকবজা মেরামতে আমার চেয়ে কম দক্ষ নয় ও।'

'আগামীকাল যদি তুমি মারা যাও, তা হলে কী ঘটবে, সেটা ভেবে দেখেছ?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন জিম। 'বয়স আটষট্টি চলছে তোমার... কত কিছুই তো ঘটতে পারে! একা একা ব্যবসা সামলাতে পারবে ও? হাজারটা খরচ আছে শপের, নানা মেজাজের কাস্টমার আছে... ট্যাকেল দিতে পারবে? সেসব পরের কথা, শপটা চালু রাখতে চাইলে সার্টিফিকেশন নিতে হবে ওকে—আমি জানি না সেটা কীভাবে সম্ভব।'

কথাগুলো শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন দাদু।

জিম তখন নরম গলায় বললেন, 'আমি শুধু এটা বলতে চাইছি যে, ওকে দেখাশোনার জন্যে কাউকে প্রয়োজন। আমার বা আমার বউয়ের পক্ষে সেটা সম্ভব না। রিটায়ার করার পর পশ্চিম উপকূলে চলে যাব বলে ভাবছি আমরা। আর সে-কারণেই তোমার মাথায় ঢোকাতে চাইছি সমস্যাটা। তোমার অবর্তমানে অ্যাডামের কী হবে, তার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার।'

জবাবে কিচ্ছু বলেননি দাদু। সত্যিই হয়তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।

আজকাল জিমের কথাগুলো প্রায়ই মাথায় ভিড় করে অ্যাডামের। সত্যিই তো, দাদু যখন থাকবেন না, কী হবে ওর? মন অস্থির হয়ে ওঠে। ছবি না আঁকলে কাটে না সেই অস্থিরতা।

মরুভূমিতে কচ্ছপের ছবি আঁকার সেই বিকেলটার সমাপ্তি হয়েছিল অপূর্ব এক সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে। লালচে আভায় ভরে গিয়েছিল পশ্চিমের আকাশ, থোকা থোকা মেঘেও লেগেছিল রঙের ছোপ। আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত চিরে দিয়েছিল একটা পুরনো জেট ট্রেইল। নীড়ে ফেরা পাখির

ঝাঁক ডানা ঝাপটে চলেছিল সেই পটভূমিতে। ঝটপট কাগজে আকাশের একটা স্কেচ করে ফেলেছিল অ্যাডাম। এরপর বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে পড়েছিল পিকআপে। ইগনিশনের চাবি ঘোরাতে যাবে... আর তখুনি শুনল কণ্ঠটা।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একজনকে পেয়েছি।'

থমকে গিয়েছিল অ্যাডাম। বোকার মত তাকিয়েছিল চারদিকে। কোথাও কাউকে দেখতে পায়নি। পরক্ষণে আবার শুনতে পেয়েছিল কণ্ঠটা।

'মার্ক করো। অফ-এক্সিস থ্রি সেভেন... টু। মড ট্র্যাক বেশ শক্তিশালী; দেখো, কমিয়ে আনা যায় কি না।'

পুরুষের কণ্ঠ। অ্যাডামের মনে হচ্ছিল বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। খসখসে, যেন মুখভর্তি নুড়িপাথর নিয়ে কথা বলছে।

'হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে,' বলে চলছিল কণ্ঠটা। *'আরেকটু বাড়াও... থামো! পারফেক্ট! এবার বেরিয়ে যাও স্টেশন থেকে। বাকিটা আমিই সামলাতে পারব।'*

ততক্ষণে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে অ্যাডামের। পাগল হয়ে যাচ্ছে ও? এভাবেই কি শুরু হয় মস্তিষ্কবিকৃতি?

খানিক বিরতির পর ফের শোনা গেল কণ্ঠটা। এবার একদম পরিষ্কার, যেন পিকআপের ভেতরেই বসে আছে লোকটা। সবচেয়ে বড় কথা, এবার ওকেই লক্ষ্য করে কথা বলছে সে।

'তোমার নাম কী?'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'ভয় পেয়ো না,' বলল কণ্ঠটা। *'তোমার নাম বলো।'*

ঘামতে শুরু করল অ্যাডাম। হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে।

'পাগল হয়ে যাওনি তুমি, নিশ্চিত থাকো,' জানাল রুক্ষ

কণ্ঠ। *'তোমার নামটা বলো, প্লিজ।'*

তাড়াতাড়ি ইগনিশনের চাবি ঘোরাল অ্যাডাম। আর্তনাদ করে সচল হলো পিকআপের প্রাচীন ইঞ্জিন। হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে অ্যাকসেলারেটর চাপল ও। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল পিকআপ। ছুটে চলল মরুপ্রান্তর ধরে।

'পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই,' বলে উঠল রুক্ষ কণ্ঠ। *'আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।'*

হাত বাড়িয়ে রেডিয়োর সুইচ অন করল অ্যাডাম। ভলিউমের নব ঘুরিয়ে দিল পুরোটা। উদ্দাম সঙ্গীতে ভরে গেল ক্যাবের অভ্যন্তর। আশা করল, শব্দের বন্যায় ডুবে যাবে ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর।

লাভ হলো না। খানিক পরেই সবকিছু ছাপিয়ে কানে গমগম করে উঠল কণ্ঠটা।

'অযথাই আমাকে ভয় পাচ্ছ তুমি।'

কথাটা শেষ করেই অনেকটা সময়ের জন্যে নীরব হয়ে গেল রুক্ষ কণ্ঠ। অ্যাডাম ভাবল, আপদ বিদেয় হয়েছে। তাও গতি কমাল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে চলল পিকআপ। দৃষ্টিসীমায় ওদের বাড়িটা উদয় হলে ব্রেক চাপল। বন্ধ করে দিল রেডিয়ো। দাদু যদি ওকে এভাবে গাড়ি চালাতে দেখেন, সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। অনেক বছর হয়ে গেল, বড় কোনও ঝামেলায় জড়ায়নি ও; দাদু ওকে বিশ্বাস করেন। এখন পাগলের মত গাড়ি চালাতে দেখলে সে-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

বাড়ির সিকি মাইলের ভেতর পৌঁছুতেই ফিরে এল কণ্ঠটা। এবার আগের চেয়ে জোরালোভাবে।

'নাম বলো... তা হলে কিছু সময়ের জন্যে আমি তোমাকে একা থাকতে দেব।'

দূর থেকে দাদুকে দেখতে পেল অ্যাডাম—গ্যারাজে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা, ভেতরে দাঁড়িয়ে একটা ট্রাক্টর

মেরামত করছেন তিনি।

'নাম বললেই তোমার মুক্তি। আপাতত আর কিছু জানতে চাই না আমি।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল অ্যাডাম। ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাডাম... আমার নাম অ্যাডাম।'

'পুরো নাম বলো।'

তার আর প্রয়োজন হলো না। মনের পর্দায় নামটা ভেসে উঠতেই সন্তুষ্টির হাসি শোনা গেল রুক্ষ কণ্ঠ থেকে।

'অ্যাডাম নেপিয়ার,' বলল লোকটা। *'তোমাকে ধন্যবাদ।'*

সারা সন্ধ্যা আর একবারও অ্যাডামকে বিরক্ত করল না ভুতুড়ে কণ্ঠ। ডিনার সারল ও, টিভি দেখল। দাদু ব্যস্ত রইলেন ব্যবসার হিসাবপত্র নিয়ে। সাড়ে এগারোটায় বিছানায় গেল ও। বাতি নিভিয়ে বন্ধ করল দু'চোখ। ভাবছে, ভালমত একটা ঘুম দিতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আগামীকাল সকালে সব আবার ফিরে যাবে আগের নিয়মে।

তা আর হলো না। বাতি নেভানোর ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় কথা বলে উঠল রুক্ষ কণ্ঠ।

'হ্যালো, অ্যাডাম!'

আঁতকে উঠল অ্যাডাম। এখন আর গাড়ি চালাচ্ছে না ও। রেডিয়ো ছেড়ে দিয়ে কণ্ঠটাকে দাবিয়ে রাখার উপায় নেই।

'থামো!' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'প্লিজ।'

'অভিজ্ঞতাটা তোমার জন্যে খারাপ হবার প্রয়োজন নেই, অ্যাডাম। ভালও হতে পারে... যদি তুমি আমাকে বাধা না দাও। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

আবারও দ্রুত শ্বাস পড়ছে অ্যাডামের। ভয় পাচ্ছে ভীষণ। এমন ভয় আগে কোনোদিন পায়নি। বিভ্রান্তি? হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে। ওর জীবনটাই বিভ্রান্তিতে ভরা... আর

প্রত্যেক বিভ্রান্তির সঙ্গে মিশে ছিল ছোটখাট ভয়। কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার কোনও তুলনা চলে না...

হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল। চোখের পলকে কেটে গেল সব ভয়, নতুন একটা অনুভূতি ছেঁকে ধরল ওকে। প্রথমটায় বুঝল না, পরে যখন বুঝল, বিস্মিত গলায় বলল, 'এসব কী!'

'রিল্যাক্স,' বলল রুক্ষ কণ্ঠ। *'শরীরের আনন্দে কোনও দোষ নেই।'*

এই অনুভূতির সঙ্গে অ্যাডাম পরিচিত। সাবালক হবার পর থেকে বহুবার জেগেছে অনুভূতিটা, যদিও ইদানীং তা কমে এসেছে অনেকটাই। শেষবার কবে এমন তীব্র অনুভূতি হয়েছিল? সম্ভবত বিশ বছর বয়সে।

প্যান্টের ভেতর নিজের পুরুষাঙ্গের ফুলে ওঠা টের পাচ্ছে ও।

'ভাল লাগছে না?'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। ওর মনের পর্দায় এখন ভেসে উঠছে একের পর এক সুন্দরী তরুণীর ছবি—প্রত্যেকেই নিরাবরণ। আজ পর্যন্ত কোনও সত্যিকার মেয়ের সান্নিধ্য পায়নি ও, শুধু ছবি দেখেছে; কিন্তু এখন যা দেখছে তাকে ছবি বলা মুশকিল। একদম যেন জীবন্ত প্রতিটি মেয়ে—তাদের হাবভাব, চলাফেরা... সব কিছুতে রয়েছে প্রাণের ছোঁয়া।

'উপভোগ করো।'

না, ছবি নয়। অ্যাডামের মনে হলো, সব একদম বাস্তব... সত্যি। ছবি হলে শরীরে এমন শিহরন জাগত না। সুখের আবেশে কেঁপে উঠত না সমস্ত রোমকূপ। যেন এক সুখের সাগরে ভেসে চলেছে সে।

কতক্ষণ এমনটা চলল, জানে না অ্যাডাম। শুধু একসময় টের পেল, ক্ষরণ হয়েছে ওর। সংবিৎ ফিরে পেল পরক্ষণে। উঠে বসে কপালের ঘাম মুছল। কী ঘটল, জানে না। তবে

বুঝতে পারছে, সত্যিকার মিলনেও এরচেয়ে বেশি সুখ পাওয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে।

'সাবাস!' মৃদু হাসিমাখা কণ্ঠ শুনতে পেল ও। *'যদি লক্ষ্মী ছেলের মত আমার সব কথা শোনো, এমন আনন্দ তুমি প্রতি রাতে পাবে।'*

আর যদি কথা না শুনি? প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই জেগে উঠল অ্যাডামের মনে।

'সেটা তুমি যথাসময়ে জানতে পারবে,' বলল অদৃশ্য কণ্ঠ।

পরদিনই প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেল অ্যাডাম। বাজার করার জন্যে শহরে গেলেন দাদু। তাঁর গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যেতেই কানে বেজে উঠল রুক্ষ কণ্ঠ।

'এমন কিছুর কথা ভাবো, যেটা তোমার দাদু খুব ভালবাসেন। তাঁর প্রিয় কোনও জিনিস... যেটা বাড়িতেই আছে।'

'মানে?'

'কথা বাড়িয়ো না। ভাবতে বলেছি, ভাবো।'

চেষ্টা করে ভাবতে হলো না, আপনাআপনিই একটা ছবি ভেসে উঠল মানসচোখে—পোর্সেলিনের একটা বেড়াল মূর্তি, দাদুর বিছানার পাশের নাইটস্ট্যাণ্ডে রাখা থাকে। অ্যাডামের প্রয়াত দাদীর স্মৃতিচিহ্ন। খুব অল্প-বয়েসে বিয়ে হয়েছিল ওঁদের। দাদুকে জীবনের প্রথম উপহার হিসেবে ওই ছোট্ট মূর্তিটা দিয়েছিলেন দাদী।

'চমৎকার। দাদুর রুমে যাও।'

'ওখানে আমার ঢোকা বারণ।'

'কিচ্ছু হবে না। যাও।'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকল অ্যাডাম। লিভিংরুম পেরিয়ে দাদুর বেডরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মূর্তিটা

দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। ধবধবে সাদা, পোর্সেলিনের তৈরি একটা বেড়াল—এক পা শূন্যে তুলে থাবা চাটছে।

‘ওটা তুলে নিয়ে আছাড় মারো মেঝেতে।’

‘কী বলছ! না, আমি ভাঙব না।’

‘ভাঙবে। ভাঙতেই হবে তোমাকে!’

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাডাম। পা বাড়াল সামনের দরজার দিকে। যথেষ্ট সহ্য করেছে, আর না। হয়তো সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর, তার মানে এই নয় যে, এখন থেকেই পাগলামি করে বেড়াবে। মাথার ভেতর যা খুশি বলে বেড়াক কণ্ঠটা, ও পাত্তা দেবে না।

দরজা ঠেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অ্যাডাম। পা রাখল আঙিনায়। পরক্ষণে থমকে গেল ওঁ। গত রাতের মত আবারও কী যেন ঘটতে শুরু করেছে ওর ভেতরে। তবে এবারের অনুভূতি আনন্দময় নয়। দুটো অনুভূতি খেলা করছে ওর শরীরে। প্রথমটা শারীরিক বেদনার। মনে হলো, অদৃশ্য একটা হাত সেঁধিয়ে গেছে ওর পেটের ভেতর; নাড়িভুঁড়ি মুঠো করে ধরে মোচড়াচ্ছে। ব্যথায় দম আটকে আসার জোগাড়।

একই সঙ্গে হানা দিল আরেকটা অনুভূতি—সেটা মানসিক যন্ত্রণার। মনের পর্দায় ভেসে উঠল দশ বছর আগেকার একটা দৃশ্য... দাদীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য। দাদুকে দেখতে পেল অ্যাডাম—কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুছছেন চোখ। অতিথিরা একে একে কাছে আসছেন, দাদুকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। একটু পর বদলে গেল দৃশ্যটা। কয়েক ঘণ্টা পরের ঘটনা দেখতে পেল ও। নিজের বেডরুমে শুয়ে আছেন তিনি, দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে পাল্লায় ধাক্কা দিচ্ছে ও। একটু পর ধরা গলায় দাদু বললেন, ‘আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না, অ্যাডাম।’

‘আমার খিদে পেয়েছে!’

‘সময় হলেই খাবার পাবে। এখন নাহয় একটু বাইরে

হেঁটে এসো। আমার মনটা ভাল নেই।'

'না, আমার এখুনি খাবার চাই!' ধুমধাম করে দরজায় কিল মারল অ্যাডাম। দাদু ফুঁপিয়ে উঠলেন।

'এসবের জন্যে তুমি দায়ী!' মাথার ভেতর গমগম করে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর।

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ। তোমারই কারণে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তোমার দাদীর।'

'মিথ্যে কথা!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল অ্যাডাম। কষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠছে—শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট।

'মিথ্যে বলছি না। তোমার অত্যাচারে মারা গেছেন তিনি। তোমার জন্যেই কাঁদতে হয়েছে তোমার দাদুকে। কারণ তিনি জানতেন, অত বড় একটা কাণ্ডের পরেও তোমাকে পরিত্যাগের কোনও উপায় ছিল না তাঁর।'

'থামো! থামো বলছি!'

'বেচারার জীবনটা নরকে পরিণত করেছ তুমি, অ্যাডাম। শেষ বয়সেও শান্তি নেই তাঁর। সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়, তোমার খেয়াল রাখতে হয় চব্বিশ ঘণ্টা। শান্তিতে মরবারও উপায় নেই তাঁর।'

'এসব বানোয়াট কথা,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে কোনোমতে বলল অ্যাডাম। 'সব আমার অবচেতন মনের চিন্তা। আমিই ভাবছি এসব।'

'ভুল।' মৃদু হাসল কণ্ঠটা। পরমুহূর্তে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল অ্যাডামের তলপেটে। উষ্ণ তরলের মত তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অনুভূতিটা গত রাতের মত জান্তব... বাস্তব; কিন্তু ঠিক বিপরীত।

'সব তোমার দোষ, অ্যাডাম।'

আর প্রতিবাদ করল না অ্যাডাম। আচমকা উপলব্ধি

করতে পারছে, বুকের ভেতর কী ভয়ানক কষ্টই না চাপা দিয়ে রেখেছেন দাদু। কোনোদিন কিছু বলেননি ওকে। অপরাধবোধে কাঁধ নুয়ে এল ওর।

'যাও, মূর্তিটা ভেঙে ফেলো,' নির্দেশ এল। *'কথা দিচ্ছি, তা হলে এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে তুমি।'*

'আ... আমি পারব না। দাদীর স্মৃতি ওটা... দাদু আগলে রেখেছেন।'

'চিন্তার কিছু নেই। আঠা দিয়ে ভাঙা জিনিস আবার জোড়া দেয়া যায়। স্মৃতিচিহ্নটা হারাবে না।'

'কিন্তু কেন? কেন আমাকে ওটা ভাঙতে বলছ তুমি? কী লাভ ওতে?'

'যাতে বুঝতে পারি, আমার আদেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।'

'অন্য কিছু করতে বলো।'

'না। যা বলছি, সেটাই করতে হবে।'

'দাদুকে আমি কী বলব? ভাঙা মূর্তি দেখে প্রশ্ন করবেন তিনি।'

'সেটা তোমার সমস্যা। এখন যাও, ভাঙো মূর্তিটা।'

নড়ল না অ্যাডাম।

'এই কষ্ট থেকে মুক্তি চাও না তুমি? দিনভর ভোগ করতে চাও কষ্টটা? রাতেও? ঘুমাতে পারবে না তুমি, ছটফট করবে অবিরাম। তোমার জীবন নরক করে তুলতে পারি আমি, অ্যাডাম। জানো না?'

জানে অ্যাডাম। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে ওর।

'যাও,' নরম গলায় বলল কণ্ঠটা। বন্ধুর মত সুর। *'কাজটা করামাত্র ভাল লাগবে তোমার। কথা দিচ্ছি। সময়ও বেশি লাগবে না। যাও!'*

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেছে ওর। উল্টো ঘুরল ও। টলমল পায়ে এগিয়ে গেল দরজার

দিকে।

পরের সপ্তাহগুলোয় আরও কিছু পরীক্ষা দিতে হলো অ্যাডামকে। মূর্তি ভাঙার মত কঠিন ছিল না কোনোটাই, তবে একেবারে সহজও নয়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারল ও—রহস্যময় কণ্ঠটা আর যা-ই হোক, ওর কল্পনাপ্রসূত নয়।

মূর্তি ভাঙার দু'সপ্তাহ পর নিশ্চিত প্রমাণ পেল ও। সেদিনও বাজার করতে শহরে গিয়েছিলেন দাদু। কণ্ঠের মালিক ওকে হুকুম করল, ছোট একটা বেলচা নিয়ে পায়ে হেঁটে মরুভূমিতে যেতে হবে। ওদের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে তিনটে জশুয়া গাছ একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে—একেকটা গাছের মাঝে দূরত্ব দশ ফুট। ওকে বলা হলো, ত্রিভুজের ঠিক মাঝখানটায় খুঁড়তে। ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় ঠং করে কিছুতে বাড়ি খেল বেলচার ডগা। মাটি সরিয়ে ধাতব একটা বাক্স বের করে আনল অ্যাডাম। সেটার ডালা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ।

'কখনও অস্ত্র ধরেছ, অ্যাডাম?'

'ওসব আমার ছোঁয়া বারণ।'

'এটা ধরতে পারো। বাক্সের ভেতর যে-অস্ত্রটা দেখছ, ওটার নাম এমপি-ফাইভ। তোমার জন্যে লোড করে রাখা হয়েছে। সেফটিও অফ করা। তোলো ওটা।'

যতটা ভেবেছিল, তারচেয়ে ভারী অস্ত্রটা। হাত কেঁপে উঠল অ্যাডামের। অস্ত্রের ওজনে নয়, নার্ভাসনেসে। আস্তে আস্তে কাঁধের কাছে তুলল, টিভিতে দেখা লোকজনের মত।

'বিশ ফুট সামনে একটা মাটির ঢিবি দেখতে পাচ্ছ? গুলি করো ওটায়। ভয় নেই, কেউ শুনতে পাবে না।'

ইতস্তত করল অ্যাডাম।

'কাম অন! এই সামান্য কাজেও নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না?'

সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ল অ্যাডামের। বাধা দিলে তার পরিণতি ভাল হবে না। বড় করে শ্বাস নিল ও। তারপর টিপে ধরল ট্রিগার। বিকট আওয়াজ হলো গুলিবর্ষণের, মুঠোর ভেতর লাফিয়ে উঠল এমপি-ফাইভ। আরেকটু হলেই হাত থেকে নিচে পড়ে যেত।

'আরও শক্ত করে ধরতে হবে তোমাকে। সেজন্যেই প্র্যাকটিস করাচ্ছি। চিন্তা কোরো না, অ্যাডাম, আমি তোমাকে অস্ত্র চালানোর সব কলাকৌশল শিখিয়ে দেব।'

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরীক্ষাটা দিতে হলো চার মাসের মাথায়। সেদিনও দাদু বাইরে গেলেন, তবে বাজার করতে নয়; দরকারি কিছু যন্ত্রাংশ কিনতে সিডারভিলে যেতে হলো তাঁকে। যাবার সময় বলে গেলেন, ফিরতে দেরি হবে। সুযোগটা হাতছাড়া করল না রহস্যময় কণ্ঠ। দাদু চলে যেতেই গমগম করে উঠল মাথার ভেতর।

'গ্যারাজ থেকে কোয়াড-টা নাও। রাস্তা পেরিয়ে মরুভূমিতে যাবে। সোজা উত্তরদিকে। কোথায় যেতে হবে, সেটা রওনা হবার পর জানাচ্ছি।'

বাধ্য ছেলের মত চার-চাকার কোয়াড বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যাডাম। ওদিকটায় সরকারি জমি। পরিত্যক্ত। বাড়ি-ঘর নেই, এমনকী জিপ চলাচলের ট্রেইল পর্যন্ত নেই। পুরোটাই পাহাড়, প্রান্তর আর গিরিখাতে ভরা বন্ধ্যা এলাকা। একের পর এক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলল ও। বাড়ি থেকে সরে যাচ্ছে দূরে... আরও দূরে।

'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলতে চাই,' হঠাৎ বলল রুক্ষ কণ্ঠ, *'মানুষের জীবনের খুব মৌলিক একটা বিষয় সম্পর্কে।'*

'কী বিষয়?'

'দুঃখ, কষ্ট আর বেদনা। কীভাবে ওসব মোকাবেলা করে

মানুষ, জানো?'

'কীভাবে?'

'নিজেই পুরোটা হজম করে, কিংবা অন্যের মাঝে নিজের কষ্টটা ছড়িয়ে দেয়।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'উদাহরণ দেয়া যাক। তোমার স্কুলে নিশ্চয়ই বখাটে কিছু ছেলে ছিল, যারা দুর্বল ছেলেদের ওপর অত্যাচার চালাত?'

'সে তো সব স্কুলেই থাকে।'

'ওরা কেন অমন করে, জানো? কারণ, বাড়িতে ওরা নিজেরাই বাপ অথবা অন্য কারও হাতে মার খায়। কেউ কেউ সেই কষ্ট চুপচাপ সহ্য করে, আর কেউ বা স্কুলে এসে অন্যদের মাঝে কষ্টটা ছড়িয়ে দেয়। এ-কাজ শুধু বখাটে ছেলেরাই করে না, অন্যেরাও করে। সেটাই দুনিয়ার নিয়ম। আরেকটা উদাহরণ দেব? স্কুলে থাকতে একটা মেয়েকে পছন্দ করতে তুমি, তাই না? ওর নাম শেরি।'

অবাক হলো না অ্যাডাম। ওর মাথার ভেতরে যে ঘুরে বেড়াতে পারে, তার কাছে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে সায় জানাল ও।

'মেয়েটাও পছন্দ করত তোমাকে। গ্রীষ্মের ছুটির দুটো মাস খুব ভাল সময় কেটেছিল তোমাদের। দু'জনের পছন্দ-অপছন্দে প্রচুর মিল ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে তোমরা। একটুও নার্ভাস হতে না তুমি।'

কিছু বলল না অ্যাডাম। সেই সময়টার কথা ভাবতে চায় না। হ্যাঁ, ভাল বন্ধুত্ব হয়েছিল দু'জনের; কিন্তু ওর মত একটা ছেলের সঙ্গে ধনীর দুলালী শেরির সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি এগোবার কথা ছিল না।

'ছুটির শেষে কী ঘটল, মনে আছে? প্রথম দিন স্কুলে দু'জনে একসঙ্গে রইলে, আর তা দেখে টিটকিরির বন্যা বইল। তুমি তাতে অভ্যস্ত ছিলে, কিছু মনে করোনি; কিন্তু

শেরির পক্ষে ওসব সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। কাজেই কী করল সে? পরদিন তুমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে, অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। তোমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল নিজের বান্ধবীদের সঙ্গে। আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে মেশেনি সে।'

'এসব কেন শোনাচ্ছ আমাকে?'

'বাস্তবতা বোঝাবার জন্যে। শেরি সেদিন কী করেছিল, জানো? সমস্ত কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছিল তোমার ওপরে। নিজে হালকা হয়ে গিয়েছিল। অবজ্ঞা-অবহেলা তুমি সইলে, আর ও পেল বান্ধবীদের বাহবা। কষ্ট পেতে হলো না আর। এভাবেই পৃথিবী চলছে, অ্যাডাম—একের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। তোমাকে সেটা বুঝতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ ওই কাজটা তোমাকেও করতে হবে—নিজের কষ্ট চাপিয়ে দিতে হবে অন্য কারও ওপরে। কীভাবে তা করতে হয়, আমি তোমাকে শেখাব... আর সেটা আজই।'

মাইলখানেক পেরিয়ে শেষ চড়াইটা অতিক্রম করল অ্যাডাম। এরপর দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। শ্যাওলা-রঙের একটা কনভার্টিবল গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওখানে। গাড়ির পেছনে উবু হয়ে আছে একজন মানুষ। কোয়াড বাইকের আওয়াজ কানে যেতেই ঝট্ করে সিধে হলো সে। পুরোপুরি উঠে দাঁড়াল না... কেন যেন দাঁড়াতে পারছে না... শুধু শরীর জাগিয়ে তাকাল ওর দিকে।

কাছাকাছি যেতেই সমস্যাটা ধরতে পারল অ্যাডাম। হাত-পা বাঁধা মানুষটার—শেকল দিয়ে হাতদুটো আটকে দেয়া হয়েছে গাড়ির বাম্পারের সঙ্গে। বড়শিতে আটকা পড়া মাছের মত লাগছে তাকে, শরীর মোচড়াচ্ছে। অ্যাডামকে দেখতে পেয়ে স্থির হলো। ব্রেক কষে বাইক থামাল অ্যাডাম, নেমে

এল মাটিতে। শান্ত চোখে দেখল মানুষটাকে। বয়স বেশি নয়, তরুণ—কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রের মত চেহারা। পরনে টি-শার্ট আর জিন্স। বাহুতে কালো উল্কি আঁকা।

'একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ, বন্ধু,' বলল তরুণ। কোয়াড বাইকের দিকে ইশারা করল। 'ওটায় যন্ত্রপাতি কিছু আছে? বাম্পারটা খুলতে পারলেই হয়।'

'জবাব দেবার প্রয়োজন নেই,' অ্যাডামকে বলল রুক্ষ কণ্ঠ। *'তুমি ওকে মুক্ত করতে আসোনি।'*

'কী হলো?' তরুণের কণ্ঠে তাড়া। 'কথা বলছ না কেন?'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'আমার সঙ্গে কোনও যন্ত্রপাতি নেই।'

'তা হলে পুলিশে খবর দাও। তাড়াতাড়ি! যারা আমাকে বেঁধে রেখে গেছে, তারা ফিরে আসতে পারে। তোমার কাছে ফোন আছে তো?'

অপলক তাকিয়ে রইল অ্যাডাম। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। মরুভূমির মাঝখানে যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্র পুঁতে রাখা হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এই মানুষটাকেও রেখে যাওয়া হয়েছে ওর জন্যে।

'অ্যাই!' ডাকল তরুণ। 'শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'এসবের মানে কী?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল অ্যাডাম। গলা কাঁপছে ওর।

'গাড়ির সামনে যাও,' বলল রুক্ষ কণ্ঠ। *'প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুললে মেঝেতে একটা ভারী রেঞ্চ পাবে।'*

পরের নির্দেশটা অনুমান করতে পারছে অ্যাডাম। ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

'আ... আমি পারব না,' বলল ও।

'মাথা থেকে শুরু করতে পারো,' পরামর্শ দিল রুক্ষ কণ্ঠ। *'তা হলে বেশিক্ষণ চেঁচাতে পারবে না।'*

হাঁটু কাঁপছে অ্যাডামের। ওর উদ্দেশে চেঁচিয়ে কিছু বলছে

ছেলেটা, লাল হয়ে উঠেছে চেহারা, কিন্তু কোনও কথা কানে পৌঁছুচ্ছে না ওর। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে হৃৎপিণ্ডে, মাথার ভেতরে শুনতে পাচ্ছে নিজের কণ্ঠস্বর—না... কিছুতেই না! অদৃশ্য কণ্ঠটা গমগম করে উঠল তার মাঝে।

'আমার আদেশ অমান্য কোরো না, অ্যাডাম। ফলাফল কী হতে পারে, সেটার নমুনা তুমি দেখেছ। চাইলে তার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট দিতে পারি আমি তোমাকে।'

'আমাকে দিয়ে হবে না... আমি পারব না কিছুতেই।'

'রেঞ্চটা নিয়ে এসো, অ্যাডাম। পিটিয়ে খুন করো ছেলেটাকে!'

'না!' চিৎকার করল অ্যাডাম।

থতমত খেয়ে গেল বন্দি তরুণ। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না।

পরমুহূর্তে ভয়াবহ অনুভূতিটা চেপে বসল অ্যাডামের মাঝে। দাদীর কবর দেখতে পেল ও, এবার সেটার পাশে দাদু নেই, রয়েছে কেবল ও—একা। হঠাৎ নড়ে উঠল কবরফলক। ছিটকে পড়ল একপাশে। ভূমিকম্পের মত কাঁপছে মাটি, সরে যাচ্ছে... উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে কবর! ধূলিধূসরিত কফিনটা দেখা গেল একটু পরেই। বিচ্ছিরি শব্দ তুলে খুলতে শুরু করল ডালা।

'তোমার দোষ, অ্যাডাম! তোমার দোষ!!'

'না! আমি পারব না!' বলল অ্যাডাম। 'যা খুশি করো তুমি, আমি কারও প্রাণ নিতে পারব না।'

'কষ্ট দিতে পারি তোমাকে—ভয়ঙ্কর কষ্ট। এতই ভয়ঙ্কর যে, কষ্টটা আরেকজনের ওপর না চাপিয়ে উপায় থাকবে না তোমার।'

'পারব না আমি!'

'পারবে। এই দেখো।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাডামের। মনে হলো, কবরের

ওপর ঝুঁকে গেছে সে, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ভেতরে। চেঁচিয়ে উঠল নিজের অজান্তে।

'পিউট্রেফিক্যাকশন কাকে বলে, জানো?' প্রশ্ন করল রুক্ষ কণ্ঠ।

জবাব দিল না অ্যাডাম। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে কবরের তলদেশ। কফিনের ডালা সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে দাদীর কঙ্কাল—থিকথিকে তরলের মাঝে ভাসছে তাঁর হাড়গোড়। তার ওপরে ধপাস করে পড়ল ও। দাদীর পাঁজরের হাড় ভেঙে ঢুকে গেল দু'হাত। সারা গা ভরে গেল পূতিগন্ধময় তরলটাতে।

'ওটাই পিউট্রেফিক্যাকশন। মরার পর যা ঘটে। পচে-গলে যায় শরীরের সব মাংস, পরিণত হয় ওই থিকথিকে স্যুপে।'

চেঁচাচ্ছে অ্যাডাম। পিছিয়ে গেল দু'পা। চোখ বন্ধ করে ফেলল। তাতে লাভ হলো না। সব দেখতে পাচ্ছে এখনও। নাকে ভেসে আসছে মাংসপচা ভয়ানক বদগন্ধ, পেট উল্টে আসার জোগাড়।

'হ্যাঁ, স্যুপ,' বলল রুক্ষ কণ্ঠ। *'মরার পর স্যুপ হয়ে যায় মানুষ। তোমার দাদীও স্যুপ হয়ে গেছে। আর সেটা তোমার জন্যে। তুমিই তার জন্যে দায়ী।'*

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কীভাবে বাইকে উঠে বসল, বলতে পারবে না অ্যাডাম। টের পেল, ওর অবস্থা দেখে চেঁচাচ্ছে বন্দি তরুণ—সাহায্য চাইছে না, ভয় পেয়ে গেছে। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল ও, থ্রটল ঘুরিয়ে সামনে ছোটাল কোয়াড বাইক। কোথায় যাচ্ছে, কিচ্ছু জানে না। শুধু জানে, পালাতে হবে ওকে।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল রুক্ষ কণ্ঠ।

কান দিল না অ্যাডাম। মরুর রুক্ষ জমি যেন প্রকাণ্ড সব ঢেউ, সেগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে কোয়াড বাইক। প্রতি ঝাঁকিতে গুঙিয়ে উঠছে ওটার পুরো বডি। কিন্তু পাত্তা

দিল না ও। থ্রটল পুরোপুরি খোলা। ইঞ্জিনের কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আদায় করতে চাইছে। ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁপ দিচ্ছে বাইক। পিছিয়ে যাচ্ছে শ্যাওলা রঙের গাড়ি আর বন্দি তরুণ।

আচমকা সচেতন হয়ে উঠল অ্যাডাম। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। কানেও বাজছে না অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। ওর ওপর থেকে যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রহস্যময় শক্তিটা। মনে পড়ল, এমনটা আগেও ঘটেছে—একেবারে প্রথম সন্ধ্যায়, ও যখন পিকআপ ছোটাচ্ছিল বাড়ির উদ্দেশে। তবে কি এ-আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার উপায় এটাই?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অ্যাডাম, সামনে আচমকা উদয় হওয়া উঁচু ঢিবিটা লক্ষ করেনি; ফুল স্পিডে ওটার ওপর দিয়ে ছুটল বাইক, ঝাঁপ দিল বাতাসে। শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে বাহনটাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল ও, কিন্তু লাভ হলো না। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বাইক। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ছিটকে পড়ল অ্যাডাম।

কয়েক মুহূর্ত পর ককাতে ককাতে উঠে দাঁড়াল ও। ঘুরে তাকাল ফেলে আসা পথের দিকে। কনভার্টিবলটা আধ মাইল দূরে। বন্দি তরুণের মুখটা এতদূর থেকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

'পালাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই,' কথা বলে উঠল রুক্ষ কণ্ঠ। *'আমার হাত থেকে মুক্তি নেই তোমার।'*

'প্লিজ!' অনুনয় করল অ্যাডাম।

'আমি কী চাই, তা তুমি জানো। কথামত কাজ না করলে কী ঘটবে, তাও জানা আছে তোমার। চাইলে বাকি জীবন তোমাকে ওই স্যুপের ভেতর রেখে দিতে পারি আমি। এখন নিজেই ঠিক করো কী করবে। ভাবনা-চিন্তার জন্যে কয়েক মিনিট সময় নিতে পারো, আমাদের বন্ধু কোথাও চলে যাচ্ছে না।'

চুপ হয়ে গেল রুক্ষ কণ্ঠ। নেমে এল নীরবতা। কোয়াড

বাইকের ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ, আর নিজের বুকের ধুকপুকানি ছাড়া কিছু শুনতে পাচ্ছে না অ্যাডাম।

ঘন ঘন শ্বাস নিল ও। নাকে লেগে আছে দাদীর পচা-গলা দেহের বিশ্রী দুর্গন্ধ, কিছুতেই যাচ্ছে না। হাতদুটো চোখের সামনে তুলে ধরল—শুকনো, ধুলোমাখা... অথচ ওর মনে হচ্ছে, ভিজে চট চট করছে দু'বাহু।

পা গুটিয়ে মাটিতে বসে পড়ল অ্যাডাম। গুণচিহ্নের মত দু'বাহু ভাঁজ করল বুকের ওপর, খামচে ধরল দু'কাঁধ। তারপর সামনে-পিছে দোলাতে থাকল ঊর্ধ্বাঙ্গ—অপ্রকৃতিস্থের মত। সেই ছোটবেলায়, কোনও কারণে আপসেট হলে এমনটা করত ও। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এ-কারণে কম খেপায়নি ওকে। বহু চেষ্টায় দূর করেছিল অভ্যেসটা। আজ আবার ফিরে এসেছে সেটা।

বিশ মিনিট পর কোয়াড বাইক নিয়ে কনভার্টিবলের কাছে ফিরে এল অ্যাডাম। ইঞ্জিন বন্ধ করে ও যখন নামল, কিছু বলল না বন্দি তরুণ; শুধু ক্লান্ত দু'চোখ মেলে অপলক তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

নিঃশব্দে গাড়ির সামনে চলে গেল অ্যাডাম, প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলল। মেঝের ওপর পড়ে আছে ভারী রেঞ্চটা, হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল ও। যন্ত্রটা দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তরুণের চেহারা। ভাবল, ওকে বুঝি মুক্ত করতে চলেছে অচেনা মানুষটা। পরক্ষণে অ্যাডামের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। আশা মুছে গিয়ে চেহারায় ফুটে উঠল আতঙ্ক। শেকল ধরে টানাটানি শুরু করল তরুণ, পিছিয়ে যেতে চাইছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কিছু দুর্বোধ্য শব্দ—করুণা প্রার্থনা ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের মিশেল।

কয়েক মুহূর্ত তার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাডাম। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ক্ষমা কোরো, আমি

নিরুপায়।'

রেঞ্চটা উঁচু করল ও।

দু'দিন পর দাদুর অনুপস্থিতির সুযোগে জায়গাটা আবার দেখতে গেল অ্যাডাম। কনভার্টিবলটা গায়েব। যেখানে হতভাগ্য তরুণটির মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেখানে ধুলো ছাড়া আর কিছু নেই। রক্তে ভেজা জায়গাটা চেঁছে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিন মাস পেরিয়ে গেছে সেই ঘটনার পর। প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে অদৃশ্য কণ্ঠটা হানা দেয় ওর কানে। মনের পর্দায় জীবন্ত করে তোলে নিত্যনতুন সুন্দরী মেয়ে, শরীর ভরিয়ে দেয় সুখের আবেশে। ভাল লাগে ওর, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ক্ষণিকের সেই সুখ শেষ হবার পর, ও যখন ফের নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে হাজারো প্রশ্ন।

এসব কেন ঘটছে? কী চায় ওই রুক্ষ কণ্ঠের অশরীরী?

আজও প্রশ্নগুলোর জবাব পায়নি অ্যাডাম।

বারো

টিফানি ক্যানট্রেল যখন অ্যামারিলোর চিলড্রেন'স্ মেডিক্যাল সেন্টারে পৌঁছুল, তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। এণ্ট্রান্সের চওড়া পোর্চের তলায় গাড়ি থামতেই ঝটপট নেমে গেল ওর দুই সঙ্গী, পজিশন নিল সামনে ও পেছনে। গাড়ির

ভেতর থেকে ভালমত দেখা যাচ্ছে না লোকদুটোকে, তবে টিফানি জানে ওরা কী করছে। সতর্ক চোখে নজর বুলাচ্ছে চারপাশে, হাত ঘোরাফেরা করছে কোটের তলার হোলস্টারে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের আশপাশে, যে-কোনও বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। সশস্ত্র দুই দেহরক্ষীর আচরণ যেন ওর মনের ভেতরে দানা বাঁধা উদ্বেগের প্রতিমূর্তি।

খানিক পর গাড়ির ছাদে আঙুলের টোকা দিল এক দেহরক্ষী। সঙ্কেত পেয়ে ইগনিশন বন্ধ করল ড্রাইভার। টিফানিকে বলল, 'ক্লিয়ার।'

এ-ই হয়ে আসছে সবসময়—পুরোটাই যেন ছকে বাঁধা এক নাটক। দরজা খুলে ধরল এক দেহরক্ষী, গাড়ি থেকে নামল টিফানি। হাঁটতে শুরু করল ও, কয়েক কদম তফাতে ওকে অনুসরণ করল তারা। তবে ভেতরে ঢুকল না। টিফানি হাসপাতালে ঢুকে গেলে দরজার বাইরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় টিফানি, দুই দেহরক্ষীর সঙ্গে সমস্ত উদ্বেগও রয়ে যাচ্ছে বাইরে। অনেকটা ওভারকোটের মত, বাড়িতে ঢোকার সময় যেন ঝুলিয়ে রাখছে দরজার পাশে, ফেরার আগে ও-নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। মাঝে মাঝে চিন্তাটা কাজে দেয় বেশ।

লিফটে চেপে ষাট সেকেণ্ডের মাথায় পাঁচতলায় উঠে এল ও। বড় বড় হরফে একটা সাইনবোর্ড শোভা পাচ্ছে ওখানে—*অঙ্কোলজি*।

সরাসরি নিজের অফিসে গেল না টিফানি, রিসেপশনে দাঁড়িয়ে কর্তব্যরত নার্সের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল, এরপর নর্থ উইঙের হলওয়ে পেরিয়ে ডানপাশের তৃতীয় দরজার সামনে পৌঁছুল। দরজার পাল্লা হাট করে খোলা। কামরার ভেতরটা কোমল আলোয় আলোকিত। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চৌকাঠে টোকা দিল ও।

দশ ফুট দূরে, ল্যাপটপ কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলছে

লিলি মিলার। শব্দ শুনে মুখ তুলল মেয়েটা, ঝলমল করে উঠল চোখের তারা।

'হাই, টিফানি!'

খসখসে, শিশুতোষ গলা। আনাড়ি কোনও মেয়ে সপ্তাহখানেক ধরে ক্রমাগত সঙ্গীতসাধনা করলে যেমনটা হয়। বাস্তবে অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি। সত্যি বলতে কী, গান শেখার জন্যে যতটা বড় হতে হবে লিলিকে, ততদিন সে বাঁচবে কি না, তারই ঠিক নেই। চিন্তাটা তাড়াতাড়ি মাথা থেকে দূর করল টিফানি। এগিয়ে গেল বিছানার দিকে, ঝুঁকে চুমো খেল মেয়েটার কপালে। গোলাপি রঙের একটা মাঙ্কি ক্যাপ পরে আছে লিলি, চুলহীন মাথা গরম রাখার জন্যে।

'আজ কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল টিফানি।

জোর করে একটু হাসল লিলি। বলল, 'আগের মতই।'

মনে হলো ওকে খুশি করার জন্যে বলল কথাটা। মেয়েটার কণ্ঠ আর চেহারায় মিশে আছে অব্যক্ত বেদনা। পাল্টা হাসল টিফানি। বলল, 'আগের চেয়ে খারাপ নেই, এটাও কিন্তু কম না। কী বলো?'

মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর একবার বলেছিলেন, রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ হওয়া ঠিক নয়, ওটা নার্সদের কাজ। ইন্টার্নির সময় টিফানির সুপারভাইজারও একই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গত সাত বছরের ডাক্তারি জীবনে একবারও সে-উপদেশ মানেনি ও।

ভিডিও গেম নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লিলি। গেমের নামটা মনে নেই টিফানির, তবে কীভাবে খেলতে হয়, তা জানে। থ্রি-ডি গেম... ওতে রয়েছে ঘাস, মাটি, বালি আর পাথরের অসংখ্য কিউব। খেলোয়াড়কে সেসব কিউব সাজিয়ে নির্দিষ্ট কোনও বস্তু বা স্থাপনা তৈরি করতে হয়। ক'দিন থেকে কিউব সাজিয়ে মিশরের গিযা মালভূমির একটা মডেল বানাচ্ছে লিলি। চেষ্টা করছে তিনটা বড় পিরামিড আর

স্ফিংক্সের প্রতিকৃতি তৈরি করতে। কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। একদিক থেকে ভাল—সময় কাটছে ওর, ব্যস্তও থাকছে।

'নিল ডি'গ্রাসি টাইসনের একটা নতুন ভিডিও পেয়েছি ইউটিউবে,' স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়ে বলল লিলি। 'বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা-র ওপর একটা বক্তৃতা। ওটার পুরোটাই নাকি বরফে মোড়া, আবার বরফের নিচে বইছে তরল পানি। সেখানে প্রাণ থাকতে পারে।'

হাসপাতালে আসার আগে থেকেই অ্যাস্ট্রোনমির প্রতি ঝোঁক মেয়েটার, সিক্সথ গ্রেডে পড়ুয়া একটা বাচ্চার জন্যে সেটা বেশ অস্বাভাবিকই বলা চলে। ইণ্টারনেটে নিজের একটা ব্লগ খুলেছে সে, ওখানে রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক নানা ধরনের তথ্য। নিউ ইয়র্কের হেইডেন প্ল্যানেটেরিয়ামে বেড়াতে গিয়েছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে—সেখানকার ছবি রয়েছে। রয়েছে অ্যারিজোনার কিট পিক অবজারভেটরিতে বেড়ানোর ছবি। বাড়ির ছাতে শুয়ে রাতের আকাশের তারা দেখতে পছন্দ করত ও, হাসপাতালে সে-সুযোগ নেই বলে মাঝে মাঝেই হতাশা প্রকাশ করে।

মৃদু শব্দ হলো টিফানির সেলফোনে—এসএমএসের সঙ্কেত। ফোন তুলে চেক করল মেসেজটা। ক্যারেনের মেসেজ।

'ল্যাব থেকে লিলির নতুন ডেটা পাঠিয়েছে। আমরা যা আশা করেছিলাম, তার সঙ্গে মিল নেই।'

চেহারায় দুশ্চিন্তা ফুটতে দিল না টিফানি, নির্বিকার রইল। লিলিকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে সোজা হতেই চোখাচোখি হলো মেয়েটার সঙ্গে—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অজান্তেই কেঁপে উঠল টিফানি। মনের কথা পড়ার ক্ষমতা নেই লিলির, তারপরেও ওর তাকানোর ভঙ্গিটা মনে করিয়ে দিয়েছে একটা পুরনো স্মৃতি।

‘কী হলো?’ উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল লিলি।

‘কিছু না,’ সংবিৎ ফিরে পেল টিফানি। ‘অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।’

হাসল লিলি। ‘ডাক্তারদের অন্যমনস্ক হয়ে পড়া ঠিক না। তোমাদের অনেক দায়িত্ব।’

‘সেজন্যেই তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘোরাফেরা করে।’

লিলির কপালে আরেকবার চুমো খেল টিফানি। তারপর বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

দু'মিনিটের মাথায় নিজের অফিসে পৌঁছুল ও। কম্পিউটার অন করে ল্যাব থেকে পাঠানো রিপোর্টে চোখ বোলাল। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। ওপাশে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে টেক্সাসের বিস্তীর্ণ সমভূমি। জানালার কাঁচে মাথা ঠেকাল ও। নিচে, দেহরক্ষীদের একজনকে পোর্চের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দু'পাশের রাস্তার ওপর সতর্ক নজর বোলাল, এরপর আবার ফিরে গেল পোর্চের তলায়। নিয়মিত টহল দিয়ে চলেছে সে ও তার সঙ্গী।

চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল টিফানি। চোখ মুদল। নৈঃশব্দ্য যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে আনছে সমস্ত পুরনো স্মৃতি। আজকাল এ-ই ঘটছে—সামান্যতম ফুরসৎ পেলেই ফিরে আসছে স্মৃতিগুলো। ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কোথায় ভুল করেছিল... কোথায় সঠিক চাল দিলে সব এড়িয়ে যেতে পারত।

চোখের পাতাদুটো শক্ত করল ও। চাপ পড়ল মণিতে। দেখা দিল লাল-নীল ফুটকি। মনোযোগ ফেরানোর একটা পুরনো কৌশল। তাড়াতে চায় অনুশোচনা নামের দানবটাকে, যেটা সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে ওকে... যখন-তখন বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খামচে ধরছে হৃৎপিণ্ড।

'অ্যালি!' চেতনায় অনুরণন তোলা নামটা ফিসফিসিয়ে উঠল টিফানি। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

তেরো

সন্ধ্যা নেমেছে অরণ্যে, বদলে গেছে শব্দমালা। দিনভর চলতে থাকা পাখির কলকাকলি থেমে গিয়ে এখন বাজতে শুরু করেছে শত-সহস্র কীটপতঙ্গের কলতান। কেবিনের বারান্দায় বসে আছে রানা, অলস চোখে দেখছে অন্ধকারের নেমে আসা। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে ঘুমন্ত অ্যালির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ও যদি ঘুমের মাঝে কথা বলতে শুরু করে, চট করে ভেতরে ঢুকে অডিয়ো রেকর্ডার চালু করে দেবে রানা।

কেবিনটা সাদামাটা—ফিশ অ্যাণ্ড গেম ডিপার্টমেন্টের একটা পুরনো আউটপোস্ট। ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড ওঅর্কারদের রাত্রিযাপনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে, বছরে দু'তিনবারের বেশি ব্যবহার হয় না। বাকি সময় খোলাই থাকে, যাতে ঠেকায়-বেঠেকায় অরণ্যচারী হাইকাররা আশ্রয় নিতে পারে। ভেতরে মূল্যবান কিছু নেই। এরকম প্রচুর কেবিনের দেখা পাওয়া যাবে আমেরিকার বিভিন্ন অরণ্যে। বারান্দার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে রানা, অপেক্ষা করছে, দেখবে অ্যালির অবচেতন মন থেকে স্বপ্নের ঘোরে কিছু বেরিয়ে আসে কি না।

অ্যালি ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রথম ঘণ্টাটা কেটেছে ওর

স্লিপিং ব্যাগের পাশে বসে থেকে। অত দ্রুত কিছু জানা যাবার সম্ভাবনা ছিল না, রানাকে পাশে থাকতে হয়েছে ওর দিকে খেয়াল রাখার জন্যে। যে-ড্রাগটা ওর ওপর এতদিন ব্যবহার করেছে ইন্টারোগেটররা, সেটার প্রভাব এখনও রয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ঘুমের সময় এক ধরনের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয় মানবশরীর—সব পেশি তাদের কর্মক্ষমতা হারায়। কিন্তু ওষুধের সাহায্যে বাধা দেয়া হচ্ছিল অ্যালির সেই পক্ষাঘাতে, যাতে ওর পেশিগুলো অবচেতন মনের নির্দেশে নড়াচড়া করতে পারে—বিশেষ করে মুখের পেশি। হাত-পা বেঁধে রাখা হতো, যাতে ঘুমের ভেতর চলাফেরা করতে না পারে মেয়েটা, কিন্তু মুখটা মুক্ত থাকত কথা বলার জন্যে। স্লিপ ইন্টারোগেশনের মূলমন্ত্র এটাই—সাবজেক্টকে ঘুম পাড়াও, এবং ড্রাগের সাহায্যে ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বলতে বাধ্য করো।

অ্যালির শরীরে এখনও রয়ে গেছে সেই ড্রাগের রেশ। কাজেই হাত-পা বাঁধা না থাকায় ঘুমন্ত অবস্থায় নড়ে উঠতে পারে ও, হাঁটাচলা করতে পারে... আঘাত পেতে পারে। তাই প্রথম ঘণ্টাটা পাশে থাকতে হয়েছে রানাকে। এরপর চলে এসেছে বারান্দায়। কান খাড়া করে অপেক্ষায় রয়েছে, কখন ঘুমের ভেতর কথা বলতে শুরু করে অ্যালি। হয়তো ওর অবচেতন মন থেকে দরকারি কোনও তথ্য পাওয়া যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ছোটখাট শরীরের প্রায় পুরোটাই ঢুকে গেছে স্লিপিং ব্যাগে, বেরিয়ে আছে শুধু মুখটা। চোখ বন্ধ—অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অসংখ্য প্রশ্ন জমা হয়েছে রানার মনে। কে ও? এল্ সেডেরোর ওই বন্দিশালায় আসার আগে কোথায় ছিল? পরিবার আছে ওর? বাবা, মা, ভাই বা বোন? কোনও আত্মীয়?

রানার মাথা থেকে প্রশ্নগুলো পড়ে নিয়েছে অ্যালি। ঘুমুবার আগে বলেছে, 'কী করতে চাইছ, জানি। ঘুমের

ভেতর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই? আগেই বলে দিচ্ছি, পরিবার বা অতীত নিয়ে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরো না। বড় জোর একটা বা দুটো প্রশ্নের জবাব দিতে পারব আমি। তাই এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যা জানা যায়, তা-ই জানার চেষ্টা কোরো। আমার পরিচয় সপ্তাহখানেক পরে জানলেও চলবে। তখন তো আপনাআপনিই সব স্মৃতি মনে পড়বে আমার, তাই না?'

কথাগুলো যখন বলছিল, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত মনে হচ্ছিল অ্যালিকে। কিন্তু এখন... ঘুমন্ত অবস্থায় স্বাভাবিক এক কিশোরীর মত লাগছে ওকে—নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ। ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত এ-বয়েসী একটি মেয়ের। বেচারি যেন পুরো রাতটা এভাবেই ঘুমুতে পারে, মনে মনে চাইছে রানা।

কেবিন থেকে শ'খানেক গজ দূরে একটা পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ। ডানা ঝাপটে উড়ে গেল এক গাছ থেকে আরেক গাছে। ঝট্ করে ওদিকে তাকাল রানা। টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। শত্রুরা ওদের খোঁজ পেয়ে গেছে? তেমন কোনও সম্ভাবনা অবশ্য নেই। এই জঙ্গলে বহুদিন আগে হাইকিং করেছে ও, নিতান্তই শখের বশে, কোনও কাজের খাতিরে নয়। কাজেই সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্কের সঙ্গে রানার কোনও কানেকশন নেই কোনও ফাইলে। বিশেষ করে ও যে একটা নামহীন নির্জন কেবিনে, পরিচিত সমস্ত ট্রেইল থেকে অন্তত এক মাইল দূরে আশ্রয় নিতে পারে, তা জানার উপায় নেই কারও।

তাই বলে স্বস্তি পেল না ও। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল গাছপালার দিকে।

একটা ঝোপ নড়ে উঠল—বাতাসে নয়, বাতাস হলে আশপাশে সব ঝোপঝাড় আর গাছের পাতা নড়ত। রানার সিগ-সাওয়ার পিস্তলটা গোঁজা রয়েছে কোমরে; হাত চলে

গেল বাটে, মুহূর্তের নোটিশে বের করে আনতে প্রস্তুত। বোঝার চেষ্টা করছে, ঝোপের আড়ালে কে লুকিয়ে আছে।

আবারও নড়ে উঠল ঝোপ, কয়েক সেকেণ্ড পর ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল। কুঁৎকুতে চোখ মেলে রানাকে দেখল, এরপর ছুটে পালিয়ে গেল আরেকদিকে।

শরীর শিথিল করল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল কেবিনের ভেতরে। চিৎ হয়েছে অ্যালি। নিয়মিত লয়ে ওঠানামা করছে বুক। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর সোজা হলো ফের। ধীর লয়ে কেটে চলল সময়।

কয়েক ঘণ্টা পর... রাত যখন জেঁকে বসেছে অরণ্যে, নিচু মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে চাঁদ, অপার্থিব আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে বিশ্ব-চরাচর... তখুনি ফিসফিসিয়ে উঠল অ্যালি। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা, পা টিপে প্রবেশ করল কেবিনে, যাতে মেয়েটার ঘুম না ভাঙে। পকেট থেকে অডিয়ো রেকর্ডার বের করে রেকর্ড বাটন চাপল ও, যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল অ্যালির মাথার পাশে।

মিনিটখানেক দুর্বোধ্য কিছু শব্দ করল মেয়েটা, আদৌ অর্থবহ কিছু বলছে কি না বোঝা গেল না। এরপর নড়ে উঠল ওর ডান হাত। তাড়াতাড়ি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। যদি মনে হয় নিজেকে আহত করতে চলেছে, বাধা দেবে।

আবারও নড়ল হাত। প্রথমে ডান, এরপর বাম। ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে শরীরের দু'দিকে। কিন্তু ইঞ্চিদুয়েক গিয়েই থেমে গেল, যেন অদৃশ্য কোনও স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দু'কবজি। উঠে বসতে চাইল অ্যালি। কিন্তু মেঝে থেকে খানিকটা উঠেই থমকে গেল ঊর্ধ্বাঙ্গ। আবার নেমে গেল নিচে।

কী ঘটছে বুঝতে পেরে শিউরে উঠল রানা। টানা দু'মাস

বন্দি অবস্থায় ঘুমিয়েছে মেয়েটা, ওর শরীর সেই বাঁধনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। আজ মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাই হাত বা শরীর বন্দিদশার চেয়ে বেশি নড়ছে না।

ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্যে বিড়বিড়ানি থামল অ্যালির। এরপর পরিষ্কার গলায় ও বলে উঠল, 'জানালা দিয়ে রাতের দৃশ্যটা খুব চমৎকার লাগছে।'

চোখ খোলেনি মেয়েটা। কেবিনে কোনও জানালাও নেই। রানা বুঝল, স্বপ্নে কোনও দৃশ্য দেখে কথাটা বলেছে ও।

'কত্তো আলো বাইরে!' ফিসফিসাল অ্যালি। 'দেখে মনে হচ্ছে...' গলার স্বরটা নিচু হয়ে গেল বাক্যটা শেষ হবার আগেই।

হাঁটু মুড়ে ওর পাশে বসল রানা। এই-ই সুযোগ। দেখা যাক, কিছু জানতে পারে কি না। গলার স্বর নরম করে ও ডাকল, 'হ্যালো, অ্যালি?'

ঘুমের ভেতরেই যেন চমকে উঠল মেয়েটা। তিরতির করে কেঁপে উঠল পাতা। ফুটে উঠল উদ্বেগ, কয়েক সেকেণ্ড আগেও চেহারায় যা ছিল না।

'হ্যালো,' প্রত্যুত্তর দিল সে। আবেগহীন, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

আস্তে আস্তে শ্বাস ফেলল অ্যালি। যখন মুখ খুলল, মনে হলো একটা চিরকুট পড়ছে।

'অ্যালিসন মিচেল। মলিকিউলার বায়োলজি ওয়ার্কিং গ্রুপ, ফোর্ট ডেট্রিক, মেরিল্যাণ্ড। আর.এন.এ. ইণ্টারফ্যারেন্স কোহর্ট, নকআউট ওয়ান ওয়ান।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। মিলিটারি কায়দায় নিজের পরিচয় দিচ্ছে মেয়েটা। সম্ভবত এভাবেই যে-কোনও ইণ্টারোগেশনের শুরুতে ওকে জবাব দিতে শেখানো হয়েছে। পুরো নামটা

জানা গেল এতে। জানা গেল মেরিল্যাণ্ডের ফোর্ট ডেট্রিকের সঙ্গে ওর কানেকশনের কথা। শুরুটা মন্দ নয়।

'আমার গলা চিনতে পারছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মনে হলো ভাবতে শুরু করেছে অ্যালি। বন্ধ অবস্থাতেই কুঁচকে গেল চোখের পাতা। কয়েক মুহূর্ত পর যন্ত্রের মত আবারও পুনরাবৃত্তি করল আগের কথাগুলো।

'অ্যালিসন মিচেল। মলিকিউলার বায়োলজি ওয়ার্কিং গ্রুপ, ফোর্ট ডেট্রিক, মেরিল্যাণ্ড...'

এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ, ভাবল রানা। পরিচয়টাকে বর্মের মত সামনে ধরে প্রশ্নবাণ এড়াতে চাইছে মেয়েটা। কারণ অবচেতন মনে এখনও নিজেকে এল্ সেডেরোর সেই বন্দিশালায় আটক বলে ভাবছে ও। শরীর নড়াতে পারছে না। ভাবছে, ঘুমের ভেতর আবারও ওকে ইন্টারোগেট করতে এসেছে রহস্যময় লোকগুলো।

ঠোঁট কামড়াল রানা। ভাল ঝামেলায় পড়া গেল। কীভাবে অ্যালিকে বোঝাবে, ও সেই লোকগুলোর একজন নয়? না জাগিয়ে কীভাবে ওকে ব্যাখ্যা করবে ব্যাপারটা?

ঘুমন্ত অবস্থাতেই রানার দিকে সামান্য ঘুরল অ্যালির মাথা। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে জাগাবে?'

চমকে উঠল রানা। এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল—ওর মন পড়তে পারে মেয়েটা। ঘুমন্ত অবস্থাতেও! স্বপ্নের ভেতর থেকেও!

'কীসের স্বপ্ন?' আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল অ্যালি।

প্রমাদ গুনল রানা। এভাবে চলতে থাকলে সব ভেস্তে যাবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে ওকে সচেতন হতে দেয়া যাবে না কিছুতেই। জোর করে মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করল, এরপর কঠিন গলায় বলল, 'যে-ব্যাপারটা নিয়ে সবাই আতঙ্কিত... সেটা আবার বলো। এক্ষুণি।'

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, বন্ধ চোখের পাতা ভেদ

করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালি। ও জিজ্ঞেস করল, 'আবার শুনতে চাইছ কেন? আমি তো যা বলার বলেই দিয়েছি।'

'পাল্টা প্রশ্ন শুনতে চাইনি,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'যা শুনতে চেয়েছি, তা শোনাও। কী ওটা?'

'কী ওটা? আমি তো এমনকী কোথায় ওটা, তাও বলে দিয়েছি। জানার খুব যদি ইচ্ছে হয় তো গিয়ে দেখে এসো। ওটার কাছে হেঁটে যেতে পারবে অনায়াসে। কেউ বাধা দেবে না।'

রানা পরের প্রশ্নটা করার আগেই কেবিনের আরেক পাশের দেয়ালের দিকে ঘুরে গেল অ্যালির মুখ।

'পাশের কামরায় কে?' জানতে চাইল সে।

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। কেবিনের একটাই কামরা। অ্যালি নিশ্চয়ই স্বপ্নে কিছু দেখছে। সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই, যে-কোনও মুহূর্তে ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

'বেশ,' বলল রানা। 'তা হলে ঠিকানা বলো। কোথায় গেলে দেখতে পাব ওটা?'

দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরাল না অ্যালি। জবাব দিল না।

'সময় নষ্ট কোরো না, অ্যালি। বলো!'

বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। নিচু গলায় বলল, 'এলিয়াস ড্রাই লেক। ইউটাহ্-তে।' মুখ সোজা করল ও। 'ওখানে গেলেই দেখবে। মিস করার কোনও সুযোগ নেই।'

'পরিষ্কার করো কথাটা,' রানা বলল। 'কী আছে ওখানে?'

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটল অ্যালির ঠোঁটের কোণে। তবে আনন্দিত নয়, ভয়ার্ত দেখাল তাকে। ফিসফিস করে বলল, 'এখন আর আমাকে ভয় দেখিয়ে কী লাভ? আমি

জানি, আমাকে নিয়ে কী করতে চলেছে মি. লিয়ারি। তোমরাও জানো।’

শরীর কাঁপতে শুরু করেছে ওর। কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল রানা। এখনও শেষ হয়নি প্রশ্নোত্তর।

‘লিয়ারির নিশ্চয়ই মাথা খারাপের দশা, তাই না?’ বলল অ্যালি। ‘আমার মত একজনকে হাতে পেয়েও রাখতে পারছে না সে। অন্য কেউ নতুন একটা খেলনা তৈরি করেছে, আর এদিকে আমাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে লিয়ারিকে, কারণ...’ হেসে উঠল ও। সে-হাসি শুনে শিউরে উঠল রানা। এমন হাসি এই প্রথম শুনছে না ও। হতাশায় ডুবে যাওয়া বন্দির হাসি... অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নেয়া মানুষের হাসি!

‘...কারণ,’ বলে চলেছে অ্যালি, ‘যে-কোনও মুহূর্তে নতুন খেলনাটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হবে, মাঠে নামানো হবে ওটাকে। আর তখন যদি আমি বেঁচে থাকি, সব গোলমাল হয়ে যেতে পারে...’

হঠাৎ থেমে গেল ও। চেহারায় ফুটে উঠল বিভ্রান্তি। রানার মনে হলো, এখুনি চোখ মেলবে মেয়েটা। কিন্তু খুলল না। তার বদলে জিজ্ঞেস করল, ‘কে তুমি? রানা?’

‘হ্যাঁ, আমি রানা,’ নরম গলায় জবাব দিল রানা।

‘তোমার সঙ্গে কে? পাশের কামরার মানুষটা কে?’

‘পাশে কোনও কামরা নেই, অ্যালি।’

কী যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল অ্যালি। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। ‘আমি কি স্বপ্ন দেখছি?’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করল রানা। আর অভিনয় করে লাভ নেই। সচেতন হয়ে উঠেছে মেয়েটা। ‘স্বপ্নই দেখছ। স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে, পাশের কামরায় অন্য কেউ রয়েছে।’

মাথা নাড়ল অ্যালি। ‘না। আমি আরেকজন মানুষের চিন্তা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সেটা স্বপ্নের ভেতরে নয়। তোমার

সঙ্গেই আছে ও। আছে দেয়ালের ওপাশে!’

চোদ্দ

চমকে উঠল রানা। পরমুহূর্তে কেবিনের বাইরে শোনা গেল ছুটন্ত পদশব্দ, দেয়াল ঘেঁষে সামনের দিকে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে অ্যালির কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে লোকটা।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। হাতে চলে এসেছে বিশ্বস্ত সিগ-সাওয়ার। তাক করল খোলা দরজার দিকে। এক মুহূর্ত পরেই দোরগোড়ায় উদয় হলো প্রতিপক্ষ। বিশালদেহী একজন মানুষ, আবছা আলোয় দেহের কাঠামো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে হাতে ধরা শটগানটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। গুলি করতে চলেছে সে।

নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল রানা—পর পর দু'বার। কান ফাটানো আওয়াজ হলো বদ্ধ কেবিনের ভেতরে। বুকের ওপর যেন হাতুড়ির বাড়ি খেল লোকটা। ছিটকে গেল পেছনদিকে। হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল বারান্দা থেকে।

অ্যালির চিৎকার শোনা গেল। ঘুম ভেঙে গেছে ওর, লাফ দিয়ে উঠে বসেছে। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। বলল, ‘শান্ত হও। ভয়ের কিছু নেই।’

চিৎকার থামাল অ্যালি। কিন্তু কাঁপছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত। ওকে ওভাবেই থাকার ইশারা করে পায়ে পায়ে কেবিন থেকে বেরুল রানা। কে এই লোক, জানা দরকার। পিস্তল ধরে রেখেছে সামনে, প্রয়োজনে আবার গুলি করবে।

বারান্দার সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিশালদেহী লোকটা, বুক ভিজে গেছে রক্তে। হাত থেকে পড়ে গেছে শটগান। লাথি দিয়ে অস্ত্রটা দূরে পাঠিয়ে দিল রানা। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল লোকটার পাশে।

'কে তুমি?' জানতে চাইল ও।

কেশে উঠল লোকটা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। গাল দিয়ে উঠল, 'জাহান্নামে যাও!'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এখনও দেরি হয়নি, হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেঁচে যাবে তুমি।'

কথাটা মিথ্যে, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী লোকটা যেন আশান্বিত হয়ে উঠল। বলল, 'কী জানতে চাও?'

'তোমার পরিচয়।'

'সেটা তোমার কোনও কাজে আসবে না, মিস্টার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা। 'শুধু এটুকু জেনো, আমাকে স্কাউট হিসেবে পাঠানো হয়েছে তোমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে।'

'কী করে জানলে, আমাদেরকে এখানে খুঁজতে হবে?'

'ট্রেইলের মাথায় তোমাদের গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে একজন হাইকার। পুলিশকে জানিয়েছে সে। আর আমরা জেনেছি পুলিশের কাছ থেকে।'

'হাইকার?' ভ্রূকুটি করল রানা। 'সে কেন রিপোর্ট করতে যাবে?'

'দুনিয়ার সবাই তোমাকে খুঁজছে, মিস্টার,' ক্ষীণ হাসল লোকটা। 'টিভিতে সারাক্ষণ দেখানো হচ্ছে তোমাকে।'

'কীসের জন্যে?'

জবাব দিল না লোকটা। আবার কাশছে সে, থামছে না। খানিক পর নিথর হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা। উল্টো ঘুরতেই কেবিনের দরজায় দেখতে পেল অ্যালিকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে

নিহত মানুষটার দিকে।

'ও কি...' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ও।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'তৈরি হয়ে নাও। এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। এক্ষুণি!'

কেবিনে ঢুকে জুতো পরতে শুরু করল অ্যালি। আর তখুনি দূর থেকে ভেসে এল চাপা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ। হেলিকপ্টার আসছে! ড্রামবিটের মত বাজছে তার রোটর! আকাশে চোখ বোলাল রানা। চারদিকের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠছে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কোন্‌দিক বা কতদূর থেকে আসছে আওয়াজ, তবে বেশ কাছ থেকে আসছে, তাতে সন্দেহ নেই।

দৌড়ে কেবিনে ঢুকল ও। অ্যালিকে তাড়া দিল, 'হারি আপ! ওরা এসে পড়েছে!'

জিনিসপত্র গোছানোর সময় নেই, এক কোণে রাখা ডাফল ব্যাগটা শুধু তুলে নিল রানা, ওটার ভেতরে রয়েছে ভিসালিয়া থেকে কেনা স্পেশাল আইটেমদুটো।

জুতো পরা শেষ হয়েছে অ্যালির। উঠে দাঁড়াল ও। ডাফল ব্যাগটার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো বের করবে না?'

'এখুনি না,' দরজার কাছে গেল রানা। বাইরে বেড়ে গেছে আওয়াজ, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। তবে এখনও দৃষ্টিসীমায় উদয় হয়নি হেলিকপ্টার।

অ্যালিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ও। কেবিন থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করল দু'জনে।

রাগে লাল হয়ে আছে লিয়ারির চেহারা। একটা চেয়ারের ব্যাকরেস্ট ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাবভাবে মনে হচ্ছে এখুনি চেয়ারটা তুলে ছুঁড়ে মারবে স্ক্রিনের দিকে। শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু অবশ্য করল না, তাই বলে চেহারা থেকে হিংস্র

ভাব দূর হলো একটুও।

রানা আর অ্যালির খোঁজ পাওয়া যেতেই কম্পিউটার রুমে চলে এসেছে সে। হুপারকে দিয়ে মিরাণ্ডা স্যাটেলাইট সেট করেছে সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্কের ওপর। স্ক্রিনে পরিষ্কার ফুটে উঠছে সব খুঁটিনাটি। এ-মুহূর্তে চিৎ হয়ে থাকা স্কাউটের ওপর আটকে আছে লিয়ারির দৃষ্টি, দেহের তাপমাত্রা কমে আসছে তার। জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে অন্য দুটো বিন্দু।

'ওই গাধার বাচ্চাটাকে কে পাঠিয়েছিল ওখানে?' অবশেষে মুখ খুলল লিয়ারি।

'সরি, স্যর,' কি-বোর্ড থেকে মুখ তুলল হুপার। 'ওদিকে ও ছাড়া আমাদের আর কোনও অপারেটর ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ওকেই পাঠাতে হয়েছে স্কাউটিঙের জন্যে। তবে পই পই করে বলে দিয়েছিলাম, টার্গেটকে যেন কিছুতেই এনগেজ না করে। দূর থেকে জায়গাটা দেখে নিয়ে আমাদেরকে রিপোর্ট করলেই চলবে।'

'তা হলে হিরো সাজতে গেল কেন? ওর কারণে আমরা এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইজ হারালাম।'

'তাতে তেমন কোনও অসুবিধে নেই,' হুপার আশ্বস্ত করল। 'হেলিকপ্টারের আওয়াজে রানা এমনিতেও সতর্ক হয়ে যেত। আমাদের প্ল্যান তো সারপ্রাইজের ওপর নির্ভরশীল নয়।'

তা অবশ্য ঠিক, মনে মনে ভাবল লিয়ারি। কায়দামত পাওয়া গেছে রানাকে। গা ঢাকা দেবার জন্যে ভুল জায়গা বেছেছে সে। কেবিনের চারপাশের বিশ মাইলে রাস্তা আছে মাত্র সাতটা। সবগুলোই ব্লক করে দেয়া হয়েছে লোকাল পুলিশ এবং ফেডারেল অথরিটির সাহায্যে। তা ছাড়া রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারবে না রানা। দশজন স্পেশালিস্ট পাঠিয়েছে লিয়ারি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে করে—এরা সিসকোর টিমের রিপ্লেসমেন্ট। কপ্টারের পাইলটকে বলে

দেয়া হয়েছে, রানার কাছাকাছি যেন না যায়। সারাটা দিন ওদের নজরের বাইরে ছিল বাঙালি এজেন্ট, এর ভেতরে কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছে কে জানে। ওর মত একটা লোকের জন্যে আকাশ থেকে একটা হেলিকপ্টার ফেলে দেয়া কঠিন কাজ নয়। কাজেই দূরে দূরে থাকতে বলা হয়েছে পাইলটকে। তার কাজ, কেবিন থেকে এক মাইল দূরত্বে একটা কাল্পনিক বৃত্তের বিভিন্ন পয়েন্টে দশ স্পেশালিস্টকে নামিয়ে দেয়া। এরা সবাই জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারে অভিজ্ঞ—চারপাশ থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবে। বাঁচার কোনও উপায় নেই রানার।

কাছে চলে এসেছে হেলিকপ্টার... পূর্ব আর পশ্চিমে যে পাহাড়দুটোয় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে রোটরের আওয়াজ, তার চেয়েও কাছে। এবার ওটার অবস্থান বুঝতে পারছে রানা। দক্ষিণে, মাইলখানেক দূরে রয়েছে ওটা। অগ্রসর না হয়ে হোভার করছে। তবে সব লাইট নিভিয়ে রেখেছে বলে দেখা যাচ্ছে না।

ঘাবড়াল না রানা। গত রাতের সঙ্গে বড় একটা পার্থক্য রয়েছে আজ রাতে। পরিস্থিতি নিয়ে ভাববার জন্যে আজ সারাদিন সময় পেয়েছে ও। কেবিনে ওঠার সময়েই জানত, ওটার সবচেয়ে বড় সুবিধেটাই আরেক অর্থে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। গা ঢাকা দেবার জন্যে নির্জন অরণ্য যতটা আদর্শ, বিপদ দেখা দিলে সেখান থেকে পালানো ততটাই কঠিন। বিশেষ করে আল্ট্রা-মডার্ন স্যাটেলাইটের সঙ্গে ইঁদুর-বেড়াল খেলায় নির্জনতার চেয়ে বড় দুর্বলতা আর নেই।

মুচকি হাসল রানা। সন্দেহ নেই, লিয়ারিও তা-ই ভাবছে। আক্রমণের ছক সাজাবার সময় রানার দক্ষতা ও ব্যাকগ্রাউণ্ডকেও নিশ্চয়ই মাথায় রেখেছে সে। নির্দিষ্ট দূরত্বে হেলিকপ্টারটার থেমে যাওয়া সেটাই প্রমাণ করে। মাথার

ওপরে এসে হামলা চালানোর বদলে দূরে থাকছে ওটা, কারণ একটা পয়েন্ট ফিফটি ক্যালিবারের হেভি মেশিনগান দিয়ে অনায়াসে ওটাকে ফেলে দিতে পারবে রানা। অমন একটা অস্ত্র জোগাড় করার কথাও ভেবেছিল ও, শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার কথা ভেবে মত পাল্টেছে। এই সিনারিয়োতে হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করিয়ে খুব একটা লাভ হবে না।

দৌড়াতে দৌড়াতে রোটরের আওয়াজ বদলে যেতে শুনল রানা। আবারও চলতে শুরু করেছে কপ্টার। তবে ওদের দিকে এগিয়ে এল না, দূরেও গেল না। বরং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী একটা বৃত্তাকার পথ ধরেছে। কয়েকশ' গজ গিয়ে ফের হোভার করার জন্যে থামল। কী ঘটছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার—গ্রাউণ্ড টিমের সদস্যদের নামানো হচ্ছে একে একে। ওরাই লিয়ারির মূল অস্ত্র।

এ-ব্যাপারটাও প্রত্যাশিত। এক অর্থে, প্রতিপক্ষের এই কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই নিজের প্ল্যান সাজিয়েছে রানা। দ্বিতীয়জনকে নামিয়ে আবার চলতে শুরু করল কপ্টার, তৃতীয় পয়েণ্টে চলেছে। মানসচোখে ম্যাটিতে নেমে আসা সৈনিকদের দেখতে পেল ও—অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে আসছে দুই শিকারের অবস্থান লক্ষ্য করে, কানে হেডসেট, তাতে ওদেরকে আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে স্যাটেলাইট অপারেটররা।

'এবার বোধহয় তোমার ডাফল ব্যাগটা খোলার সময় হয়েছে,' বলে উঠল অ্যালি।

'ঠিক বলেছ,' ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা।

স্ক্রিনে সেঁটে আছে লিয়ারির চোখ—র‍্যাপলিং করে গ্রাউণ্ড টিমের তৃতীয় সদস্য নামছে জঙ্গলে। হিট সিগনেচার পরিষ্কার নয়, আকাশে ভেসে থাকা হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের উত্তাপের কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে লোকটার সিগনেচার।

'হোয়াট দ্য হেল!' হঠাৎ বলে উঠল হুপার।

তার দিকে ঘাড় ফেরাল লিয়ারি। কম্পিউটারের মনিটরে টোকা দিচ্ছে হুপার, যেন কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে ওটায়।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল লিয়ারি।

'রানা আর মেয়েটা...' বলল হুপার, 'আচমকা গায়েব হয়ে গেছে।' হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল সে। বাটন টিপে যোগাযোগ করল গ্রাউণ্ড টিমের সঙ্গে। নির্দেশ দিল, 'যেভাবে এগোচ্ছিলে এগোও, তবে সতর্ক থেকো। ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এদিকে, টার্গেটদের দেখতে পাচ্ছি না আমরা।'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ!' ধমকে উঠল লিয়ারি। 'নিশ্চয়ই তোমার ক্যামেরার সামনে বড় কোনও রেডউড গাছ পড়েছে।'

'আমরা চারটা স্যাটেলাইট তাক করে রেখেছি ওদিকে, স্যর,' হুপার বলল। 'সবগুলোর ক্যামেরা একসঙ্গে ব্লক হতে পারে না। অন্তত এতটা সময়ের জন্যে তো নয়ই।'

পাল্টা কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না লিয়ারি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল মেইন স্ক্রিনের দিকে। চার নম্বর ড্রপের জন্যে মুভ করছে হেলিকপ্টার। যে-তিনজন ইতিমধ্যে নেমেছে মাটিতে, তারা এগোতে শুরু করেছে অদৃশ্য টার্গেটের খোঁজে। চোখ পিটপিট করল লিয়ারি। সত্যিই উধাও হয়ে গেছে রানা আর মেয়েটা। সেই সঙ্গে কর্পূরের মত উবে গেছে তার নিজের সমস্ত স্বস্তি।

ভিসালিয়ার স্পেশালিটি শপটা দমকল কর্মীদের জন্যে নানা ধরনের ফায়ার-ফাইটিং ইকুইপমেণ্ট বিক্রি করে; সেখান থেকে বিশেষ দুটো আইটেম কিনেছে রানা—একটা বড়, আরেকটা ছোট সাইজের। দমকল বাহিনীর পরিভাষায় ওগুলোকে বলে প্রক্সিমিটি স্যুট, সোজা বাংলায় অগ্নি-

প্রতিরোধক পোশাকও বলা যেতে পারে। ওজনে হালকা, অনেকগুলো স্তরবিশিষ্ট, একদম বাইরের স্তরটা অ্যালিউমিনাইযড় ফ্যাব্রিকে মোড়া—তাপ ঠেকিয়ে রাখে। দমকল কর্মীরা নিয়মিত ব্যবহার করে এ-পোশাক, যখন আগুনের ভেতর তাদের ঢুকতে হয়। পনেরোশো ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ ঠেকাতে পারে পোশাকটা, তবে রানা আর অ্যালির প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক কম—মাত্র আটানব্বুই দশমিক ছয় ডিগ্রি!

স্যুটগুলো উল্টো করে পরেছে ওরা—বাইরের স্তরটা রেখেছে ভেতরদিকে, যাতে ওদের শরীরের তাপ পোশাকের আবরণ ভেদ করে বেরুতে না পারে। স্যুটের হুডদুটো একই ফ্যাব্রিকে তৈরি বলে মাথাও ঢেকে ফেলা গেছে। রানা ধারণা করছে, এর ফলে স্যাটেলাইটের থারমাল ক্যামেরায় আর দেখা যাবে না ওদেরকে।

অসুবিধে একটাই—এই স্যুট পরে দৌড়ানো যাচ্ছে না স্বাভাবিকভাবে। তারপরেও নতুন একটা দিক ধরে যতটা দ্রুত পারে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। লক্ষ্য, পাহাড়ের কাছাকাছি একটি বিশেষ জায়গা। ম্যাপে ওটা আগেই দেখে রেখেছে রানা। ওখানে পৌঁছুবার পর শুরু হবে পলায়নের দ্বিতীয় পর্ব।

পনেরো

ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল লিয়ারি। হতাশা ছেঁকে ধরেছে তাকে। পুরো গ্রাউণ্ড টিম এখন মাটিতে। তল্লাশি চালাতে

চালাতে পৌঁছেছে যেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে রানা আর মেয়েটা, সেখানে। লিয়ারি অনুমান করেছিল, ওখানে হয়তো কোনও সুড়ঙ্গ বা মাইন শাফট রয়েছে, কিন্তু তেমন কিছুই পায়নি তার টিম। তাদের রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে, ওখানকার মাটি পাথরের মত শক্ত, কোনও পায়ের ছাপ পড়েনি, কাজেই বোঝা যাচ্ছে না কোন্‌দিকে গেছে তাদের শিকার।

'বেশ, তা হলে সিস্টেম্যাটিক্যালি এগোনো যাক,' বলল হুপার। 'যেভাবেই হোক, স্যাটেলাইটকে ফাঁকি দিয়েছে দু'জনে; তারপর দৌড়াতে শুরু করেছে। বারো মিনিট আগে উধাও হয়েছে ওরা... যদি ধরে নিই, এক মাইল পেরুতে দশ মিনিট নিচ্ছে...'

'সাত মিনিট ধরো,' বলে উঠল লিয়ারি। 'প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে ওরা।'

'ঠিক আছে, সাত মিনিট। তার মানে, ইতিমধ্যে দু'মাইলের মত এগিয়ে গেছে ওরা। তবে কোন্‌দিকে, সেটা জানা যাচ্ছে না। প্রতি তিন থেকে চার মিনিটে এক মাইল করে আমাদের সার্চ এরিয়ার ডায়ামিটার বাড়ছে...'

হুপারের বিশ্লেষণ শোনার আর প্রয়োজন বোধ করল না লিয়ারি। উঠে গিয়ে হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল। টিমকে নির্দেশ দিল, 'কপ্টারটাকে ল্যাণ্ড করাও। এক্ষুণি। সবাই আবার উঠে পড়ো ওটায়। গ্রাউণ্ডে আর কাজ নেই তোমাদের, যা করার করবে আকাশ থেকে। চাঁদের আলো যথেষ্টই আছে, কাজেই অ্যামপ্লিফায়েড নাইট ভিশন হেডসেট পরবে সবাই, ভিজুয়ালি সার্চ চালাবে পুরো বনে—পাঁচশো ফুট ওপর থেকে। ক্লিয়ার?'

ওপাশ থেকে ইতিবাচক সাড়া দিল টিম লিডার। হ্যাণ্ডসেট নামাল লিয়ারি। সোজা হতেই দেখল, বোকা বোকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হুপার।

'এরিয়াল সার্চ কোত্থেকে শুরু করব, তা জানা নেই

আমার, স্যর,' বলল সে। 'কোন্‌দিকে পাঠাব ওটাকে?'

'মাথা খাটাও,' বিরক্ত স্বরে বলল লিয়ারি। 'যে-আমলে কম্পিউটার বা স্যাটেলাইট ছিল না, সে-আমলে মাথা খাটিয়ে এসব বের করত লোকে।'

পাল্টা কিছু বলার সাহস পেল না হুপার। কম্পিউটারের দিকে ফিরে কি-বোর্ডের বাটন চাপল, স্ক্রিনে তুলে আনল মিরাণ্ডা স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া একটা ওয়াইড ইমেজ। তার ওপরে বসাল এলাকার টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ।

'ধরে নিচ্ছি, রানার মত অভিজ্ঞ একজন লোক এলাকাটার নাড়িনক্ষত্র জানে,' বলল সে।

'তাতে সন্দেহ নেই,' সায় জানাল লিয়ারি।

'সেক্ষেত্রে তার বোঝার কথা, আশপাশের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু এই দেখুন, ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে হাইওয়ে ওয়ান-নাইন্টি-এইট। অতদূর পর্যন্ত আমরা রোডব্লক দিইনি, এমনটা ভাবতেই পারে। কাজেই ওর জন্যে ওখানে পৌঁছুবার চেষ্টা করাটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া রাস্তাটায় প্রচুর গাড়ি চলে, যানবাহন জোগাড় করতে চাইলেও রাস্তাটা আদর্শ।'

'অতদূর যাবে কী করে?'

ম্যাপে একটা জলপথ আলোকিত করল হুপার। 'এই ঝরনাটা দিয়ে। উপত্যকা থেকে সোজা হাইওয়ের দিকে গেছে ওটা—পুরো ত্রিশ মাইল। স্রোতও বইছে ওদিকে। একটা নৌকা পেলে, অথবা ভেলা বানিয়ে নিতে পারলে সহজেই দূরত্বটা অতিক্রম করা সম্ভব।'

'ঝরনায় পৌঁছুবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা কোন্‌টা?'

'এই যে,' স্ক্রিনে একটা সরলরেখা আঁকল হুপার। 'যেখানে ওরা উধাও হয়ে গেছে, সেখান থেকে উত্তরদিকে আড়াই মাইল।' হাতঘড়িতে চোখ বোলাল। 'এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গেছে।'

তাড়াতাড়ি কমিউনিকেটর তুলে ব্ল্যাক হকের পাইলটের সঙ্গে কথা বলল লিয়ারি।

'কপি দ্যাট,' বলল পাইলট। 'টিম মেম্বাররা এলেই রওনা হচ্ছি।'

'এখনও আসেনি ওরা?'

'সবে ল্যাণ্ড করছি। এদিকে খোলা জায়গা নেই বললেই চলে, অনেক খুঁজে টিমের লোকেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ক্লিয়ারিং পেয়েছি। ল্যাণ্ড করছি ওখানেই। টিমকে এখানে আসতে বলেছি।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

'ইয়েস, স্যর।'

সাবধানে কপ্টারকে নিচে নামাচ্ছে পাইলট, আশপাশে বড় বড় গাছ—সাধারণ যে-কোনও গাছের চেয়ে অন্তত তিনগুণ লম্বা। পাইলটের মনে হলো, গভীর একটা ফানেলের ভেতরে কপ্টার নিয়ে নামছে সে।

মাটি থেকে বিশ ফুট উচ্চতায় পৌঁছুলে নিচটা পরিষ্কার দেখা গেল—ফার্ন আর নানা ধরনের ঝোপঝাড়ের কার্পেট যেন, অন্তত দু'ফুট পুরু। চাকা জড়িয়ে যাবার ভয় নেই, তবে টেকঅফের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আলতো করে হেলিকপ্টার নেমে এল ওগুলোর মাঝখানে।

ঘাড় ফিরিয়ে কো-পাইলটের দিকে তাকাল পাইলট। বলল, 'হিসু করতে চাইলে এখুনি নেমে করে নাও। দু'মিনিটের ভেতর আমাদের টিম পৌঁছে যাবে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে শব্দ ভেসে এল—ট্রুপ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসেছে কেউ। অবাক হলো পাইলট, এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে গ্রাউণ্ড টিম? ঘুরে ওদিকে তাকাল সে, পরক্ষণে জমে গেল আতঙ্কে।

খোলা জমিটার একপাশে, বড় একটা ঝোপের পেছনে ঘাপটি মেরেছে রানা আর অ্যালি। দশ মিনিট হলো পৌঁছেছে ওরা, অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টারের জন্যে। আশপাশে এটাই একমাত্র ল্যাণ্ড করার মত জায়গা, কাজেই রানা নিশ্চিত, গ্রাউণ্ড টিমকে তুলে নেবার জন্য এখানেই নামবে কপ্টার। সেটা ভেবেই প্ল্যান সাজিয়েছে ও। কিন্তু যত সময় গড়াচ্ছে, দুর্ভাবনা বাড়ছে ওর। নিখুঁত পরিকল্পনা বলে কিছু নেই, যে-কোনও দিক থেকেই উদয় হতে পারে অপ্রত্যাশিত বিপদ... গোলমাল হয়ে যেতে পারে সব কিছু।

তবে ওর আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে একটু পরেই মাথার ওপরে শোনা গেল রোটরের বজ্রনিনাদ, প্রায়ান্ধকার আকাশের মাঝে অতিকায় এক পতঙ্গের মত লাগছে কপ্টারটাকে। ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল ওটা। চাকাগুলো মাটি স্পর্শ করতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, ছুট লাগাল তীরবেগে। খোলা দরজা পেরিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল ট্রুপ কম্পার্টমেন্টে। বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকাল পাইলট, ততক্ষণে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ-সাওয়ার।

'যদি খুন হয়ে যেতে না চাও,' শীতল গলায় বলল রানা, 'তোমাদের সাইডআর্মস্ বের করে কনসোলের ওপর রাখো।'

কো-পাইলটও এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। কিন্তু দু'জনের কেউই হুকুমটা তামিল করল না।

এগিয়ে গিয়ে পিস্তলের ডগা দিয়ে পাইলটের নাকে বেমক্কা একটা গুঁতো মারল রানা। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। অস্ফুট আওয়াজ করল সে ব্যথায়। চেপে ধরল নাক।

'তিন পর্যন্ত গুনব,' রানা বলল। 'এক... দুই...'

নড়ে উঠল দুই পাইলট। তাড়াতাড়ি হোলস্টার থেকে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের দুটো পিস্তল বের করে

আনল, রেখে দিল সামনের কনসোলের ওপর।

অ্যালি এসে পড়েছে। রানার পেছন পেছন কপ্টারে চড়ল ও।

পাইলটদের উদ্দেশে পিস্তল নাড়ল রানা। 'বেরোও।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই পাইলট, তবে নির্দেশটা পালন করতে দেরি করল না। ত্রস্ত হাতে দু'পাশের দরজা খুলল তারা, লাফ দিয়ে নামল ঝোপঝাড়ের মাঝে। এরপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল।

পাইলটের সিটে বসল রানা। অ্যালিকে ইশারা করল কো-পাইলটের আসন নিতে। ভারী হেডসেট পরতেই রোটরের আওয়াজ কাটা পড়ল, রেহাই মিলল কানফাটানো শব্দের অত্যাচার থেকে। কনসোলের দিকে হাত বাড়াল রানা, হেডসেটের জ্যাকের পাশে রয়েছে কম-সিলেক্টর সুইচ, ওটা *ককপিট অনলি*-তে নিয়ে এল। এর অর্থ, বাইরে আর ট্রান্সমিট হবে না ওদের কথাবার্তা।

'সত্যি সত্যি তুমি ওদেরকে গুলি করতে,' বলল অ্যালি। প্রশ্ন নয়, নিছক মন্তব্যের ভঙ্গিতে। 'তিন পর্যন্ত গোনা শেষ হলে। ধোঁকা দিচ্ছিলে না।'

'সেজন্যেই হুমকিটায় কাজ হয়েছে,' রানা বলল।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর ঘুরছে ওর চোখ। স্ট্যাণ্ডার্ড ইউএইচ-৬০ ব্ল্যাক হক ওড়াবার ট্রেনিং আছে ওর, কিন্তু এটা অন্য ভার্শান—এমএইচ-৬০কে... স্পেশাল অপসের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা। প্যানেল অবশ্য প্রায় একই রকম, পার্থক্য বলতে বাড়তি কিছু সুইচ দেখা যাচ্ছে। আর আছে একটা অল-পারপাস ডিসপ্লে, সেটায় এখন একটা স্যাটেলাইট ফিড ফুটে উঠেছে। ইমেজটার দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হলো রানা, ওর দেখা যে-কোনও স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে ওটা অনেক বেশি স্পষ্ট, নিখুঁত। পর্দায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টারের থারমাল ইমেজ, খোলা জায়গা পেরিয়ে

গাছপালার আড়ালে ঢুকে পড়া দুই পাইলটকেও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। গ্রাউণ্ড টিমকে খুঁজল রানা। ওরাও আছে। ল্যাণ্ডিং জোন থেকে মোটামুটি পাঁচশো গজ দূরে, দ্রুত এগিয়ে আসছে হেলিকপ্টারে চড়বার জন্যে। এখনও পাইলটদের সঙ্গে দেখা হয়নি গ্রাউণ্ড টিমের, তাই জানে না কী ঘটেছে। তবে জানতে আর দেরিও নেই।

কন্ট্রোলে হাত রাখল রানা। পাওয়ার বাড়াতেই কম্পন বেড়ে গেল ব্ল্যাক হকের। সিটের কিনারা খামচে ধরল অ্যালি। রোটরের আর্তনাদ বেড়ে চলেছে, মাটি ছাড়ল হেলিকপ্টার, উঠে এল বনের মেঝে থেকে। এক্সটেরিয়র লাইটের সুইচ অন করল রানা। যেন জাদুকাঠির ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হলো চারদিকের সেকুইয়া গাছগুলো—গায়ে গা লাগিয়ে যেন একটা বৃত্তাকার দেয়াল তৈরি করেছে। একেকটা গাছ প্রায় দুইশো ফুট উঁচু। রানার মনে হলো একটা কুয়োর তলা থেকে ওপরদিকে উঠছে ওরা। বিপজ্জনক পরিস্থিতি, একটুও যদি ভুল করে, গাছের গায়ে বাড়ি খাবে রোটর ব্লেড, ক্র্যাশ করবে ব্ল্যাক হক।

সাবধানে ওঠা উচিত, কিন্তু সে-উপায় নেই। স্যাটেলাইট ফিডে দেখতে পাচ্ছে রানা, একেবারে কাছে চলে এসেছে গ্রাউণ্ড টিম, এক মিনিটেরও কম সময়ে ওদের তলায় বেরিয়ে আসবে তারা। সন্দেহ নেই, এরপরেই সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র আগুন ঝরাবে হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে। তার আগেই সরে যেতে হবে ওদেরকে, যত দূরে সম্ভব।

দু'দিকে মনোযোগ রাখতে হচ্ছে রানাকে—স্যাটেলাইটের ডিসপ্লে, আর গাছের সারির দিকে। ক্লাইম রেট বাড়িয়ে চলেছে... যে-রেটে অভ্যস্ত, তার চেয়েও বেশি। ভয় হচ্ছে, এই বুঝি নিয়ন্ত্রণ হারায়। উভয়সঙ্কট আর কাকে বলে! দ্রুত উঠতে গেলে ক্র্যাশ করার সম্ভাবনা, আবার ধীরে-সুস্থে উঠতে গেলে নিচ থেকে গুলি খেয়ে ভূপাতিত হতে হবে।

সামনে ঝুঁকে গাছের সারির চূড়া দেখার চেষ্টা করল রানা। এখনও প্রায় সত্তর ফুট বাকি। ডিসপ্লেতে গ্রাউণ্ড টিমের দূরত্ব পঞ্চাশ গজ দেখাচ্ছে। ইমেজটার এক কোণে একটা ডেটা ট্যাগ চোখে পড়ল ওর। • *স্যাট-আলফা-মিরাণ্ডা-টোয়েণ্টিওয়ান।* ক্ষণিকের জন্যে চিন্তায় টোকা দিল মিরাণ্ডা শব্দটা। গোপন স্যাটেলাইট প্রজেক্ট মিরাণ্ডা সম্পর্কে কানাঘুষো শুনেছে, এই প্রথম তার বাস্তব নমুনা দেখল।

পরমুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল ডিসপ্লে। ব্ল্যাক হকের কানেকশন কেটে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই।

'হুম,' পাশ থেকে বলল অ্যালি। 'ওই স্যাটেলাইট ইমেজ দেখার অধিকার নেই আমাদের।'

'শোকর করো যে, দূর থেকে আমাদের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে পারছে না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ভবিষ্যতে সে-ব্যবস্থাও থাকবে।'

গাছের চূড়া ছাড়িয়ে উঠে আসছে কপ্টার। রোটরের বাতাসে দোল খেতে থাকা ডালপালা অদৃশ্য হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ডের ওপার থেকে। আচমকা মুক্ত আকাশে উঠে এল কপ্টার। চাঁদের আলোয় অপার্থিব দেখাচ্ছে দৃশ্যটা—দূরে উঁচু-নিচু পাহাড়ের অবয়ব, সবুজ অরণ্য যেন গালিচার মত বিছিয়ে আছে তার পাদদেশে। তবে প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হবার সময় নয় এটা। কণ্ট্রোল স্টিক সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। নাক একটু নিচু করল ব্ল্যাক হক, শুরু করল এগোতে। আর তখুনি ছুটে এল গুলির প্রথম পশলা।

ঠক ঠক করে আওয়াজ ভেসে এল নিচ থেকে। ব্ল্যাক হকের আর্মার্ড আণ্ডারসাইডে মাথা কুটছে বুলেটবৃষ্টি। চেঁচিয়ে উঠল অ্যালি। একটা লাইট চুরমার হয়ে গেল, টেইল রোটরের দিক থেকে শোনা গেল বিশ্রী একটা শব্দ। শঙ্কিত চোখে প্যানেলের দিকে তাকাল রানা, কিন্তু বিপদসঙ্কেত দেখিয়ে কোনও বাতি জ্বলে উঠল না।

মনে হলো অন্তত দশ সেকেণ্ড ধরে চলছে তাণ্ডব, আসলে পেরিয়েছে মাত্র দুই সেকেণ্ড। সামনের দিকে নাক ঝুঁকিয়ে এগিয়ে চলেছে কপ্টার। খোলা জায়গাটার ওপর থেকে সরে যাবার আগমুহূর্তে গুলির আঘাতে বিস্ফোরিত হলো সামনের ডানদিকের জানালা, আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল অ্যালি। পরক্ষণে বনের ওপর দিয়ে ছুট লাগাল ব্ল্যাক হক।

নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে কেবিন লাইট জ্বালল রানা, ঘুরল অ্যালির দিকে। চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মেয়েটার, শ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। বাম হাতটা চেপে ধরে রেখেছে ডান হাত দিয়ে। হাতটা যেখানে গিয়ে মিশেছে কাঁধের সঙ্গে, সেখানটা ভিজে উঠেছে রক্তে।

ষোলো

নির্বিঘ্নে উড়ে চলেছে ব্ল্যাক হক। টেকঅফের পর পেরিয়ে গেছে দশ মিনিট। চেঁচিয়ে চলেছে ওভারস্পিড ইণ্ডিকেটর, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নেই রানার। ও তাকিয়ে আছে অ্যালির দিকে।

মেয়েটার আঘাত কতটা গুরুতর, বোঝার উপায় নেই। ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখতে পারছে না, হেলিকপ্টার ওড়ানোর জন্যে কন্ট্রোলে সবক'টা হাত-পাই রাখতে হচ্ছে রানাকে। অ্যালিও পারছে না পরনের প্রক্সিমিটি স্যুটটা খুলতে। ওপর থেকে দেখেই যতটা পারে আন্দাজ করতে চাইছে রানা। হাতে গুলি খেয়েছে অ্যালি, ট্রাইসেপের কাছে দেখা যাচ্ছে

গুলির গর্ত। হাতের নিচের দিক দিয়ে ঢুকেছে গুলি, তবে তার আগে শরীরের অন্য কোনও অংশ... পা, তলপেট বা ঊর্ধ্বাঙ্গ... ফুটো করেছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না।

'ক্ষতটা চাপ দিয়ে ধরে রাখো,' বলল রানা, 'যত কষ্টই হোক না কেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালি। ক্লান্ত ও আতঙ্কিত দেখাচ্ছে ওকে। শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

'বড় করে শ্বাস নাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'ধীরে ধীরে।'

তা-ই করল অ্যালি। হেডসেটে মনোযোগ দিয়ে শব্দটা শুনল রানা। না, কষ্ট হচ্ছে না শ্বাস নিতে। ভাল লক্ষণ।

'বুকে কোনও চাপ অনুভব করছ?' জিজ্ঞেস করল ও। 'এমন কি মনে হচ্ছে, পুরোপুরি দম টানতে পারছ না?'

মাথা নাড়ল অ্যালি।

এটাও ভাল লক্ষণ। তাই বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডে গুলি না লাগলেও ভেতরে রক্তপাত হতে পারে। আস্তে আস্তে রক্ত জমে চাপ বাড়তে থাকবে বুকের খাঁচায়... হঠাৎ করে দুটো ফুসফুসই চুপসে যাবে। আঘাতজনিত শকের কারণে প্রাথমিকভাবে অসুবিধেটা হয়তো বুঝতে পারছে না অ্যালি। সেটাই হয়।

যতটা সম্ভব নিচ দিয়ে ব্ল্যাক হককে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে রানা—মাটি থেকে দু'শো ফুট উচ্চতায়। সামনে ফ্রেজনো, মোটামুটি দশ মিনিটের দূরত্ব। শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যাবে তার চেয়েও কম সময়ে।

অ্যালির দিকে আবারও তাকাল রানা। ডান হাত দিয়ে ক্ষতের জায়গাটা খামচে ধরে আছে ও—টর্নিকেটের বিকল্প। চারপাশের স্যুট চুইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। কতটা রক্তপাত হচ্ছে ওর, বোঝার উপায় নেই। ক্ষত দিয়ে যা বেরোচ্ছে, তার সিংহভাগই স্যুটের আড়ালে ওর বাহু গড়িয়ে নামছে। এখন পর্যন্ত কোনও শব্দ করেনি মেয়েটা, তবে সেটা

সহ্যশক্তির কৃতিত্ব নয়। আসলে শকের কারণে এখনও ব্যথা অনুভব করেনি ও। তবে ব্যথাটা শুরু হতে চলেছে—অ্যালির হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে সেটা।

'আর কিছুক্ষণ সহ্য করে থাকো,' বলল ওকে রানা। জানে, এতক্ষণ যা যা ভেবেছে, সব শুনতে পেয়েছে মেয়েটা।

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। শরীর কাঁপতে শুরু করেছে ওর। ক্ষতের ওপরে শক্ত হয়ে উঠেছে মুঠি।

এয়ারস্পিড অ্যালার্ম বেজে উঠল। অন্যমনস্ক থাকায় অনেকটা নেমে গেছে হেলিকপ্টার—বিপজ্জনক উচ্চতায়। কণ্ট্রোল স্টিক টেনে ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়াতে শুরু করল রানা, যতক্ষণ না থেমে যায় অ্যালার্মের কর্কশ আওয়াজ। অ্যালার্ম থামতেই শুনতে পেল অ্যালির যন্ত্রণাকাতর গোঙানি। কান্না ঠেকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে মেয়েটা, কিন্তু পারছে না।

থমথমে চেহারা নিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে লিয়ারি। তাকে এতটা গম্ভীর হতে আগে দেখেনি কেউ।

স্যাটেলাইটগুলো সহজেই ট্র্যাক করে চলেছে কপ্টারকে। বিভিন্ন দিক থেকে তিনটাকে তাক করে রাখা হয়েছে ওটার ওপর, চতুর্থ স্যাটেলাইটটা ওয়াইড ফ্রেমে পুরো ফ্রেজনো এবং তার আশপাশের চল্লিশ মাইল এলাকা তুলে ধরেছে পর্দায়। আরও কয়েকটা উড়ন্ত আকাশযান দেখা যাচ্ছে ওতে—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সেগুলো।

'কী বুঝছ?' জিজ্ঞেস করল লিয়ারি।

'কঠিন হবে ব্যাপারটা,' বলল হুপার। 'হয়তো একেবারে শেষ মুহূর্তে নাগালে পাব ওদেরকে।'

আলতো করে মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি। কপালের ভাঁজ গভীর হলো তার।

চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হচ্ছে ফ্রেজনো। শহরের বাইরের দিকটা খুঁটিয়ে দেখল রানা, প্রয়োজনমাফিক জায়গা পাওয়া যায় কি না খুঁজছে। হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করাবার মত যথেষ্ট স্পেস দরকার, সেইসঙ্গে মানুষজনের ভিড়। শপিং মলের পার্কিং লট হলে ভাল হয়। তেমন কিছু চোখে পড়ছে না, কিন্তু হঠাৎ পার্কিং লটের চেয়ে ভাল একটা জায়গা চোখে পড়ল।

'ফুটবল পছন্দ করো?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যালি। 'কেন?'

সামনে ইশারা করল রানা। সিকি মাইল দূরে ঝলমল করছে একটা স্কুল স্টেডিয়াম—রাত্রিকালীন কোনও খেলা চলছে বোধহয়। গ্যালারির মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ ভরা। কণ্ট্রোল স্টিক নাড়ল ও, স্পিড কমিয়ে আনল ব্ল্যাক হকের। পনেরো সেকেণ্ডের মাথায় ফিল্ডের ওপরে পৌঁছে স্থির হলো। দেখল, খেলোয়াড় আর দর্শকদের সবাই বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে ওপরদিকে।

কয়েক সেকেণ্ড হোভার করল রানা, তারপর দ্রুত নিচে নামাতে শুরু করল কপ্টার। রোটর-ওঅশে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল খেলোয়াড়রা—পড়িমরি করে ছুটছে, খালি করে দিচ্ছে মাঠ।

'আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব,' অ্যালিকে বলল রানা। 'খুব ব্যথা পাবে, কিন্তু যা-ই ঘটুক, ক্ষতের ওপর থেকে হাতের মুঠো সরিয়ো না।'

মাঠ থেকে চল্লিশ ফুট ওপরে এখন ব্ল্যাক হক। উচ্চতা কমছে—ত্রিশ... বিশ...

'এরচেয়ে বেশি ব্যথা হওয়া সম্ভব কি না জানি না,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল অ্যালি।

'খুব শীঘ্রি টের পাবে। যদি চেঁচাতে চাও তো চেঁচিয়ো।'

ঝপ্ করে মাটি স্পর্শ করল হেলিকপ্টার, ঝাঁকি খেল একটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা, এরপর ঝুঁকে খুলে দিল

অ্যালির পাশের দরজাটা।

'আমি ওপাশ দিয়ে আসছি,' নিজের দরজা খুলতে খুলতে বলল ও। 'এক হাতে কাঁধে তুলে নেব তোমাকে।'

'আরেক হাতে কী করবে?' জানতে চাইল অ্যালি, পরক্ষণে পড়ে নিল রানার মনের কথা। 'বুঝেছি।'

'আর কোনও উপায় নেই।'

ঝটপট নেমে পড়ল রানা। ঘুরে চলে গেল অ্যালির পাশটায়। ওকে তুলে নিল কাঁধে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। তাতে কান দিল না রানা। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল কপ্টারের রোটরের তলা থেকে। খোলা আকাশের নিচে পৌঁছে উঁচু করল মুক্ত হাতটা—ওটায় শোভা পাচ্ছে ওর সিগ-সাওয়ার। পর পর তিনটা গুলি করল আকাশের দিকে।

আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল খেলোয়াড় আর দর্শকদের মাঝে। পাগলের মত এগজিট টানেলের দিকে ছুটল সবাই—বেরিয়ে যেতে চায়। টানেলগুলো যথেষ্ট চওড়া, গাদাগাদি হবার ভয় নেই; ভিড়ের কারণে টানেল আটকে যাবারও সম্ভাবনা নেই। অ্যালিকে কাঁধে নিয়ে পলায়নপর জনতার পিছু পিছু ছুটল রানাও।

অর্ধেক পথ যেতেই কেঁপে উঠল মাটি। মুহূর্তকাল পরেই আকাশে দেখা দিল দুটো এফ-এইটিন হরনেট, কানে তালা লাগিয়ে উড়ে গেল স্টেডিয়ামের ওপর দিয়ে। একদম নিচ দিয়ে উড়ছে, গ্যালারির মাত্র শ'খানেক ফুট ওপর দিয়ে গেল জেট ফাইটারদুটো। ওগুলোর পিছু পিছু ছুটে এল সনিক বুম, বিকট শব্দে ফেটে গেল স্টেডিয়ামের সব লাইট, আঁধারে ছেয়ে গেল চারপাশ।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা—যথাসময়ে নামতে পেরেছে মাটিতে। আর কয়েক মিনিট দেরি হলেই ব্ল্যাক হককে আকাশে পেয়ে যেত ফাইটারদুটো, মিসাইল ছুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিত।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল রানা। অন্ধকার আর বিভ্রান্তি ওকে সাহায্য করছে। পিস্তলটা গুঁজে রেখেছে কোমরে, কেউ বাধা দিতে এলে বের করার জন্যে তৈরি। তবে তার প্রয়োজন হলো না। টানেলের বিশৃঙ্খলার মাঝে কেউ আর মনে করতে পারছে না, আহত কিশোরীকে নিয়ে ছুটতে থাকা মানুষটাই প্রথমে গুলি ছুঁড়েছিল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পার্কিং লটে বেরিয়ে এল ওরা। আশপাশে তাকাল রানা, এখনও পালাতে ব্যস্ত সবাই। কেউ গাড়িতে চড়ে, কেউ বা গাড়ির পরোয়া না করেই দৌড়ে কেটে পড়ছে। পুরনো মডেলের একটা হোণ্ডা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ও, ওটার মালিকের কোনও খোঁজ নেই। ঘুসি মেরে ভেঙে ফেলল জানালার কাঁচ, তারপর হাত ঢুকিয়ে খুলে ফেলল দরজা। অ্যালিকে সাবধানে শুইয়ে দিল পেছনের সিটে। মেয়েটার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি ড্রাইভিং সিটে বসল রানা। ড্যাশবোর্ডের তলার তার জোড়া দিয়ে চালু করল ইঞ্জিন, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল গাড়িকে। চারদিকে যেন নরক ভেঙে পড়ছে। পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে লট থেকে। সেই গাড়ির মাঝে ঢুকে পড়ল রানাও। রাস্তায় নেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যালির দিকে। প্রায়-অচেতন অবস্থা মেয়েটার।

ঠোঁট কামড়াল রানা। কোথায় যাবে ভাবছে। একটা নামই মাথায় এল। মনে মনে প্রার্থনা করল, যেন বাড়িতে থাকে মানুষটা... যেন তার খবর জানা না থাকে শত্রুদের।

বাতাস পাক খাচ্ছে কম্পিউটার রুমের ভেতর। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে জানালার দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে লিয়ারি, ভেঙে গেছে কাঁচ। হু হু করে ঢুকে পড়েছে রাতের বাতাস। টেবিল থেকে উড়তে শুরু করেছে কাগজপত্র।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে যার যার ওঅর্কস্টেশনে বসে আছে অপারেটররা। কারও সাহস নেই কাগজগুলো কুড়িয়ে তোলে।

সতেরো

জেট ফাইটারদুটো যখন দ্বিতীয়বার ফ্রেজনোর ওপর দিয়ে উড়ে গেল, ডা. বারবারা হোল্ডেন তখন ড্রয়িং রুমে বসে টিভিতে সোপ অপেরা দেখছিলেন। বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল তাঁর, সারা বাড়ি যেন কেঁপে উঠল থর থর করে, টিভির পর্দার ছবি ঝিরঝির করে উঠল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। বিরক্ত ভঙ্গিতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ফ্রেজনোর আকাশে ফাইটারের আনাগোনা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এদিকটায় মাঝে মাঝেই বিমানবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের মহড়া হয়, তাই বলে রাতের বেলা, কিংবা এত নিচ দিয়ে ওড়ে না ফাইটারগুলো। আরেকটু হলেই প্রচণ্ড শব্দে তাঁর সমস্ত জানালার কাঁচ ভেঙে যেত।

নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন বারবারা। বয়স পঞ্চাশের ঘর ছোঁবে খুব শীঘ্রি, কিন্তু সংসার করা হয়ে ওঠেনি আজও। অল্পবয়েসে বিয়ে করেছিলেন, তবে সে-ঘর টেকেনি বেশিদিন। ক'দিন যেতে না যেতে টের পেয়েছিলেন, ডাক্তারিই তাঁর সব; স্বামী-সংসারের প্রতি টান অনুভব করেন না মোটেও। ফলে শেষমেশ যা হবার তা-ই হলো, ডিভোর্স হয়ে গেল স্বামীর সঙ্গে, দ্বিতীয়বার আর সে-পথ মাড়াননি তিনি। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন ডাক্তারি পেশায়।

ফাইটারের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই নতুন একটা আওয়াজ কানে এল বারবারার। একটা গাড়ি এসে থেমেছে তাঁর ড্রাইভওয়েতে। জানালার কাঁচে দেখা গেল হেডলাইটের আলো। খানিক পর বেজে উঠল কলিং বেল।

ধীরে ধীরে দরজার কাছে গেলেন বারবারা, কিন্তু ছিটকিনি খুললেন না, দরজার পাল্লা ফাঁকা করে উঁকিও দিলেন না, বরং নিরাপদ দূরত্ব থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

জবাবে যার কণ্ঠ শোনা গেল, সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এই মানুষটাই তাঁকে দরজা খোলার আগে সতর্ক থাকার নিয়মকানুন শিখিয়েছে।

'ডা. হোল্ডেন? আমি রানা... মাসুদ রানা।'

চমকে উঠলেন বারবারা। 'রানা!' তাড়াতাড়ি খুললেন দরজা। 'তুমি কোত্থেকে...' বলতে বলতে থমকে গেলেন রানার উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে। 'কী হয়েছে?'

'আপনার সাহায্য দরকার,' রানা বলল। 'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ।'

তাড়াতাড়ি ওকে অনুসরণ করলেন বারবারা। গাড়ির কাছে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে ধরল রানা। ব্যাকসিটে আধো-অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে অ্যালি। পথিমধ্যে নির্জন একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়েছিল রানা, অ্যালির পরনের স্যুটটার উর্ধ্বাংশ খুলে নিয়ে পরীক্ষা করেছে হাতের ক্ষতটা। নিশ্চিত হয়েছে, শরীরের ওই একটা জায়গাতেই আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, তবে সেটা কতটা গুরুতর তা এখনও বলতে পারছে না। এটুকু বুঝতে পারছে, রক্তবাহী কোনও ধমনী কাটা পড়েনি; সেক্ষেত্রে এতক্ষণে রক্তক্ষরণের ফলে জ্ঞান হারাত ও, কিংবা মারা যেত।

গাড়ির দরজার কাছে এসে এক মুহূর্তের জন্য থমকালেন বারবারা, তারপর রানাকে পাশ কাটিয়ে উঠে পড়লেন পেছনের সিটে। শার্ট ছিঁড়ে অ্যালির হাতে একটা টর্নিকেট

বেঁধে দিয়েছে রানা, সাবধানে খুলে নিলেন সেটা। স্বল্প আলোয় দেখলেন ক্ষতটা। থমথমে হয়ে উঠল চেহারা।

'এ তো বুলেট ইনজুরি,' ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে বললেন তিনি। 'ওকে এখানে এনেছ কেন? হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার...'

'সরি,' মাথা নাড়ল রানা। 'হাসপাতালে যাওয়া যাবে না, পুলিশেও জানানো চলবে না। কেউ খবর পেলেই স্রেফ খুন হয়ে যাবে মেয়েটা।'

'কেউ হয় ও তোমার?' জানতে চাইলেন বারবারা।

আবারও মাথা নাড়ল রানা।

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন বারবারা। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'বুঝতে পেরেছি।'

না বোঝার কিছু নেই। এই অদ্ভুত বাঙালি যুবকটির স্বভাব সম্পর্কে ভালই জানা আছে তাঁর। সম্পূর্ণ অচেনা কোনও মানুষের দিকে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ও, প্রয়োজনে তাদের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় না। তিনি নিজেই তার সাক্ষী।

কয়েক বছর আগে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন বারবারা। উগ্র স্বভাবের চারজন কালো যুবক, নির্জন এক গলিতে পথরোধ করেছিল তাঁর, কেড়ে নিয়েছিল সর্বস্ব। বারবারা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাঁকে ছুরি মারে ওরা, এরপর পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় কষ্টেসৃষ্টে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন তিনি। রক্তক্ষরণে মারাই যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সে-মুহূর্তে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল রানা। গাড়ি থামিয়ে তাঁকে তুলে নেয় ও, নিয়ে যায় হাসপাতালে। ঘটনা এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনও কথা ছিল না, এমনতরো সাহায্যকারী অনেকেই পাওয়া যায়, কিন্তু রানার ব্যাপার ভিন্ন। বারবারার অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে অপেক্ষা করেছে সে, জ্ঞান হবার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুরো

ঘটনা জেনে নিয়েছে, এরপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে হাসপাতাল থেকে। চাইলে পুলিশের হাতে ঝামেলা গছিয়ে চলে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় বারবারা খবর পেলেন, ধরা পড়েছে চার ছিনতাইকারী—দু'জনের অবস্থা গুরুতর। আর তাদেরকে পুলিশে সোপর্দ করেছে মাসুদ রানা নামে এক বিদেশি যুবক। পুলিশের বদলে ও কেন কাজটা করতে গেল? কারণ চার দুর্বৃত্তই শহরের সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল গ্যাঙের সদস্য, তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস নেই পুলিশের। এ-কথা জানতে পেরে রানা নিজেই নেমে পড়েছিল মাঠে। ভয়ঙ্কর একটা গ্যাঙের বিরুদ্ধে ও একা! নিজেও মারা যেতে পারত। কিন্তু পিছিয়ে যায়নি। একদম অচেনা একজন মানুষের জন্যে, কোনও ধরনের প্রতিদানের আশা ছাড়া, কেউ এতকিছু করতে পারে, তা কখনও কল্পনাও করেননি বারবারা। রানা তার দায়িত্ব সেখানেও শেষ করেনি। যতদিন হাসপাতালে ছিলেন, নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছে; সুস্থ হবার পর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, এমনকী ভবিষ্যতে বিপদ-আপদ এড়ানোর নানা কৌশল বলে দিয়েছে। তারপর একদিন... ধূমকেতুর মত যেভাবে উদয় হয়েছিল, সেভাবে মিলিয়ে গেছে।

এভাবে আরও কত-শত মানুষকে সাহায্য করেছে রানা, তা জানা নেই বারবারার। কেউ জানে না। আর সেটাই রানাকে সাহস জুগিয়েছে তাঁর কাছে আসার জন্যে। শত্রুপক্ষের কাছে তাঁর সঙ্গে রানার পরিচয়ের কোনও ধরনের রেকর্ড থাকার কথা নয়।

গাড়ি থেকে নেমে এলেন বারবারা। বললেন, 'আমাকে সাহায্য করো। ওকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে হবে।'

দু'জনে ধরাধরি করে অ্যালিকে নিয়ে গেল বারবারার বেডরুমে, শুইয়ে দিল বিছানায়। বারবারা একটা ইঞ্জেকশন

দিলেন ওকে, এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আঘাতটা পরীক্ষা করায়। পনেরো মিনিট পর রানা যখন গাড়িটা দূরের একটা পার্কিং লটে রেখে পায়ে হেঁটে ফিরে এল, তখন অ্যালির ক্ষতটার পরিচর্যা শুরু করেছেন বারবারা।

'হাতের হাড় অক্ষত আছে,' রানার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বললেন তিনি। 'ব্র্যাকিয়াল আর্টারি বা ডিপ ব্র্যাকিয়ালেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। এগজিট উণ্ড দেখে মনে হচ্ছে আস্ত বুলেটটাই বেরিয়ে গেছে, ভেতরে কোনও ফ্র্যাগমেণ্ট রয়ে যায়নি।'

স্বস্তি অনুভব করল রানা। সবগুলোই ভাল খবর।

'ক্ষতটা পরিষ্কার করছি এখন,' বললেন বারবারা। 'এরপর ব্যথার ওষুধ আর অ্যাণ্টিবায়োটিক্স শুরু করব। আশা করি আধঘণ্টার ভেতরেই ব্যথা কমে যাবে ওর—পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই।'

'ধন্যবাদ, ডা. হোল্ডেন,' কৃতজ্ঞতা জানাল রানা।

'কী যে বলো না! ধন্যবাদ দেবার কী আছে? রোগীর সেবা করা তো আমার কর্তব্য। বাই দ্য ওয়ে, ওর তো বোধহয় নতুন পোশাকও লাগবে...'

মেঝের ওপর পড়ে আছে প্রক্সিমিটি স্যুটটা। রক্তে মাখামাখি। একই অবস্থা অ্যালির গায়ের পোশাকের। আধভেজা হয়ে লেপ্টে গেছে শরীরে।

'ঠিক বলেছেন,' রানা সায় জানাল। 'আশপাশে কোনও দোকান আছে?'

'এ-অবস্থায় তোমার আর বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। অ্যাটিকে আমার প্রচুর পুরনো জামাকাপড় আছে। একটা না একটা ঠিকই ওর লেগে যাবে।'

'কী বলে যে...'

'আবার একই কথা?' চোখ রাঙালেন বারবারা। 'এখন যাও, আমাকে কাজ করতে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরতে গেল রানা। কী যেন মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার টিভিটা কোথায়?'

'ড্রয়িং রুমে। কেন?'

'শুনলাম আজ সারাদিন আমাকে খবরে দেখানো হচ্ছে। আপনি দেখেননি?'

'না, আমি নিউজ চ্যানেল দেখি না। ভাল কোনও খবর থাকে না... অসহ্য লাগে আমার।'

ড্রয়িং রুমে চলে এল রানা। রিমোট তুলে চ্যানেল ঘোরাল। থামল সিএনএন-এ পৌঁছে। আকাশ থেকে তোলা স্টেডিয়ামের ছবি ফুটে উঠেছে পর্দায়। দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারটা—যেখানে ল্যাণ্ড করেছিল, সেখানেই বসে আছে এখনও, মাঠের পঞ্চাশ-গজ নির্দেশক লাইনটার ওপরে, আড়াআড়িভাবে। লাল-নীল বাতি জ্বলতে থাকা অনেকগুলো গাড়ি ঘিরে রেখেছে ওটাকে। দেখে মনে হচ্ছে, অন্তত আধ ডজন ফেডারেল এজেন্সি উদয় হয়েছে দৃশ্যপটে।

সোফায় বসে নিউজ কাভারেজ দেখতে থাকল ও। বুঝতে চাইছে, পরিস্থিতি কতটা গুরুতর। বিশ মিনিটের মাথায় আরও কয়েকটা চ্যানেল ব্রাউজ করার পর বুঝল, সেটা যথেষ্টই খারাপ। টিভির পর্দার নিচে স্ক্রল করছে খবরটা... সোজাসাপ্টা ভাষায়—হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির বরাত দিয়ে জানানো হচ্ছে, এক মুসলিম জঙ্গি যুবক তার নিজ হাতে বানানো একটা রেডিয়োলজিক্যাল বোমা নিয়ে ঢুকে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে গুরুত্বপূর্ণ কোনও স্থানে। হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির এক কর্তাব্যক্তির সাক্ষাৎকার দেখানো হলো। তিনি বলছেন, হাতে একদম সময় নেই, বোমাটা যে-কোনও মুহূর্তে ফাটানো হতে পারে। দেশবাসীর সাহায্য চাইছেন তিনি ভয়ঙ্কর ওই টেরোরিস্টকে খুঁজে বের করার জন্য।

সন্দেহভাজন যুবকের নাম বলা হচ্ছে না কোথাও।

সেটার কারণ আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ওপরমহলে রানার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সরাসরি ওর নাম প্রচার করে যদি সন্ত্রাসবাদের আখ্যা দেয়া হয়, তা বিশ্বাস করবে না তারা কেউ, বরং প্রতিবাদ করে বসবে। তাই একটু ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হয়েছে নাম না বলে। কথিত টেরোরিস্ট আর রানা যে একই ব্যক্তি, সেটা পরিষ্কার হবার আগেই ওকে আর অ্যালিকে খুঁজে বের করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ইচ্ছে।

নাম না বললেও একটা কম্পোজিট স্কেচ দেখানো হচ্ছে টিভিতে—হাতে আঁকা একটা ছবি, যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মোতাবেক আঁকা। তবে এক দেখাতেই রানা বুঝল, বর্ণনা-টর্ণনা কিছুই নয়, ডোশিয়ে-তে রাখা ওর ফটোগ্রাফ দেখে আঁকা হয়েছে ওটা। একদম নিখুঁত... কম্পোজিট স্কেচ এত নিখুঁত হয় না। ওটা দেখলেই যে কেউ চিনবে ওকে।

চিনতেও পেরেছে। বেকারস্‌ফিল্ডের যেখান থেকে পুরনো জিপটা কিনেছিল রানা, সেখানকার সেলসম্যান চিনেছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্যাশিয়ার চিনেছে। ওরাই খবর দিয়েছে হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটিকে। জিপের বর্ণনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে টেলিভিশনের কল্যাণে। সে-কারণেই বনের কাছে ওটাকে দেখামাত্র একজন হাইকার আবার পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিল।

সব মিলে পরিস্থিতি রীতিমত বেগতিক, বুঝতে পারছে রানা। ওকে সাহায্য করার মত লোকের অভাব নেই, কিন্তু সে-সুযোগটাই দেয়া হবে না কাউকে। নিঃসন্দেহে আড়ি পাতা হয়েছে ওর বন্ধুবান্ধবদের ফোনে, লোক লাগানো হয়েছে তাদের পেছনে... রানা যোগাযোগ করলেই টের পেয়ে যাবে।

পেছনে মৃদু আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। ড্রয়িং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন বারবারা, চোখ টিভির দিকে।

কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পায়নি ও, খবর শোনার দিকে ছিল সব মনোযোগ।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকালেন বারবারা। জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব সত্যি?'

'টিভিতে যা বলছে?' মলিন হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'আপনার কী ধারণা?'

'একটা বর্ণও বিশ্বাস করছি না। তোমাকে তো আমি চিনি।' এগিয়ে এসে রানার পাশের সোফায় বসলেন বারবারা। 'কিন্তু বড় ধরনের একটা গোলমালে যে জড়িয়েছ, তা বুঝতে পারছি পরিষ্কার।'

'দুঃখিত,' বিব্রত হলো রানা। 'আপনাকে এসবের সঙ্গে জড়াবার আগে বোধহয় সবকিছু খুলে বলা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত বদলাত না ওতে। ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন, আমি তোমাকে সাহায্য করতাম।'

কারণটা জানতে চাইল না রানা। ডা. বারবারার চোখে কৃতজ্ঞতার যে-আভা ফুটে উঠেছে, তা আগেও বহু মানুষের চোখে দেখেছে ও। এখন কিছু জিজ্ঞেস করতে যাওয়া মানেই আবেগঘন কণ্ঠে ওর গুণগান আর কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বন্যা বয়ে যাওয়া। ওসবে চিরকালই বিব্রত বোধ করে রানা। তাই ছোট্ট করে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষান্ত রইল।

'তবে সবকিছু জানার কৌতূহল অনুভব করছি,' বললেন বারবারা। 'মেয়েটা কে? কোথায় পেলে ওকে? বলবে?'

গোপন করার কোনও কারণ পেল না রানা। বারবারা জড়িয়ে গেছেন ওদের সঙ্গে, এখন তাঁকে অন্ধকারে রেখে লাভ নেই কোনও। তা ছাড়া, পুরো ব্যাপারটাই এখনও দুর্বোধ্য। ঘুমের ঘোরে যা বলেছে অ্যালি, তা খতিয়ে দেখার সময় পায়নি ও। কারও সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সেক্ষেত্রে একজন ডাক্তারের চেয়ে ভাল শ্রোতা আর

কেউ হতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বলতে শুরু করল রানা। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত—সব। অডিয়ো রেকর্ডার চালিয়ে অ্যালির কথাগুলোও শোনাল বারবারাকে। ওর কথা শেষ হলো পুরো বিশ মিনিট পর। মাঝে একবারও মুখ খোলেননি বারবারা, রানার কথা শেষ হবার পরেও কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। চেহারা দেখে মনে হলো, কথাগুলো ভালমত আত্মস্থ করতে চাইছেন।

খানিক পর নীরবতা ভাঙলেন তিনি। ঠিক অবিশ্বাস নয়; সন্দেহের সুরে বললেন, 'মাইণ্ডরিডার? সত্যি?'

'নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না।' রানা কাঁধ ঝাঁকাল।

'ইউটাহ্-র ব্যাপারটা কী? কী আছে ওখানে?'

'কে জানে। হয়তো নতুন ধরনের কোনও ওয়েপন। লিয়ারির তৈরি করা। সে না করে থাকলে মার্কিন সরকার, কিংবা অন্য কোনও ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টর তৈরি করেছে।'

'তার সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ের কী সম্পর্ক?'

'যতদূর বুঝতে পারছি, অ্যালিকে ওটার জন্যে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে ওরা। এতটাই যে, ওকে খুন করতে চাইছে। ওদের ধারণা, অ্যালি বেঁচে থাকলে এলিয়াস লেকের ওই জিনিসটার ক্ষতি হবে।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ওটার সঙ্গে মাইণ্ডরিডিঙের সম্পর্ক আছে,' বললেন বারবারা। 'অ্যালিকে আরেকবার ইন্টারোগেট করা গেলে...'

'সম্ভব?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন বারবারা। 'কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছি ওকে। স্লিপ ইন্টারোগেশনের জন্যে যেটুকু চেতনা থাকা দরকার, তা এ-মুহূর্তে নেই। জেগে ওঠার পর দ্বিতীয়বার কখন ঘুমাবে, বলতে পারি না। হাতের ব্যথাটা ভোগাবে বেশ,

ঠিকমত ঘুম হবে বলে মনে হয় না। আর যে-ড্রাগটার কথা তুমি বললে, ওটাও বেরোতে শুরু করেছে শরীর থেকে... তার একটা প্রভাব তো আছেই।'

'তা হলে ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার উপায় নেই। যতটুকু জেনেছি, তা-ই বেশি।' ঠোঁট কামড়াল রানা। কী যেন ভাবল কয়েক মুহূর্ত। এরপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কম্পিউটার আছে আপনার?'

'হ্যাঁ। এনে দিচ্ছি।'

কয়েক মিনিট পরেই একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে এলেন বারবারা। রানার সামনে, সেন্টার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন সেটা। পাওয়ার বাটন টিপে কম্পিউটারটা অন্ করল রানা। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। আজকালকার প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়ে গেছে, অনায়াসে সার্চ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা কি-ওয়ার্ড ট্র্যাক করা যায়। রানা যদি গুগলের সার্চ বারে 'এলিয়াস ড্রাই লেক' লেখে, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্নিং পাবে শত্রুপক্ষ—কেউ একজন লেকটার বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে। এরপর আই.পি. অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে ওকে খুঁজে বের করা তো ছেলেখেলা!

ভেবেচিন্তে বিকল্প একটা কায়দা বের করল রানা। সার্চ ইঞ্জিনের বদলে কম্পিউটারের ব্রাউজারে খুলল *গুগল ম্যাপস্*। সার্চ অপশন ব্যবহারের ঝামেলায় গেল না, মাউসপ্যাডের সাহায্যে খুঁজে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র, আস্তে আস্তে যুম করতে শুরু করল ইউটাহ্ রাজ্যের মানচিত্র।

এলিয়াস ড্রাই লেক।

নামটা মাথার ভেতরে খোঁচাচ্ছে রানার। আগে কখনও শুনেছে কি না, মনে পড়ছে না। দেখা দরকার, ওখানে আসলে কী আছে। এর জন্যে গুগল ম্যাপসের থ্রিডি ইমেজের চেয়ে ভাল অপশন এ-মুহূর্তে আর কিছু নেই।

ম্যাপটা বড় হতে হতে ক্রমান্বয়ে পর্দায় ফুটে উঠল বিভিন্ন

ধরনের ভৌগোলিক বিশেষত্ব—পাহাড়, নদী, সমতলভূমি, ইত্যাদি। সবগুলোর পাশে নামও ভেসে উঠেছে। রাজ্যের উত্তর প্রান্ত থেকে নামগুলো পড়তে শুরু করল রানা। যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল তিন মিনিটের মাথায়। শুধু নামে নয়, কাজেও ওটা ড্রাই লেক—পানি নেই... শুকনো, খটখটে।

রকি পর্বতমালার পশ্চিমে, বিশাল মরু এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে হ্রদটা। উত্তরে, পাঁচ মাইল দূর দিয়ে গেছে পঞ্চাশ নম্বর হাইওয়ে। সরু একটা রাস্তা বেরিয়ে এসেছে হাইওয়ে থেকে, মিলেছে লেকের মাথায়... রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে ওখানেই। খুব বড় নয় লেকটা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দু'দিকেই তিন মাইলের মত। পুরো স্ক্রিনজুড়ে লেককে যুম করে খুঁটিয়ে দেখল রানা, ধারেকাছে কোনও বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই। পুরোটাই ফাঁকা, সাদাটে... মরুভূমির স্ট্যাণ্ডার্ডেও একেবারে বন্ধ্যা।

'ওটা আবার কী?' হঠাৎ বলে উঠলেন বারবারা।

স্ক্রিনের মাঝখানে, বিন্দুর মত একটা দাগের দিকে ইশারা করছেন তিনি—ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে আলাদা করা যায় কি যায় না। রানার চোখ এড়িয়ে গেছে প্রথম দফায়। মাউসপ্যাডের ওপর আঙুল ঘোরাল ও, বড় করতে থাকল ছবিটা। যুম করার সর্বোচ্চ লিমিটে যখন পৌঁছুল, তখন বিন্দুটা স্ক্রিনের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি, তাই বিন্দুর মত লাগছে, কিন্তু লেকের বেড়ে বিছিয়ে থাকা ছায়া দেখে বোঝা গেল ওটার পরিচয়। সেলফোনের একটা টাওয়ার।

'ফলস্ অ্যালার্ম,' বললেন বারবারা।

'আমার তা মনে হয় না।' রানার কপালে ভাঁজ দেখা দিয়েছে। মনে পড়ে যাচ্ছে, বেকারস্‌ফিল্ডে একটা সেলফোন টাওয়ার দেখে কী ভীষণ ভয় পেয়েছিল অ্যালি। ম্যাপটা ছোট করে নিল ও। হাইওয়ে অনুসরণ করে খুঁজে বের করল সবচেয়ে নিকটবর্তী জনপদ। কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ছোট্ট

একটা শহর, হাইওয়েের পাশে। শহরে কোনও সেলফোন টাওয়ার আছে কি না দেখল। আছে... শহরের উত্তর প্রান্তে। ভাল করে হাইওয়েের পুরো দৈর্ঘ্য চেক করল ও। আরও অনেকগুলো টাওয়ারের খোঁজ পেল, সবগুলোই রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ানো। ব্যতিক্রম শুধু লেকের টাওয়ারটা।

'গড়বড় আছে এখানে,' রানা বলল। 'লেকের মাঝখানে দাঁড়ানো টাওয়ারটা হাইওয়ে বা কাছের শহরটাকে সার্ভিস দিচ্ছে না। আশপাশের বিশ মাইলের ভেতর আর কোনও শহর-টহরও নেই। অমন একটা স্পটে টাওয়ার বসানোর কোনও মানেই হয় না।'

'তা হলে কী ওটা?'

জবাবটা জানা নেই রানার। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টাওয়ারটার দিকে।

'রেকর্ডিঙে অ্যালি যা কিছু বলেছে, তার বেশিরভাগের অর্থ বুঝিনি আমি,' বারবারা বললেন। 'তবে একটা শব্দ আমার ভেতর খটকা জাগিয়েছে।'

চোখ তুলল রানা। 'কোন্ শব্দ?'

'নকআউট।'

নকআউট ওয়ান ওয়ান—নিজের পরিচয় দেবার সময় বলেছিল অ্যালি, মনে পড়ল রানার। বারবারাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ওটার অর্থ জানেন?'

'একটা অর্থ জানি। আমার ধারণা, এক্ষেত্রে সেটাই বোঝানো হয়েছে।'

চুপচাপ শুনে গেল রানা।

'বিষয়টা আমার ফিল্ডের নয়,' বারবারা বলে চললেন, 'তবে ডাক্তারিশাস্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের জন্যে শব্দটা একেবারে অপরিচিত নয়। সাধারণত ল্যাবরেটরির ইঁদুরের বেলায় ব্যবহার করা হয় শব্দটা—*নকআউট মাউস*। মানে, জিনেটিক মডিফিকেশন করা হয়েছে ইঁদুরটার—নির্দিষ্ট একটা

জিন সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওটার শরীর থেকে... নকড্ আউট।'

একটু ভাবল রানা। ব্যাখ্যাটা মন্দ নয়। অ্যালির বাকি কথাগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। মলিকিউলার বায়োলজি... আর.এন.এ. ইন্টারফ্যারেন্স... বিজ্ঞানে রানার কোনও ডিগ্রি নেই, কিন্তু এটুকু জানে, শব্দগুলো জিনেটিক রিসার্চের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

'কিন্তু কোনও জিন সরিয়ে নিলে কেন নতুন ক্ষমতা পাবে কেউ?' জানতে চাইল ও।

'কারণ ডি.এন.এ. জিনিসটা একটা মস্ত বড় রহস্য,' বললেন বারবারা। 'লোকে ডি.এন.এ.-কে মানবদেহের ব্লুপ্রিন্ট মনে করে, কিন্তু আদপে ওটা একটা রেসিপির মত, যেটা নিয়ে লক্ষ-কোটি বছর ধরে পরীক্ষা চালাচ্ছে প্রকৃতি। আমার এক পুরনো প্রফেসর বলতেন কথাটা। এমন একটা রেসিপি, যেটায় নিত্যনতুন উপকরণ লেখা হচ্ছে, কেটে দেয়া হচ্ছে পুরনোগুলো। কিন্তু পুরোপুরি মুছে ফেলা হচ্ছে না। অনেকটা কাগজের লেখাকে দাগ দিয়ে কেটে তলায় নতুন কিছু লেখার মত একটা ব্যাপার আর কী। আমাদের বেলাতেও তা-ই ঘটছে। বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে চলেছে মানুষের শরীর—একসময় লেজ ছিল আমাদের, গা-ভর্তি মোটা মোটা ভারী পশম ছিল... এখন কিছুই নেই। কিন্তু সেসবের জিন মুছে যায়নি আমাদের ডি.এন.এ. থেকে, বরং নতুন জিন এসে দমিয়ে রেখেছে ওগুলোকে। ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারলাম তোমাকে?'

'কিছুটা,' বলল রানা। সোফা ছাড়ল ও, হেঁটে চলে গেল কামরার পেছনদিকে স্লাইডিং ডোরের কাছে। বাড়ির পেছনের সুইমিংপুল আর গলফ গ্রাউণ্ডের দিকে চলে গেল চোখ। স্প্রিঙ্কলার চালু করা হয়েছে, ল্যাণ্ডস্কেপিঙের লাইটগুলোর আলোয় চকচক করছে ভেজা ঘাস।

‘মাইণ্ডরিডিং,’ ওদিকে তাকিয়ে বলল ও। ‘ওটাও কি লেজ বা লোম খসানোর মত ব্যাপার?’

‘হ্যাঁ,’ বারবারা বললেন। ‘মাঝে মাঝে বিভিন্ন মেডিক্যাল কনফারেন্সে যেতে হয় আমাকে, সেখানে যে কত সব অদ্ভুত জিনেটিক রিসার্চের ব্যাপারে বক্তৃতা শুনতে হয়, কল্পনা করতে পারবে না। বেশ কিছু প্রাণী আছে... যেমন ধরো নিউট বা গোসাপ... অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজাতে পারে। কাঁধের জয়েন্ট থেকে সামনের একটা পা কেটে ফেলে দাও, দেখবে কয়েক সপ্তাহের ভেতরেই আরেকটা পা গজিয়ে গেছে—টিস্যু, মাসল, নার্ভ, চামড়া, হাড়... সবকিছু সহ! বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, এই ক্ষমতা দুনিয়ার সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাঝে আছে, কিন্তু সুপ্ত অবস্থায়। কারণ অন্যান্য জিন এই হাত-পা গজানোর জিনকে দমন করে রেখেছে। এখন যদি আমরা ওই বিশেষ জিনগুলোকে আইডেণ্টিফাই করতে পারি... ওগুলোকে সরিয়ে দিতে পারি, মানুষও তার হাত-পা কাটা পড়লে আবার গজিয়ে নিতে পারবে।’

স্লাইডিং ডোর থেকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ‘কিন্তু ক্ষমতাটা চাপা পড়ল কেন? এমন একটা ক্ষমতা তো সহজে হাতছাড়া হবার কথা নয়।’

‘এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে-যুক্তি শুনেছি, তা হলো, নতুন হাত-পা গজানোর চেয়ে না-গজানো নিরাপদ। কারণ প্রাথমিকভাবে খুবই নাজুক থাকবে নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না, সহজেই ইনফেকশনের শিকার হবে, আর সেটা ছড়িয়ে পড়তে পারে পুরো শরীরে। তাই অমন জিনিস না-থাকাই ভাল। প্রকৃতি হয়তো সেজন্যেই কেড়ে নিয়েছে ক্ষমতাটা।’

‘আর মাইণ্ডরিডিং?’

কাঁধ ঝাঁকালেন বারবারা। ‘এ-বিষয়ে কিছুই জানা নেই আমার। কোনও কনফারেন্সে এ-নিয়ে আলোচনাও হতে

শুনিনি।'

কাছে এসে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। ওর নজর আটকে রইল ড্রাই লেক আর টাওয়ারের ইমেজের ওপর।

'ওখানে যাবে তুমি,' বললেন বারবারা, তবে প্রশ্নের সুরে নয়।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তার কোনও দরকার কি সত্যিই আছে? অ্যালির স্মৃতি ফিরলেই তো জানতে পারবে সব। বড়জোর সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে। এ-সময়টা তোমরা আমার এখানেই কাটিয়ে দিতে পারো।'

'শুধু অ্যালিকে রাখলেই চলবে,' রানা বলল। 'দু-তিনদিন ওকে একাকী সামলাতে পারবেন আপনি? মানে, আমি না ফেরা পর্যন্ত?'

'নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু ওখানে যাবার ঝুঁকি নিচ্ছ কেন?'

'কারণ অন্ধের মত ঘুরপাক খেতে পছন্দ করি না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'লড়াইয়ে নামার আগে শত্রুরা যা জানে আমিও তা জানতে চাই। তা ছাড়া অ্যালিই বলেছে, ওখানে লুকিয়ে আছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর।'

'ওখানে না গিয়েও সে-উত্তর জানা সম্ভব তোমার পক্ষে। ছ'সাতদিনেরই তো ব্যাপার।'

'সাতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মানে ওদেরকেও সাতদিন সময় দেয়া। সংগঠিত হবার সময় পাবে শত্রুরা, ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের সবক'টা সম্ভাব্য পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করবে, সে-অনুযায়ী পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে রাখবে। যত লোক লাগুক, যত ধরনের যন্ত্রপাতি লাগুক... সবকিছুর আয়োজন করে রাখবে। তখন আর একটাও অপ্রত্যাশিত চাল দিতে পারব না আমরা। কিন্তু এখন... ওরা খানিকটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। এ-সুযোগেই যা করার করে ফেলতে হবে,

ওরা নিজেদের গুছিয়ে নেবার আগেই।'

টাওয়ারের দিকে ইশারা করলেন বারবারা। 'ওটার খবর লিয়ারি জানে। অ্যালিকে ইন্টারোগেট করেছে ওরা। তুমি যে ওখানে যেতে পারো, সেটা আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। গিয়ে হয়তো দেখবে, ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে ওরা।'

'জানি। কিন্তু যেতে আমাকে হবেই।'

'আমাকেও।'

অ্যালির কণ্ঠ শুনে ঝট্ করে দরজার দিকে তাকাল রানা ও বারবারা, মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ক্লান্ত চেহারা, তবে আগের চেয়ে সতেজ দেখাচ্ছে। রক্তমাখা পোশাক পাল্টে পুরনো একটা জিন্স আর টি-শার্ট পরেছে।

বারবারার দিকে কটাক্ষ হানল রানা। 'ওকে না ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বোকা বোকা দেখাচ্ছে বারবারাকে। 'কিন্তু কাজ করেনি দেখছি!'

'কেন?'

বারবারা জবাব দেবার আগেই আবার মুখ খুলল অ্যালি। বলল, 'ঘুমের ওষুধের চেয়ে বড় একটা রহস্য রয়েছে আমাদের সামনে। এলিয়াস ড্রাই লেক, আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সেলফোন টাওয়ারের রহস্য।'

'তোমার বিশ্রাম নেয়া দরকার, ডিয়ার...' বলার চেষ্টা করলেন বারবারা।

অ্যালি বাধা দিয়ে বলল, 'আমি এখানেই বসব। ব্যাপারটা জরুরি।'

শান্ত চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। মেয়েটাকে যথেষ্ট সিরিয়াস দেখাচ্ছে। তাই আপত্তি করল না আর।

এগিয়ে এসে সোফায় বসল অ্যালি।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কথাবার্তা তুমি শুনতে পেয়েছ?'

'না। শুনেছি শুধু চিন্তাগুলো।'

'অডিয়ো রেকর্ডারের কথাগুলো?'

'ওগুলোও। একই কায়দায়।'

বারবারার সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। এই প্রথম অ্যালির ক্ষমতা চাক্ষুষ করছেন ডাক্তার, তাঁকে বিহ্বল দেখাল। অ্যালি ততক্ষণে কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। মাউসপ্যাডে আঙুল বুলিয়ে যুম করল লেকের ছবিটা। টাওয়ারটা বড় করে দেখছে।

'ওখানে তোমাকে নিতে পারব না আমি, সেটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?' বলল রানা। 'নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেয়া এক কথা, কিন্তু তোমাকে... না, সেটা সম্ভব নয়।'

'ঝুঁকি ছাড়াই লেকটার কয়েক মাইলের ভেতর পৌঁছুনো সম্ভব,' বলল অ্যালি। 'এরপর তুমি যদি কাছে গিয়ে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে চাও, আমি আপত্তি করব না। তাই বলে আমাকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ফেলে যেতে পারো না তুমি। আমি সেটা মানব না। তা ছাড়া আমাকে সঙ্গে নেবার পেছনে আরেকটা যুক্তি আছে। ওখানে গেলে হয়তো কিছু মনে পড়বে আমার... খুলে যাবে স্মৃতির দুয়ার। তুমি কি চাও না সেটা?'

জবাব দিল না রানা। গম্ভীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অ্যালি বলল, 'আমার ধারণা, এই ব্যাপারটা স্রেফ তোমার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অনেক বড় কিছু জড়িত এর সঙ্গে। তোমার কি সেটা মনে হচ্ছে না? আমি তো বলব, এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত হবে না আমাদের। এখুনি যাওয়া দরকার ওখানে।'

তাড়াটা রানাও অনুভব করছে, কিন্তু মুখে বলতে পারল না। অ্যালিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। লুবনাকে বাঁচাতে পারেনি, এখন যদি এরও কিছু হয়ে যায়...

'রানা,' নীরবতা ভেঙে ডাকলেন বারবারা। 'কথাগুলো

খুব একটা ভুল বলেনি অ্যালি। আমি বলব, ইউটাহ্-য় যদি যেতেই হয় তোমাকে, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া ওর যা মনোভাব দেখছি, তাতে এখানে ওকে আটকে রাখতে পারব না আমি।'

'তা হলে কী করতে বলেন আমাকে?' জানতে চাইল রানা।

'পুরনো একটা গাড়ি আছে আমার। ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ফ্রেজনোর চারদিকে রোডব্লক থাকবে, তবে আমি সেগুলো পার করে দিতে পারব তোমাদের। মডেস্টো পর্যন্ত ড্রাইভ করে নিয়ে যাব, এরপর ট্রেনে চড়ে ফিরে আসব নাহয়। যদি তোমরা ধরা পড়ে যাও, বলে দিয়ো, গাড়িটা আমার গ্যারাজের তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছ।'

অ্যালির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো রানার। দু'জনেই অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে বারবারার প্রতি।

'আপনি সত্যিই তুলনাহীন, ডা. হোল্ডেন,' বলল রানা।

'থাক, আর পাম দিতে হবে না,' হালকা গলায় বললেন বারবারা। 'তুমি নিজেও কম যাও না।'

'কখন বেরোতে পারবেন?' অ্যালি জানতে চাইল।

'তোমরা যখন বলবে, তখুনি। আমার হাতে তো আর কোনও কাজ নেই।'

'তা হলে এখুনি বেরোনো যাক,' রানা বলল। 'শহর থেকে বেরুবার সবগুলো পথ ভালমত বন্ধ হবার আগেই।'

আঠারো

ঠিক পাঁচ মিনিট পর রওনা হলো ওরা।

গাড়িটা *হোণ্ডা অ্যাকর্ড*—দশ-বারো বছরের পুরনো। ব্যাকসিট ভাঁজ করে রাখা যায়, তাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় গাড়ির কেবিন আর ট্রাঙ্কের মাঝখানের ফাঁকটা। ভাঁজ করার প্রয়োজন অবশ্য এখন পর্যন্ত পড়েনি, ট্রাঙ্কের ভেতর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে রানা আর অ্যালি। বাড়ি ছাড়ার তিন মিনিট আর পাঁচটা বাঁক অতিক্রমের পর ওদেরকে ডাকলেন বারবারা। সিটের ওপাশ থেকে ভোঁতা শোনাল তাঁর কণ্ঠ।

'অন-র্যাম্পে ওঠার আগে গাড়ি থামাচ্ছে পুলিশ,' জানালেন তিনি। 'আমি যতক্ষণ সঙ্কেত না দিচ্ছি, কোনও শব্দ কোরো না।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর ব্রেক চাপা হলো, শামুকের মত গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকল গাড়ি—থামছে-এগোচ্ছে-থামছে। কল্পনায় লাইনে পড়ে যাওয়া গাড়ির সারি দেখতে পেল রানা—সামনে পুলিশের গাড়ির লাল-নীল বাতি জ্বলছে আর নিভছে। একটু পরেই একটা টু-ওয়ে রেডিয়োর খড়খড়ানি শোনা গেল, অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে উঠল অ্যালির দেহ। ভেসে এল অ্যাসফল্টের ওপর পদশব্দ। বাটন টিপে জানালার কাঁচ নামালেন বারবারা, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হর্ন, ইঞ্জিন আর মানুষের হৈচৈ-এর আওয়াজ।

'ইভ্‌নিং!' বলে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ—তীক্ষ্ণ,

চাঁছাছোলা। কাঠিন্যের পাশাপাশি ভদ্রতা মিশে আছে গলায়। দীর্ঘদিনের অভ্যেসের ফসল।

'হাই!' বললেন বারবারা। 'এতসব চেকিং কীসের? টিভিতে যেটা দেখলাম, সেটার জন্যে?'

'ইয়েস, ম্যাম। আপনার আই.ডি.-টা দেখাবেন?'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। ব্যাকসিটের কিনার দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল রানা। আলো ফেলে গাড়ির ভেতরটা দেখছে অফিসার।

'কোথায় যাচ্ছেন, জানতে পারি, ম্যাম?' জানতে চাইল লোকটা।

'শহরের বাইরে যাচ্ছি দিনকয়েকের জন্যে,' বারবারা বললেন। 'টিভির ওই লোকটা যদি সত্যি সত্যি বোমা-টোমা নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকে আমাদের শহরে, আমি বাপু এখানে বসে থেকে মরতে রাজি নই। তাই ভাবলাম কয়েকদিনের জন্যে সটকে পড়ি। সবকিছু ঠাণ্ডা হলে নাহয় ফিরে আসব।'

তাঁর কণ্ঠ শুনে মনে হলো, মনে মনে কথাগুলোর রিহার্সেল দিয়ে নিয়েছেন। বলার ভঙ্গিতে সেটা পরিষ্কার। সাজানো ডায়লগ বুঝতে অসুবিধে হয় না। কুডাক শুনতে পাচ্ছে রানা।

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলল না অফিসার। এরপর নতুন নির্দেশ দিল সে। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ট্রাঙ্কটা খুলুন, ম্যাম। আমি ভেতরটা দেখব।'

'সেটা কি খুব জরুরি?' জিজ্ঞেস করলেন বারবারা।

'সময় নেব না, ম্যাম। খুলুন ডালাটা।'

আর কিছু বলার রইল না বারবারার।

প্রমাদ গুনল রানা। সিগ-সাওয়ারটা ওর প্যান্টের ওয়েস্টব্যাণ্ডে গোঁজা আছে, কিন্তু হাত বাড়াল না ওটার দিকে। তাতে কোনও লাভ নেই। যা-ই করুক না কেন, লাভ হবে না কোনও। অন্তত ডজনখানেক পুলিশ অফিসার রয়েছে

গাড়ির আশপাশে—আজ রাতে তাদের প্রত্যেকেই ঝামেলা সামলাবার জন্যে তৈরি। তা ছাড়া আকাশে চক্কর দিচ্ছে পুলিশ আর এফবিআই-এর অনেকগুলো চপার। পালাবার কোনও পথ নেই ওদের।

'ম্যাম?' ডাকল অফিসার।

জবাব দিলেন না বারবারা। কী করছেন তিনি, আন্দাজ করল রানা। হুইলে হাত রেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন অফিসারের দিকে। কিছু বলার চেষ্টায় ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

'ম্যাম!' এবার প্রায় ধমকে উঠল অফিসার।

'ট্রাঙ্কে আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রেখেছি,' বলে উঠলেন বারবারা। 'আমি চাই না ওগুলো কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করুক। যেতে দিন আমাকে!'

চড়া সুরে কথা বলছেন তিনি, নার্ভাস হয়ে গেছেন। পুলিশের মনে সন্দেহ জাগাবার জন্যে যথেষ্ট। অফিসারের পরের কথায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

'ম্যাম, ট্রাঙ্কটা খুলুন বলছি! এখুনি!'

'ওয়ারেন্ট ছাড়া আপনি এ-ধরনের হুকুম দিতে পারেন না।'

'আমার ফোনের স্ক্রিনে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ওয়ারেন্ট এনে দেখাতে পারি। আপনি কি সেটাই চান?'

'আমি শুধু ফ্রেজনো থেকে বেরুতে চাই,' অনুনয়ের সুরে বললেন বারবারা। 'বোমার কথা শোনার পর থেকেই ভয়ে হাত-পা সেঁধিয়ে আসছে, আর আপনি কিনা...'

গলবার পাত্র নয় অফিসার। কড়া গলায় বলল, 'শেষবারের মত বলছি, ম্যাম। ট্রাঙ্কটা খুলবেন কি খুলবেন না?'

এরপরেই নেমে এল অস্বস্তিকর নীরবতা। রানা আশঙ্কা করল, এখুনি খুট করে খুলে যাবে ট্রাঙ্কের ডালা, ফ্ল্যাশলাইটের

উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে যাবে ওদের চোখ। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বারবারার গলাও আর শোনা যাচ্ছে না এখন। বিরাজ করছে স্রেফ অসহ্য নীরবতা। রানা টের পেল, অ্যালি কাঁপছে। আশ্বাস দেবার জন্যে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ও, মেয়েটার শরীরের কাঁপুনি যেন হাত বেয়ে চলে এল ওর শরীরে।

আরও মিনিটদুয়েক বজায় রইল নীরবতা। এরপর কথা বলল অফিসার। অদ্ভুত এক শান্ত স্বরে সে বলল, 'থাক, কিছু দেখাতে হবে না। আপনি যেতে পারেন। শুভরাত্রি।'

চুপ করে রইলেন বারবারা। কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভাবছেন, লোকটা ঠাট্টা করছে।

'যান, যান, পেছনে লাইন পড়ে গেছে,' এক মুহূর্ত পর বলল অফিসার। এরপর বুটের মচমচ তুলে হাঁটতে শুরু করল, চলে গেল পেছনের গাড়ির দিকে।

সংবিৎ ফিরে পেলেন বারবারা। তাড়াতাড়ি অ্যাকসেলারেটর চেপে সামনে বাড়ালেন গাড়িকে। অফিসারটি ইতিমধ্যে সঙ্কেত দিয়েছে, ব্যারিকেডের একটা অংশ সরিয়ে নেয়া হলো, ফাঁক গলে বেরিয়ে এল গাড়ি। শ্লথ গতিতে এগোল কিছুদূর। তারপর ধীরে ধীরে স্পিড বাড়াল।

'বেরিয়ে আসতে পারো,' একটু পর ডাক শোনা গেল বারবারার। 'বিপদ কেটে গেছে।'

ধাক্কা দিয়ে ব্যাকসিটের খাড়া অংশটা সামনের দিকে ভাঁজ করল রানা। ফোকরটা উন্মুক্ত হতেই তাজা বাতাসের ঝাপটা পেল মুখে, সেইসঙ্গে আবছা আলো প্রবেশ করল ট্রাঙ্কের ভেতর। অ্যালির দিকে তাকাল ও—ফ্যাকাসে হয়ে আছে মুখ, অসুস্থ চেহারা।

'ঠিক আছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালি।

'তা হলে বেরোও।'

ফোকর গলে অ্যালিকে বের হতে সাহায্য করল রানা। এরপর নিজেও বেরুল। সিট সোজা করে বসল। জানালার ওপাশে শাঁই শাঁই করে সরে যাচ্ছে একটার পর একটা ল্যাম্পপোস্ট। ফ্রেজনো শহরকে সত্তর মাইল বেগে পেছনে ফেলছে হোণ্ডা অ্যাকর্ড।

'ব্যাপারটা কী ঘটল?' সুস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুনতে পেয়েছ সব?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বারবারা।

'হ্যাঁ। লোকটা আপনাকে ছেড়ে দিল কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বারবারা। 'কী জানি। যে-রকম একরোখা আচরণ করছিল, ভেবেছিলাম রক্ষে নেই। কিন্তু হঠাৎ করে কী যেন হয়ে গেল ওর। কিছুই বুঝলাম না।'

খটকা লাগছে রানার। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কী হতে পারে, ভাবছে। খারাপ সম্ভাবনাটাই মাথায় এল প্রথমে। হয়তো থারমাল ক্যামেরা ছিল ওখানে। সেটায় দেখা গেছে, গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে দু'জন মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে অফিসারকে মেসেজ দেয়া হয়েছে, গাড়িটাকে যেন ছেড়ে দেয়া হয়। হয়তো ওখানে জনসমক্ষে কিছু করতে চায়নি, চেয়েছে গাড়িটা দূরে... নির্জন কোনও জায়গায় যাক, তারপর হামলা চালাবে। কিন্তু মেসেজটা দিল কীভাবে?

'অফিসারের কানে কোনও ইয়ারপিস ছিল?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কানে আঙুল চেপে কিছু শুনছিল লোকটা?'

'নাহ্,' মাথা নাড়লেন বারবারা। 'অমন কিছু থাকলে দেখতে পেতাম। জানালার পাশে মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছিল লোকটা।'

'কেউ ওকে কোনও ইশারা দিয়েছে?'

'কখন? সারাক্ষণ তো আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ মত পাল্টাল। পেছনের গাড়ির দিকে যখন গেল, তখনও সাইডভিউ মিররে ওর ওপর নজর রেখেছি। কোনও অস্বাভাবিকতা দেখিনি লোকটার

মাঝে।'

'হঠাৎ যে মত পাল্টাল, সেটাই তো অস্বাভাবিক।'

'তা ঠিক। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।'

রানাও পারছে না। কারণ ছাড়া একজন পুলিশ অফিসার এভাবে একটা গাড়িকে ছেড়ে দিতে পারে না, বিশেষ করে ড্রাইভার যখন সন্দেহজনক আচরণ করছে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও—কেউ কি ফলো করছে ওদেরকে? ব্যারিকেডে জ্বলতে থাকা লাল-নীল আলো দেখতে পেল, ম্লান হয়ে এসেছে দূরত্বের কারণে। কিন্তু না, কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না। ব্যাপারটা কী! খুঁতখুঁতানি বেড়ে চলেছে ওর।

রানার টেনশন বারবারার মাঝেও সংক্রামিত হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে? কোনও সমস্যা?'

আরও কয়েক সেকেণ্ড পেছনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। এরপর সোজা হয়ে বসল।

'আমি জানি না,' বলল ও।

রাত দুটো বাজার খানিক পরে মডেস্টোয় পৌঁছুল ওরা। রানার অনুরোধে শহরের প্রান্তে একটা সুপারশপের সামনে গাড়ি থামালেন বারবারা।

'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো,' বললেন তিনি। 'যা যা লাগবে, আমি নিয়ে আসছি। তোমরা গেলে লোকের চোখে পড়ে যেতে পারো।'

ছোট একটা লিস্ট ধরিয়ে দিল রানা। সেটা নিয়ে নেমে গেলেন বারবারা। ফিরে এলেন বিশ মিনিটের মাথায়। হাতে ছোট-বড় কয়েকটা ব্যাগ—তাতে শুকনো খাবার, ফ্ল্যাশলাইট, ব্যাটারি, ইত্যাদি টুকিটাকি নিয়ে এসেছেন। অ্যালির হাতের জন্যে নিয়ে এসেছেন অ্যান্টিসেপটিক জেল আর ব্যাণ্ডেজ। রানার জন্যে একটা বেসবল ক্যাপ আর একটা সানগ্লাসও

কিনে এনেছেন।

দশ মিনিট পর রেলস্টেশনে গেল ওরা। ট্রেন ধরে ফ্রেজনোয় ফিরবেন ভদ্রমহিলা। পার্কিং লটে গাড়ি থামিয়ে ফিরলেন ওদের দিকে।

'আমাকে যেতে হয়, সাবধানে থেকো।'

'নিশ্চয়ই, ডা. হোল্ডেন,' বলল রানা। 'আপনাকে আর ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করব না। আপনার উপকারের কথা কোনোদিন ভুলব না আমি।'

'থাক, ওভাবে বলতে হবে না। আমি তো ভারমুক্ত করলাম নিজেকে। তোমার জন্যে কিছু করতে পেরে মনটা হালকা লাগছে এখন।'

'তার জন্যে এত বড় ঝুঁকি না নিলেও পারতেন।'

'এ-কথাটা আমিও বলেছিলাম... সেবার তুমি যখন আমার জন্যে যখন ঝুঁকি নিয়েছিলে। শোধবোধ হয়ে গেল, কী বলো?'

রানার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে অ্যালি। ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন বারবারা। তারপর বললেন, 'খেয়াল রেখো ওর দিকে।'

'রাখব,' রানা বলল। 'ডাকব ওকে?'

'না, থাক। বিশ্রাম নিক। অনেক ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। আমি তা হলে আসি।'

দরজা খুললেন বারবারা। আর তখুনি চোখ মেলল অ্যালি। বলল, 'গুডবাই, ডা. হোল্ডেন।'

হাসলেন বারবারা। 'গুডবাই, মাই চাইল্ড।'

গাড়ি থেকে নেমে গেলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পরেই ফ্রিওয়ে ধরে দুরন্ত বেগে ছুটতে দেখা গেল পুরনো গাড়িটাকে। গন্তব্য: কোল্ড স্প্রিংস, ইউটাহ্। এলিয়াস ড্রাই লেকের সবচেয়ে কাছের শহর।

উনিশ

সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জাগল মাইকেল শেফার্ড। প্রাতঃকৃত্য সারল, স্টিম শাওয়ার নিল, এরপর বেরিয়ে এল বেডরুমের ব্যালকনিতে—সকালের প্রথম সিগারেটটা উপভোগ করার জন্যে। ওর বেডরুমটা উপত্যকার দিকে মুখ করা, পরিষ্কার চোখে পড়ছে তুষারে ছাওয়া পাহাড়ি দেয়াল, বাতাস মাথা কুটছে সে-দেয়ালে। ওপরে, প্রায়-আলোকিত হয়ে ওঠা আকাশের গায়ে মিটমিট করছে রাতের শেষ কিছু নক্ষত্র।

প্যাটিয়োর দরজা খুলে যাবার আওয়াজ পেল সে। নিচে তাকিয়ে অল্পবয়েসী মেয়েদুটোকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওখান দিয়ে—খিলখিল করে হাসছে, ফিসফাস করছে পরস্পরের কানে। জোরে কথা বললেও অবশ্য কিছু যেত-আসত না। বিদেশি একটা ভাষায় কথা বলে এরা, মাইকেল তার বিন্দুবিসর্গও বোঝে না। ওদের আসল নামও জানা নেই ওর... কেউ জানায়নি... নিজের সুবিধের জন্য দুটো ফুলের নামে ডাকে ওদেরকে—ডেইজি আর টিউলিপ। মেয়েদুটো কোনও আপত্তি করেনি তাতে।

সুইমিং পুলের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডেইজি আর টিউলিপ, অপেক্ষা করছে পানির ওপর থেকে থারমাল কাভার সরে যাবার জন্যে। দু'জনেরই পরনে সংক্ষিপ্ত টু-পিস বিকিনি—শরীরের ঐশ্বর্যগুলো ঢেকে রাখার বদলে প্রকট করে

তুলেছে আরও। সুইমিং পুলের আবরণ সরে যাবার ফাঁকে নিজেরাও নিরাবরণ হয়ে গেল। নিখুঁত দেহবল্লরী—ভোরের আলোয় ভিনাসের মূর্তির মত লাগছে ওদেরকে। কাভার সরে যাওয়ায় বাষ্প উঠতে শুরু করেছে পুলের উষ্ণ পানি থেকে, সাদা মেঘ যেন ঘিরে ধরছে নগ্ন দুই নারীকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে মুখ তুলে মাইকেলের দিকে তাকাল ওরা, আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে কটাক্ষ হানল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল মাইকেল, শিফট শুরু হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি, অনায়াসে যোগ দেয়া যায় ওদের সঙ্গে।

জীবন যে কত বিস্ময়কর মোড় নিতে পারে, তা ভাবা যায় না। মাত্র দেড় বছর আগে মাইকেল ছিল এক সামান্য লজিস্টিকস্ স্পেশালিস্ট... সোজা কথায় গুদামের কর্মচারী... রামাদি-র এক সাপ্লাই ডিপোয় কাজ করত ও। গুদামের বড় বড় মাকড়সা মারার পাশাপাশি ওর দায়িত্ব ছিল ইরাকে নিয়োজিত আমেরিকান বেসামরিক বাহিনীর সদস্যদের মাঝে টয়লেট পেপার, পটেটো চিপস্ আর কফি বিতরণ করা। সত্যিকার সামরিক বাহিনী ইরাক ছাড়ার পরেও এরা রয়ে গিয়েছিল ওখানে, দেশটার সম্পদ শুষে নেবার জন্যে। প্রতি সকালে পার্টিকেল-বোর্ডে তৈরি ছোট্ট হাউজিং ইউনিটে ঘুম ভাঙত ওর, অনুভব করত হতাশা। বয়স তেইশ পেরিয়ে চব্বিশের দিকে চলেছে; ওহায়য়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়া ডিপ্লোমাটা কয়েক হাজার মাইল দূরে, রচেস্টারে, নিজের বাড়ির দেয়ালে ফ্রেমবন্দি হয়ে শোভা পাচ্ছে, আর সে কিনা কলুর বলদের মত খেটে মরছে ইরাকের তপ্ত মরুভূমিতে! ভবিষ্যৎ কী তার? এভাবে লক্ষ্যহীনভাবে কতদিন ঘুরপাক খাবে সে?

পরিস্থিতিটা বদলে গেল পনেরো মাস আগে। রাতের বেলা ওর দরজার তলা দিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি ঢুকিয়ে দিয়ে

গেল কেউ। তাতে লেখা:

<u>সুবর্ণ সুযোগ!</u>

লোভনীয় বেতন।

চমৎকার আবাসস্থল (মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে)।

পরিবার-পরিজন থেকে অন্তত পাঁচ বছর বিচ্ছিন্ন থাকার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে।

যদি রাজি থাকেন তো যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়।

বিঃদ্রঃ কাজে যোগ দেবার আগে শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না মাইকেলের। ইরাকে দম আটকে আসছিল ওর, এ-অবস্থায় দূরে কোথাও থাকা-খাওয়াসহ ভাল বেতনের একটা কাজের সন্ধান পেলে সেটা অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই আসে না। একমাত্র সমস্যা হলো, পাঁচ বছর পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। তবে সেটাও বড় কোনও সমস্যা নয়। উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কারণে বহুদিন আগেই বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বছরপাঁচেক কারও দেখা-সাক্ষাৎ না হলে কেউ উতলা হয়ে উঠবে না, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কাজেই পরদিনই বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলো সে।

জায়গাটা ওদেরই কম্পাউণ্ডের শেষ মাথায়। পরিত্যক্ত একটা হ্যাঙার—নোংরা, বিবর্ণ, মেঝেটা শুকিয়ে থাকা তেল-গ্রিজের দাগে ভরা। পেছনের কামরায় যাবার একটা দরজা রয়েছে, কেউ ঢুকতে-বেরুতে গেলেই কামরার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল মাইকেল, সেটা নানা ধরনের ভারী, হাই-এণ্ড মেডিক্যাল ইকুইপমেণ্টে ভরা। এম.আর.আই. মেশিন জাতীয় একটা যন্ত্র চিনতেও পেরেছে বলে মনে হলো।

তবে পেছনের কামরায় যাবার আগে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। হ্যাঙারের ভেতরে চেয়ার-টেবিল রাখা হয়েছে, সেখানে বসে পরীক্ষা দিতে হলো ওকে—রিক্রুটিং প্রসেসের ভেতর ওটাই ছিল সবচেয়ে অদ্ভুত ধাপ। না, প্রশ্নগুলো জটিল ছিল না। সত্যি বলতে কী, ওসব প্রশ্নের সঠিক বা ভুল কোনও জবাবও হয় না। নিজের মত করে উত্তর দিতে হয়। যেমন, *তোমার বাড়িতে আগুন লেগেছে, এবং তোমার পোষা কুকুর ভেতরে আটকা পড়েছে। তুমি কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুকুরটাকে উদ্ধার করবে?* অথবা... *তোমার প্রিয় কোনও মানুষ নিশ্চিতভাবে মরতে চলেছে। যদি বলা হয়, তার বদলে আরেকজনকে সেখানে পাঠালে তোমার প্রিয় মানুষটি বেঁচে যাবে, তুমি কি কাউকে পাঠাতে রাজি হবে?*

টানা দু'দিন পরীক্ষা দিতে হলো এ-ধরনের প্রশ্নের ওপর। এরপর ওকে আলাদা করে নেয়া হলো বাকি সব প্রার্থীদের কাছ থেকে। বিশাল হ্যাঙারের এক কোণে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসানো হলো। বছর ত্রিশেক বয়সের এক যুবক বসল ঠিক ওর পেছনে, আরেকটা চেয়ার নিয়ে। একটা খাম দেয়া হলো ওকে। খাম খুলে বোকা বনে গেল। না, কোনও প্রশ্ন নয়। সাদা কাগজে লেখা হয়েছে কিছু নির্দেশ... অদ্ভুত সব নির্দেশ।

আগামী পাঁচ মিনিট গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করো, জীবনে সবচেয়ে খারাপ কোন্ কাজটা করেছ তুমি, যেটার কথা কেউ জানে না।

ভেবে দেখো, তুমি কি কখনও তোমার খুব কাছের কোনও মানুষকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দিয়েছ?

এর কোনও অর্থ খুঁজে পেল না মাইকেল। এ-ধরনের নির্দেশ দেবার মানে কী! ও যদি নির্দেশ না মানে... বসে বসে মাথার ভেতর গানের সুর ভাঁজে... সেটা কি আর জানতে

পারবে ওরা? বাস্তবে অবশ্য তেমন কিছু করল না ও। কৌতূহলের বশে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করল সবক'টা নির্দেশ—মনে মনে স্মরণ করল ওর জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়গুলো। অবাক ব্যাপার, কেন যেন ক্লান্তি ছেঁকে ধরল ওকে। কখনও কখনও টনটন করে উঠল মাথা, কিংবা কপালের দু'পাশ শিরশির করে উঠল।

এক ঘণ্টা চলল এই পরীক্ষা। এরপর পেছনে বসা যুবক উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করে কাকে যেন রিং দিল, কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল হ্যাঙার থেকে। বিশ মিনিট পর পেছনের কামরায় ডাক পড়ল মাইকেলের। পরের চার ঘণ্টা জুড়ে মেডিক্যাল চেকআপ করা হলো ওর—রক্ত-পরীক্ষা, এক্স-রে আর এম.আর.আই. থেকে শুরু করে যত ধরনের টেস্ট করা সম্ভব, সব। দিনশেষে... সন্ধ্যা যখন নামি নামি করছে, ওকে হ্যাঙারের লাগোয়া একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সামনে বসে রয়েছে মাঝবয়েসী দু'জন লোক। চেহারা, গলার স্বর... সবই ভীষণ রকম রসকষহীন।

'চাকরিটা যদি তুমি নাও,' বলল তাদের একজন, 'সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ নামে একটা কোম্পানির হয়ে কাজ করতে হবে। কিছু জানো ওদের সম্পর্কে?'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল। 'হ্যাঁ। নামকরা ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টর।'

'একটা ড্রাগের তিনটে ডোজ নিতে হবে তোমাকে। তার প্রথমটা... ছোট্ট একটা ট্যাবলেট... নিতে হবে আজ রাতেই।'

'আমাকে কি ড্রাগ ট্রায়ালের জন্যে বাছাই করা হয়েছে?'

'না।'

'কী করে ড্রাগটা?'

'ক্ষতিকর কিছু নয়। ওটার সত্যিকার উদ্দেশ্য তোমাকে পরে জানানো হবে। আর বিজ্ঞপ্তিটা আশা করি ভালমত

পড়েছ? পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যাপারটাতে আমরা খুবই সিরিয়াস। কোনও ফোন থাকবে না তোমার। ইণ্টারনেট অ্যাকসেস পাবে না। এমনকী চিঠি পাঠাবারও কোনও সুযোগ থাকবে না তোমার।'

'লোভনীয় বেতনটা কত, জানতে পারি?'

'বছরে দু'লাখ ডলার। চাইলে পুরোটাই জমাতে পারবে, কারণ তোমার থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা আমরা করছি। একটা পাই-পয়সাও খরচ হবে না তোমার।'

নিচু সুরে শিস দিয়ে উঠল মাইকেল। হেলান দিল চেয়ারে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের চুক্তিপত্র সই করতে হবে আমাকে?'

'কিছুই না,' কাটা কাটা গলায় বলল লোকটা। 'যে-কাজের জন্যে তোমাকে বাছাই করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গোপনীয়, মি. শেফার্ড। এতটাই গোপন যে, কাজটার তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও যদি তুমি বাইরের কাউকে জানাও, সঙ্গে সঙ্গে খুন করা হবে তোমাকে। তেমন কিছু ঘটলে আমরা চাই না কোনও পেপার ট্রেইল থাকুক।'

মাইকেলের মনে হলো, ঠাট্টা করছে লোকটা। এসব কথা এভাবে কেউ সরাসরি বলে নাকি! কিন্তু লোকটার হিমশীতল চোখের দিকে তাকাতেই থমকে গেল। বুঝল, এক বিন্দু মিথ্যে বলেনি সে।

চুপচাপ কয়েক মিনিট বসে রইল মাইকেল। তারপর পিঠ সোজা করে বসল। বলল, 'প্রথম ট্যাবলেটটা দিন।'

মজার একটা ঘটনা ঘটল সে-রাতে। নিজের হাউজিং ইউনিটে ফেরার খানিক পরেই এক ছেলে এসে মোটাসোটা একটা খাম দিয়ে গেল ওকে। খাম থেকে বেরুল একটা পুরু ফোল্ডার। মাইকেল ভাবল, জরুরি কোনও কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে বোধহয়। কিন্তু ফোল্ডারের পাতা উল্টে চক্ষু চড়কগাছ। অন্তত শ'খানেক রূপসী তরুণীর প্রোফাইল জড়ো

করা হয়েছে ওর ভেতর। সবার বয়স আঠারো থেকে বিশের মাঝে। তাদের দৈহিক বর্ণনা, শখ, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্যাদির তালিকা করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। সঙ্গে রয়েছে পাকা হাতে তোলা রঙিন ছবি—কাপড়-পরা, এবং কাপড়-ছাড়া... দু'রকমই। প্রতিটা মেয়েই যেন একেকটা ডানাকাটা পরী। নাম দেয়া হয়নি কারও, শুধু দেয়া হয়েছে পরিচিতিমূলক কোড নাম্বার।

একটা চিরকুট পাওয়া গেল ফোল্ডারের সঙ্গে। তাতে লেখা: *এখান থেকে দু'জনকে বেছে নাও। আগামীকাল সকাল আটটার ভেতর আমাদের রিক্রুটিং অফিসে ওদের কোড নাম্বার জানিয়ে দিয়ো।*

পরের সন্ধ্যায় একটা সি-সেভেনটিন ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফটে তোলা হলো মাইকেলকে। অজানার উদ্দেশে উড়াল দিল বিমানটা। যাত্রাপথের প্রায় পুরো সময়টাই ঝিমোল মাইকেল, কিংবা ঘুমাল। জেগে উঠল অচেনা এক কম্পাউণ্ডে ল্যাণ্ড করার পর। সেই থেকে এই কম্পাউণ্ডেই আছে ও, এটাই হয়ে উঠেছে ওর ঘরবাড়ি। জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা আজও জানতে পারেনি। চারপাশের দৃশ্য দেখে মনে হয়, কানাডার উত্তরে কোথাও হতে পারে। পুরোপুরি পাহাড়ি এলাকা, উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত যেন বেড়ার মত ঘিরে রেখেছে ওদের কম্পাউণ্ডকে। সারা বছর বরফে ছেয়ে থাকে পাহাড়গুলো... বিরাজ করে কনকনে ঠাণ্ডা।

বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে রাস্তাঘাটের কোনও সংযোগ নেই কম্পাউণ্ডে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রয়েছে কেবল ছোট্ট একটা এয়ারস্ট্রিপ—মাঝারি আকারের বিমান ওঠানামা করে ওখানে, নিয়ে আসে যাত্রী ও বিভিন্ন ধরনের মালামাল। এয়ারস্ট্রিপকে সাপোর্ট দেবার জন্যে আশপাশে গড়ে তোলা হয়েছে হ্যাণ্ডার, টাওয়ার ও কয়েকটা বিল্ডিং। সরু একটা রাস্তা আছে কম্পাউণ্ডের ভেতর—এয়ারস্ট্রিপ থেকে শুরু হয়ে

গাছপালার মাঝ দিয়ে এগিয়েছে; চক্রাকারে ঘুরে এসেছে পুরো উপত্যকার সীমানা, পথে সংযোগ ঘটিয়েছে পাহাড়ের দিকে মুখ করে বানানো ডজনখানেক বাড়ির মাঝে। মোটামুটি একশো গজ তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো; এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে উঁচু গাছপালার কারণে প্রাকৃতিক দেয়াল থাকে দু'পাশে... এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি দেখা না যায়।

বাতাস দিক বদলেছে। সুইমিং পুলের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে বাষ্পের মেঘ। ডেইজি আর টিউলিপকে দেখতে পেল মাইকেল—জলকেলিতে মত্ত। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল টিউলিপ। হাতছানি দিয়ে ডাকল। মৃদু হাসল মাইকেল, বড় করে একটা টান দিল সিগারেটে।

মাইকেল এখানে পৌঁছুবার পরদিন এসেছে মেয়েদুটো। এরাই যে সেই বাছাই করা মেয়ে, তা প্রথমে বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল ওরা ওরই মত দু'জন টেস্ট সাবজেক্ট। ফিরে তাকায়নি ওদের দিকে। ওর ভেতর তখন মুগ্ধতা খেলা করছিল বাড়িটা নিয়ে। বিজ্ঞপ্তিতে চমৎকার আবাসস্থলের কথা বলা হয়েছিল, তাই বলে সেটা যে এত দারুণ হবে, ভাবতে পারেনি। একদম নতুন একটা বাড়ি, দেয়ালের পেইন্ট আর নতুন কার্পেটের গন্ধ তখন পর্যন্ত মিলিয়ে যায়নি। আরাম-আয়েশের যে-ধরনের ব্যবস্থা আছে, তা শুধুমাত্র কোটিপতির বাড়িতে দেখা যায়। হিটেড পুল, হট টাব, এমনকী প্যাটিয়োর টাইলসের তলায়ও বসানো আছে ইলেকট্রিক্যাল কয়েল, যাতে তীব্র শীতেও প্যাটিয়ো ও সুইমিং পুলের আনন্দ উপভোগ করতে অসুবিধে না হয়। অত্যাধুনিক সারাউণ্ড সাউণ্ড সিস্টেম-সহ একটা হোম থিয়েটার আছে বাড়িতে। সওনা আছে। বিশাল কিচেনে রয়েছে সাব-যিরো ফ্রিজ। কিচেন কাউন্টারের ওপর বসানো আছে একটা টাচ-ডিসপ্লে, তাতে হরেক রকমের খাবারদাবারের তালিকা। সেখান থেকে একটা

হোক, বা দশটা হোক, খাবারের অর্ডার দিলেই আধঘণ্টার মধ্যে তা চলে আসে। তার জন্যে কোনও পয়সা দিতে হয় না। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না মাইকেল। এতসব খাতিরদারির বিনিময়ে কী করতে হবে ওকে, বুঝতে পারছিল না।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ সেভাবেই কাটল। কাজের ব্যাপারে পরিষ্কার কোনও ধারণা পাওয়া গেল না। চার্লটন নামে বুড়োমত একটা লোক আসত মাঝে মাঝে, মাইকেলকে কম্পাউণ্ডে থাকার নিয়মকানুন জানাত, প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিত... কিন্তু সেসব থেকে কিছুই বোঝা যায় না। চার্লটন তাকে জানিয়েছিল, ড্রাগের আরও দুটো ডোজ নিতে হবে ওকে—যথাসময়ে ওষুধটা পাঠিয়ে দেয়া হবে। মাইকেল যদি অ্যালকোহল বা মারিজুয়ানা ব্যবহার করতে চায় তো কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই—দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে বাড়িতে; তবে নেশাটা মাত্রাতিরিক্ত করা চলবে না। পরিমিত পরিমাণ অ্যালকোহল বা মারিজুয়ানা ব্যবহার করলে ড্রাগ ট্রায়াল বা আসল কাজটায় কোনও প্রভাব পড়বে না।

'সেই আসল কাজটা কী?' সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল মাইকেল।

'ও-নিয়ে এখুনি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই,' বলেছে চার্লটন। 'কয়েক সপ্তাহ পরের ব্যাপার ওটা। আপাতত নিজেকে মানিয়ে নাও নতুন পরিবেশের সঙ্গে। সময়টা উপভোগ করো। বাইরে বেরুলে মার্ক করা হাইকিং ট্রেইল পাবে, কাছের বিভিন্ন পাহাড়ে চড়া যায় ওগুলো ধরে। মেয়েদুটোকে নিয়ে ঘুরতে যেতে পারো। যদি প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কুশল বিনিময় করতে পারো, কিন্তু গপ্পো জুড়তে যেয়ো না। তোমার মত একই কাজে এসেছে ওরা, কিন্তু সেটা নিয়ে কোনও ধরনের আলোচনা করা যাবে না। ওদেরকেও একই নির্দেশ দিয়ে এসেছি

আমি।'

সেদিনকার আলোচনা চার্লটন শেষ করেছিল কিছুটা হেঁয়ালির সুরে। বলেছিল, 'বেজমেন্টে একটা ল্যাণ্ডফোন আছে, নিশ্চয়ই দেখেছ? ওটা আমার অফিসের সঙ্গে সরাসরি কানেক্ট করা, আর কোথাও নয়। রিসিভার তুলে বোতাম চাপলেই রিং চলে যাবে আমার কাছে। যদি কোনোকিছু জানার থাকে... যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে... নির্দ্বিধায় কল কোরো আমাকে।'

কথা শেষ করে চলে গিয়েছিল লোকটা।

পরের কয়েক সপ্তাহ চার্লটনের পরামর্শ মোতাবেক চলেছে মাইকেল। মাথা থেকে সমস্ত প্রশ্ন-ট্রশ্ন ঝেড়ে ফেলে উপভোগ করেছে সময়টা। শুরু থেকেই টের পেয়েছিল, কথা বলার সঙ্গী হিসেবে ডেইজি আর টিউলিপকে পাঠানো হয়নি ওর কাছে, পাঠানো হয়েছে স্রেফ মনোরঞ্জনের জন্যে। অচেনা এক ভাষায় কথা বলে দু'জনে, সম্ভবত পূর্ব ইয়োরোপের কোনও দেশের ভাষা... রোমানিয়ান হতে পারে—মেয়েদুটোর সঙ্গে টিভিতে দেখা রোমানিয়ান জিমন্যাস্টদের মিল পায় মাইকেল। অবশ্য, যে-দেশ থেকেই আসুক না কেন, তাতে কী এসে-যায়? বাক্য বিনিময় ছাড়াও ভাবের আদানপ্রদান হতে পারে, বিশেষ করে ওদের সম্পর্কটার সিংহভাগ যেহেতু শরীরী ভাষায় সম্পন্ন হয়।

ডেইজি আর টিউলিপকে নিয়ে খুব একটা অসুবিধে হয়নি মাইকেলের। সময় কাটানোর জন্যে নানা রকম কায়দা বের করে নিয়েছিল—ড্রিঙ্ক করা, তাস খেলা, হাইকিঙে বেরুনো, কখনও বা হোম থিয়েটারে তিনজনে মিলে সিনেমা দেখা... সবশেষে রাতে এক বিছানায় শোয়া—আদিমতম খেলায় মেতে ওঠা। আক্ষরিক অর্থেই ওর জীবন হয়ে উঠেছিল স্বপ্নের মত।

স্বপ্নিল জীবনটায় ছন্দপতন ঘটল একদিন। চার্লটন যার

আভাস দিয়ে গিয়েছিল, সেটা ঘটে গেল হঠাৎ করে। এতই সাদামাটাভাবে ঘটল, শুরুতে ব্যাপারটা ধরতেই পারল না মাইকেল। তিন নম্বর ট্যাবলেটটা খাওয়ার মাসখানেক পরের ঘটনা সেটা। ততদিনে ওষুধটার কথা ভুলে গেছে ও, আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, অন্য কোনোকিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঘটনাটা যখন ঘটল, তখন ও নেশার ঘোরে—মারিজুয়ানা টেনে বিছানায় পড়ে আছে। আচমকা ভারী হয়ে এল মাথা, মনে হলো দৃষ্টিভ্রম দেখা দিয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি দৃষ্টিভ্রমও নয়... কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু শুনতে পাচ্ছে দু'জন মানুষের কণ্ঠ। ভাল করে খেয়াল করতেই চিনতে পারল কণ্ঠদুটো—ডেইজি আর টিউলিপ... বরাবরের মত তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে চলেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এ-কারণে যে, ওরা কেউই কামরায় নেই। হ্যালিউসিনেশন হচ্ছে—এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিল মাইকেল, তবে মনে একটু খুঁতখুঁতানি রয়ে গেল। নেশা করছে বহুদিন, কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপার আগে কখনও হয়নি ওর। অবশ্য কখনও হয়নি বলে এখন হবে না, এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। সবকিছুরই প্রথম বলে একটা কথা আছে।

বিকেল নাগাদ টের পেয়ে গেল মাইকেল, ব্যাপারটা হ্যালিউসিনেশন নয়, অন্য কিছু। কিচেনে বসে ছিল সে, পাশে টিউলিপ, সম্পূর্ণ নেশামুক্ত অবস্থায়। হঠাৎ করে আবারও ভারী লাগল মাথাটা। টিউলিপের কণ্ঠ শুনল, এরপরেই চোখের সামনে ভেসে উঠল নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন দৃশ্য। অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল; দেখল, কিছু বলছে না সে, আনমনে একটা গাজর চিবুচ্ছে। এরপরেই মানসচোখে একটা পেপসির ক্যান দেখতে পেল মাইকেল। অবাক কাণ্ড... সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল টিউলিপ, ফ্রিজের কাছে গিয়ে একটা পেপসির ক্যান বের করল। মাইকেলের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে ভ্রূকুটি করল সে, ইশারায় জানতে চাইল, ওকেও

একটা পেপসি দেবে কি না। মাথা নাড়ল মাইকেল, কিচেন থেকে বেরিয়ে বেজমেন্টের দিকে রওনা হলো। চার্লটনের কাছে ফোন করতে হবে ওকে।

চুপচাপ সব শুনল লোকটা। এরপর শান্ত কণ্ঠে জানাল, মাইকেলের সন্দেহই ঠিক। সত্যিই মেয়েদুটোর চিন্তা শুনতে পেয়েছে ও, ওরা যা কল্পনা করেছে তা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে। হ্যাঁ, ট্যাবলেটগুলোর প্রভাবেই সেটা সম্ভব হয়েছে, এবং সদ্য-পাওয়া ক্ষমতাটা সাময়িক নয়, বরং চিরস্থায়ী। চার্লটন সেই সঙ্গে এ-ও জানাল, ব্যাপারটা স্রেফ মাইণ্ডরিডিঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ড্রাগটা ওকে আরও কিছু ক্ষমতা দিয়েছে, তবে সেগুলো কাজে লাগাতে হলে ট্রেইনিং নিতে হবে ওকে। পরদিন সকাল থেকে শুরু হবে সেই ট্রেইনিং।

'আর কী ক্ষমতা?' জানতে চেয়েছিল মাইকেল।

'সহজ করে বলি। মানুষের চিন্তাভাবনাকে রেডিয়ো সিগ্‌নালের মত করে ভাবো। তোমার ভেতর ওই সিগনাল শুধু রিসিভ নয়, ট্রান্সমিট করারও ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।'

'মানে কী? ওদের মাথায় আমি নিজের চিন্তাভাবনা ঢুকিয়েও দিতে পারব?'

'তারচেয়েও বেশি। তুমি ওদের ভেতর আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারবে—হাসি, কান্না, আনন্দ, ব্যথা, ঘৃণা, ভালবাসা, অপরাধবোধ... যা-খুশি-তাই!'

'এসব করে লাভ কী?'

'লাভ আছে। মানুষ পরিচালিত হয় তার আবেগ-অনুভূতি দিয়ে, তাই না?'

আচমকা চরম সত্যটা অনুধাবন করল মাইকেল, যেন কেউ একটা ধারাল কাঁচ ধরিয়ে দিয়েছে তার হাতে।

'আমি তা হলে একটা অস্ত্র?' বলল ও। 'মানুষের মাথায় গোলমাল পাকানোর জন্যে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবেন

আপনারা?'

'তা-ই করবে তুমি, তবে তার জন্যে কোথাও যাবার প্রয়োজন পড়বে না।'

ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে পরের কয়েকটা সপ্তাহের কথা স্মরণ করল মাইকেল। প্রাথমিক ট্রেইনিং... নিজের সত্যিকার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া... ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বোঝা। মাইণ্ডরিডিংটা সবার বেলায় কাজ করছিল, কিন্তু বাকিটা কাজ করছিল স্রেফ অল্প কিছু মানুষের ওপর। এর জন্যে যে-ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা রীতিমত ভীতিকর। চার্লটন স্বীকার করেছে, টেকনোলজিটা কীভাবে কাজ করে, সেটা তারও জানা নেই। ওটা ডেভেলপের দায়িত্বে রয়েছে কোম্পানির একদল প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার—দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতি সংগোপনে কাজ করে চলেছে তারা, হয়তো এখানকারই মত একেকটা কম্পাউণ্ডে, তাদের নিজস্ব ডেইজি আর টিউলিপদের নিয়ে। ইকুইপমেন্টগুলোর কার্যকারিতা দেখার সুযোগ হয়েছে মাইকেলের, তবে এখনও... কাজ শুরু হবার এক বছর পরেও... পুরো প্রজেক্ট রয়ে গেছে এক্সপেরিমেন্টাল বা বিটা পর্যায়ে। অবশ্য খুব দ্রুত এগোচ্ছে সবকিছু, মাঝে মাঝে মাইকেলের মনে হয়, প্রজেক্টের কিছু কিছু বিষয়ে এখনও অন্ধকারে রাখা হয়েছে ওকে।

কেঁপে উঠল মাইকেল। ঠাণ্ডা বাতাস, আর কিছু না—নিজেকে প্রবোধ দিল ও। মানসিক কোনও পীড়া নেই ওর মাঝে। বিবেকের সঙ্গে অনেক আগেই সমঝোতা করে নিয়েছে ও, প্রথমদিনের সেই টেলিফোনটার সময়। চার্লটন সাহায্য করেছিল তাতে।

লোকটা বলেছিল, 'চাইলে সময় নিয়ে ব্যাপারটা ভালমত ভেবেচিন্তে দেখতে পারো। এ-মুহূর্তে ধাক্কা খাওয়া অবস্থায় আছ তুমি, হয়তো বা কিছুটা বিচলিত, তবে সেটাই

স্বাভাবিক। আমি চাই, ওপরে গিয়ে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করো। এই বাড়ি... সুন্দরী দু'জন সহচরী... স্বীকার তো করবে, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেলায় আমরা কোনও কার্পণ্য করিনি?'

'জী... জী, মি. চার্লটন। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' কথাটা তড়িঘড়ি করে বলেছিল মাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল, তখন পর্যন্ত চার্লটনকে ধন্যবাদ জানায়নি সে... কাউকেই জানায়নি। কী আশ্চর্য, এতটা অকৃতজ্ঞ ও হলো কী করে! 'স্যর, বলে বোঝাতে পারব না, আমি কতটা কৃতজ্ঞ। আরও আগেই ধন্যবাদ জানাইনি বলে ক্ষমা চাইছি...'

'ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, মাইকেল। মন দিয়ে আমার কথা শোনো। যে-কাজ তুমি করতে চলেছ, তা সহজ নয়। খারাপ কাজ করতে হবে তোমাকে—এমন সব মানুষের সঙ্গে, যারা হয়তো নির্দোষ, নিরপরাধ। এসব প্রাপ্য নয় তাদের। তারপরেও করতে হবে। আমাদেরকে সাহায্য করবে তুমি, ঠিক যেভাবে আমরা তোমাকে সাহায্য করেছি। ঠিক আছে?'

'জী, স্যর।'

'যখন খুব খারাপ লাগবে, এই বাড়িটার কথা ভেবো... দুই বান্ধবীর কথা ভেবো। মনে রেখো, আমাদের কথামত না চললে সব হারাতে হবে তোমাকে।'

'আমি হারাতে চাই না, স্যর।'

'আরেকটা কথা মনে রেখো: যা ঘটতে চলেছে, তার জন্যে তুমি দায়ী নও। তুমি না চাইলেও ওসব ঘটবে। তুমি না করলে অন্য কাউকে দিয়ে ওগুলো করিয়ে নেব আমরা। কাজেই যেটা ঠেকানোর উপায় নেই, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ কী? তারচেয়ে ওতে যোগ দিয়ে নিজেকে লাভবান করে তোলাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি?'

'না, স্যর। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা।'

'গুড।'

সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। গোড়াটা পায়ের তলায় ফেলে মাড়িয়ে ফেলল মাইকেল। নিচে তাকাল। পুলের অগভীর অংশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চুমো খাচ্ছে ডেইজি আর টিউলিপ। শরীরের উত্তাপ টের পেল ও। চুলোয় যাক সব চিন্তাভাবনা। কোনও অপরাধবোধ নেই ওর মাঝে। ব্যালকনি পেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল—শার্ট খুলতে খুলতে।

বিশ

রানা আর অ্যালি যখন কোল্ড স্প্রিংসে পৌঁছুল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্যের তাপে ঝিমাচ্ছে পুরো শহর। রাস্তায় মানুষ আর যানবাহন নেই বললেই চলে। শহরের মূল রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে সার বাঁধা ছোট ছোট দোকান, গ্যাস স্টেশন আর ফাস্ট ফুড শপ। সবই পুরনো, বিবর্ণ। আধ মাইল পুবে পার্বত্য এলাকা—ঢেউ খেলানো পাহাড়সারির আড়ালে ঢাকা পড়েছে দিগন্ত, পাহাড়ের চূড়ায় ঝোপঝাড় আর পাইনের অরণ্য। বাকি দিকগুলোয় যতদূর চোখ যায়, পুরোটাই সমতল মরুভূমি।

শহরে থামল না রানা, একটা পার্শ্বরাস্তা ধরে পৌঁছুল পূর্ব প্রান্তে। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল ওখানে—একটা কাঁচা রাস্তা, পাহাড়ের দিকে গেছে। ওটা অনুসরণ করে একটু পরেই একটা পাহাড়ি চাতালে উঠে গেল ওরা, থামল অবশেষে। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে নজর বোলাল রানা।

সমতল থেকে মোটামুটি দু'শো ফুট ওপরে উঠে এসেছে ওরা, ইউ.এস. ফিফটি হাইওয়ের মোটামুটি বিশ মাইল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার—এঁকেবেঁকে নেভাদা আর ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। কোল্ড স্প্রিংসের মূল সড়কটাও দেখতে পাচ্ছে, শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরিয়েছে ওটা। ওদিকেই, পাঁচ মাইল দূরে, ধুলোময় মরুভূমির মাঝখানে রয়েছে এলিয়াস ড্রাই লেক। চোখ পিট পিট করল রানা, লেকটা দেখা যায়, কিন্তু টাওয়ারটা দেখতে পেল না চোখ ঝলসানো রোদের কারণে।

ঝুঁকে গাড়ির কনসোল থেকে একটা কলম নিল রানা। অ্যালিকে বলল, 'তোমার হাতটা দেখি?'

নিঃশব্দে হাত বাড়াল অ্যালি। ওর হাতের তালুতে একটা ফোন নাম্বার লিখল রানা, সেই সঙ্গে একটা নাম—ববি মুরল্যাণ্ড।

'কে ইনি?' জানতে চাইল অ্যালি।

'আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। নুমা নামে একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।'

ঘুরে পাহাড়ের ঢালটা দেখল রানা—আরও দু'শো ফুট উঠে গিয়ে চূড়ায় মিশেছে।

'তোমাকে আপাতত সঙ্গে নিচ্ছি না আমি,' অ্যালিকে বলল ও। 'ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপরদিকে উঠে যাও, লুকিয়ে পড়ো গাছপালার ভেতরে। লেকের দিকে নজর রেখো। আমি ওখানে পৌঁছুবার পর যদি কিছু ঘটে... মানে, কোনও হেলিকপ্টার বা গাড়ি উদয় হয়... তা হলে শহরে গিয়ে কোনও একটা দোকান থেকে ওই নাম্বারটায় ফোন কোরো, ববি তোমাকে সাহায্য করবে।'

ইউটাহ্ আসার পথে সারাক্ষণই রেডিয়োর খবর শুনেছে ওরা। বলা বাহুল্য, সেখানে রানাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ক্রমাগত ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। কোনও এক বিচিত্র কারণে

অ্যালির কথা বলা হয়নি, কোনও বর্ণনাও দেয়া হয়নি ওর। রানা আন্দাজ করছে, ওকে লাইমলাইটে আনতে চাইছে না লিয়ারি। ওর কথা যদি সারা দেশের মানুষ জেনে যায়, তা হলে মেয়েটাকে গুম করা কঠিন হয়ে পড়বে। সম্ভবত সেজন্যেই এই কৌশল। একদিক থেকে ব্যাপারটা ভাল হয়েছে রানার জন্যে। লোকে নিঃসঙ্গ একজন বোমাবাজকে খুঁজছে, কিশোরীসহ কোনও যুবককে নয়। তাই অ্যালিকে দেখলে রানার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাচ্ছে না কেউ।

'ববিকে ফোন করে তুমি তোমার নাম বলবে,' বলল ও। 'বলবে, রানা অনুরোধ করেছে, ও যেন এসে তোমাকে উদ্ধার করে। সবশেষে একটা শব্দ বলবে: সিলভারফিন।'

'ওটা আবার কী?' জানতে চাইল অ্যালি।

'একটা কোড। ববি আর আমার মধ্যে ঠিক করা। আর কেউ সেটা জানে না। শব্দটা বললে ববি বুঝতে পারবে, মেসেজটা সত্যিই আমি পাঠিয়েছি, অন্য কেউ নয়।'

'এসবের কি কোনও প্রয়োজন আছে? আমাকে সঙ্গে নিতে চাইছ না কেন?'

'সতর্কতা,' বলল রানা। 'ওখানে যদি কোনও ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে, আমি চাই না তুমি তাতে ধরা পড়ো।'

'কিন্তু তুমি তো ধরা পড়বে!'

'ওটুকু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সব যদি ঠিকঠাক থাকে, তখন নাহয় তোমাকে নেবার কথা ভাবা যাবে।'

হাতের তালুতে লেখা নাম্বারটার দিকে তাকাল অ্যালি। ওর চেহারায় দ্বিধা।

'ওটা স্রেফ ব্যাকআপের জন্যে,' রানা বলল। 'আমি মনেপ্রাণে চাইছি, ববিকে যেন তোমার ফোন করতে না হয়।'

'আমিও তা-ই ভাবছি।'

গাড়ি নিয়ে রওনা হলো রানা। শহর পাড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল

মরুভূমিতে। কাছাকাছি যাবার পরেও বোঝা গেল না, ঠিক কোথায় মরুভূমি শেষ হয়েছে আর লেকটা শুরু হয়েছে। বাতাসের ক্রমাগত অত্যাচারে ক্ষয়ে গেছে লেকের পাড়, হয়ে গেছে মসৃণ। এক পর্যায়ে ধীরে ধীরে ভূমির গভীরতা বাড়তে শুরু করায় রানা অনুমান করল, লেক-বেডে পৌঁছে গেছে। মাটি এখানে অনেক মসৃণ, গাড়ি তেমন একটা ঝাঁকি খাচ্ছে না। আশপাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মরুর ঝোপঝাড়।

টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে এখন। স্টিলের তৈরি একটা স্ট্যাণ্ডার্ড কাঠামো—তার টেনে মাটির সঙ্গে বাঁধা, ওগুলোই খাড়া অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে টাওয়ারটাকে। আশপাশে কোনও গাছ বা বাড়িঘর না থাকায় উচ্চতা আন্দাজ করা কঠিন। রানার মনে হলো, দু'শো ফুটের কম হবে না। দূর থেকে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ছে না। তবে কাছে গিয়ে বদলে গেল ধারণাটা।

গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল রানা। ট্রান্সমিশন টাওয়ার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ওর আছে। বহুবার এ-ধরনের টাওয়ারে চড়তে হয়েছে ওকে—গোপন ট্রান্সমিটার বসানোর জন্যে। অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের সাহায্য পেয়েছে প্রতিবার, সেই সঙ্গে লাভ করেছে জ্ঞান। তাই ড্রাই লেকের টাওয়ারটার ত্রিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই বুঝল, গড়বড় আছে ওটায়।

টাওয়ারের একটা পায়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। স্টিলের ফ্রেমটা স্বাভাবিক—ছোট ছোট পাত দিয়ে ট্রায়াঙ্গুলার ক্রস-ব্রেসিং করা হয়েছে কাঠামোটা মজবুত করার জন্যে; ঝালাই করা জয়েন্টগুলোয় রয়েছে কপার কানেক্টর, যাতে কণ্ডাক্টিভিটি বাড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য টাওয়ারের মত এটারও একটা পায়ের ভেতরদিকে বসানো হয়েছে ধাতব টিউব, যার ভেতর দিয়ে গেছে নানান ধরনের কেইবল। টিউবটা ঝড়বাদলের হাত থেকে রক্ষা করছে কেইবলগুলোকে। সাধারণত অ্যালিউমিনিয়াম বা স্টিলের তৈরি টিউব লাগানো হয়

টাওয়ারগুলোয়, কিন্তু এই বিশেষ টাওয়ারের টিউবটা অন্য ধাতুর তৈরি। কাছে গিয়ে পরখ করে দেখল রানা, পরক্ষণে ভুরু কুঁচকে গেল। ধাতুটা ইউরেনিয়াম—তেজস্ক্রিয়তামুক্ত। মিলিটারি ট্যাঙ্কের আর্মার তৈরি হয় এ-ধাতু দিয়ে।

পিছিয়ে এসে টিউবটার শেষ প্রান্ত দেখার চেষ্টা করল ও। টাওয়ারের অর্ধেক উচ্চতায় পৌঁছে শেষ হয়েছে ওটা, মিলেছে একটা কালো সিলিণ্ডারের সঙ্গে। জিনিসটা দেখতে অনেকটা মদের পিপের মত, তবে আকারে অন্তত পাঁচ গুণ বড়। কোনও রেডিয়ো টাওয়ারে এ-ধরনের জিনিস আগে দেখেনি রানা। কী ওটা কে জানে, তবে থমকে থাকা পরিবেশে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে ওখান থেকে ভেসে আসা মৃদু গুঞ্জন।

আর কিচ্ছু নেই টাওয়ারটায়। না আছে সেলুলার ট্রান্সিভার, না আছে কোনও মাইক্রোওয়েভ রিলে। আছে স্রেফ ওই অদ্ভুত কালচে সিলিণ্ডারটা। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানা টের পেল, গুঞ্জনটা শুধু সিলিণ্ডার থেকে নয়, আসছে টাওয়ারের পুরো শরীর থেকে। বিশাল ধাতব কাঠামোটা যেন একটা টিউনিং ফর্কের মত কাঁপছে। এমনকী পায়ের তলার জমিনেও ছড়িয়ে পড়ছে সেই কম্পন।

অ্যালিকে নিয়ে আসবে কি আসবে-না, ভাবছে রানা। এনে কোনও লাভ আছে কি? কী-ই বা বুঝবে মেয়েটা? বেকারস্‌ফিল্ডে সাধারণ একটা টাওয়ার দেখে যেভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তাতে শঙ্কাও জাগে। আসল টাওয়ারটার কাছে এলে হয়তো বা আরও সিরিয়াস কোনও প্রতিক্রিয়া হবে।

আসার জন্যে জোরাজুরি করতে পারে মেয়েটা। রানা মানা করে দিতে পারে... কিন্তু তারপর কী করবে? সত্যি বলতে কী, কিছুই করার নেই। যতক্ষণ না নতুন কিছু জানতে পারছে, এগোবার মত কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না রানা। এর অর্থ, অ্যালিকে নিয়ে আসতে হবে টাওয়ারের কাছে।

গাড়ির কাছে ফিরে গেল রানা, কিন্তু ভেতরে ঢুকল না।

অ্যালিকে যদি আনতেই হয়, তার আগে ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত কোনও বিপদ ঘটেনি, তাই বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না ও। টাওয়ারের ওপর শত্রুরা নজর রাখছে কি না, শিয়োর হওয়া দরকার।

আকাশের দিকে মুখ তুলল রানা, ওভাবে একটু হাঁটল। মনে হতে পারে, আকাশে কোনও বিমান আছে কি না দেখছে, আদপে ব্যাপারটা তা নয়। কেউ যদি এদিকে একটা স্যাটেলাইট তাক করে থাকে, সেটায় নিজের চেহারা দেখাল ও। আজকালকার স্যাটেলাইটগুলোর ক্যামেরা অত্যন্ত উন্নত ও শক্তিশালী। ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখার মত ভাল ছবি হয়তো উঠবে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাবে, তাতে ওর চেহারা চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় কারও। শত্রুদের প্রতিক্রিয়াই বুঝিয়ে দেবে, সত্যিই টাওয়ারটা নজরদারির ভেতর আছে কি না।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা। শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা।

এক ঘণ্টা কাটল। কিছুই ঘটল না।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। কপালের কাছে হাত রেখে চোখ বোলাল চারদিকে। না, কোনও হেলিকপ্টার উড়ছে না। ছুটে আসছে না পুলিশ বা অন্য কোনও বিশেষ বাহিনীর গাড়ি। নিথর হয়ে আছে প্রকৃতি। কিছু ঘটার হলে এতক্ষণে ঘটে যেত। এক ঘণ্টায় লিয়ারিরর মত লোকের পক্ষে ছোটখাট একটা বাহিনী পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব আমেরিকার যে-কোনও প্রান্তে। অ্যালি রানার সঙ্গে নেই বলে কিছু করছে না, এমনটা ভাবারও অবকাশ নেই। কারণ সেটা জানার কোনও কায়দা নেই লিয়ারিরর। রাতের বেলায় গাড়ির কাঠামো ভেদ করে আরোহীদের হিট সিগনেচার ডিটেক্ট করতে পারে তার স্যাটেলাইট, কিন্তু এই ভরদুপুরে... যখন রোদের তাপে পুরো গাড়ি আগুনের মত তেতে উঠেছে, তখন গাড়ির ভেতর

মেয়েটা আছে কি নেই, তা নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যে-কোনও কারণেই হোক, টাওয়ারের ওপর নজর রাখছে না শত্রুরা। অ্যালিকে ওটা দেখাবার ঝুঁকিটা নেয়া যেতে পারে। গাড়িতে আবার উঠে বসল রানা, চালু করল ইঞ্জিন।

পাহাড়ি চাতালটায় পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। গাড়ি থামাতেই ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল অ্যালি, উঠে বসল পাশে। চেহারায় স্বস্তি।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বলার মত কিছু না,' রানা মাথা নাড়ল। 'অন্তত আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে দেখালে হয়তো...'

'হ্যাঁ, দেখাব। তবে বেশি সময় নেয়া যাবে না। টাওয়ারটার কাছে যাবার পর ঠিক দু'মিনিট সময় পাবে তুমি, এরপরেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব আমরা। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

যাত্রার প্রথম তিন-চার মাইল... মানে, টাওয়ারটা দৃষ্টিসীমায় উদয় হবার আগ পর্যন্ত... আনন্দ ছাড়া আর কিছু অনুভব করল না অ্যালি। এই আনন্দ রানাকে ফিরে পেয়েছে বলে... পাহাড়ি জঙ্গলে একাকী লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে না বলে। যদিও খুব বেশি সময়ের জন্যে ওখানে থাকতে হয়নি অ্যালিকে, তারপরেও অভিজ্ঞতাটা সুখকর ছিল না ওর জন্যে। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল দুশ্চিন্তা, ভয় আর উদ্বেগ। কেমন যেন হিম হয়ে আসছিল শরীর। অথচ রানাকে দেখা মাত্র কেটে গেছে সবকিছু!

অদ্ভুত এক মানুষ এই মাসুদ রানা। ওর দিকে তাকালেই ভরসা পায় অ্যালি, সাহস পায়। কেন, তা জানে না। মানুষটার মন পড়তে পারে অ্যালি, কিন্তু তারপরেও তাকে

পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। শক্ত এক খোলসের ভেতর যেন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে রানা, সেখানে অন্তর্যামীরও প্রবেশাধিকার নেই। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারে অ্যালি, এই মানুষটাকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। যত ঝড়-ঝাপটা আসুক, যত বিপদ আসুক... রানা ওকে আগলে রাখবে, রক্ষা করবে—পিতার মত, ভাইয়ের মত, বন্ধুর মত।

এসব নিয়েই ভাবছিল অ্যালি, হঠাৎ সামনে ভেসে উঠল টাওয়ারের আবছা কাঠামো। সঙ্গে সঙ্গে হাসি-খুশি ভাবটা দূর হয়ে গেল ওর ভেতর থেকে, সে-জায়গা দখল করল ভয় আর অনিশ্চয়তা। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল বেকারস্‌ফিল্ডের টাওয়ারটা দেখে।

ওর পরিবর্তনটা লক্ষ করেছে রানা। জিজ্ঞেস করল, 'উল্টো ঘুরব?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। জোর করে তাড়াতে চাইছে ভয়। 'না,' সংক্ষেপে বলল ও।

গাড়ি থেকে নামতেই মাটির কম্পন অনুভব করল অ্যালি। জুতোর তলা ভেদ করে উঠে আসছে যেন কম্পনটা—পা বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

'খারাপ লাগছে?' ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'ন্... না। আমি ঠিক আছি।'

কালো সিলিণ্ডারটার ওপর দৃষ্টি আটকে গেছে অ্যালির। এমনিতেই টাওয়ারটা দেখে ভয় করছে ওর, সিলিণ্ডারটা যেন আরও বেশি ভীতিকর। বড় করে শ্বাস নিল ও। মনে হলো ফুসফুস ঠিকমত বাতাস পাচ্ছে না। টাওয়ারের গোড়া লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল। দুনিয়া যেন দুলছে চোখের সামনে। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল—ফেলে

আসা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কেউ ধাওয়া করে আসছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। ওকে ডাকল না অ্যালি। এ-কাজটা ওকে একাই করতে হবে।

কী করতে হবে, তা জানে অ্যালি। কীভাবে জানে, তা বলতে পারবে না। হতে পারে এটা আরেকটা কণ্ডিশনাল রেসপন্স। কাজটা করতে একদম ইচ্ছে করছে না ওর, কিন্তু কোনও উপায় নেই। অজানা এ-ভয়কে জয় করতেই হবে ওকে। গত দু'মাস থেকে ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পেতে হবে। তাই সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে চলল ও। টাওয়ারের একদম তলায় গিয়ে থামল। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হাত রাখল ওটার গায়ে।

মাটির কাঁপুনি এতক্ষণ গুঞ্জন তুলছিল অ্যালির কানে, কিন্তু এবার যেন সেটা লাউডস্পিকারের আওয়াজে পরিণত হলো। সারা শরীর কেঁপে উঠল ওর। অস্থিমজ্জা বুঝি থরথর করছে! নিজের অজান্তেই শব্দ করে উঠল ও—ফুঁপিয়ে উঠল... আর্তনাদ করল। রানার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল পরক্ষণে। ছুটে আসছে ওর দিকে। কী করতে চাইছে, তা পড়ে নিতে অসুবিধে হলো না। কাছে এসে ওকে সরিয়ে নিতে চাইছে টাওয়ারের পাশ থেকে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যালি।

পেছনে এসে থেমে গেল রানা। পায়ে পায়ে চলে এল ওর পাশে।

'অ্যালি...'

মাথার ভেতর অদ্ভুত একটা চিন্তা উদয় হলো অ্যালির। বুঝতে পারল, নড়াচড়া করা চলবে না ওর। এভাবেই টাওয়ারের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ না কিছু ঘটছে। চিন্তাটায় বিস্মিত হলো ও। মানে কী এর? কী ঘটবে?

'অ্যালি?' আবার ডাকল রানা।

‘কিছু করতে যেয়ো না,’ ওকে বলল অ্যালি। ‘আমি ঠিক আছি।’

কী যেন বলল রানা, ঠিক শুনতে পেল না। চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে রৌদ্রালোকিত মরুভূমি, যেন হাজারো কণ্ঠস্বর আর ছবিতে ভরা নতুন দুনিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে ও। নানা ধরনের ছবি ভাসছে অ্যালির চোখের সামনে—মানুষ, পোষা কুকুর, গাড়ি, ঘরবাড়ি...

একটা ঝাঁকি খেল অ্যালি। ছবিগুলো কীসের, বুঝতে পারছে। কয়েক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শহরটার বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে প্রতিটা ছবিতে। ওখানকার অধিবাসীদের ভাবনাচিন্তাই ছবি হয়ে ধরা দিচ্ছে ওর চোখে। কণ্ঠগুলোও তাদের। সবার চিন্তা একজোট হয়ে বাজছে ওর কানে। মনে হচ্ছে যেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও।

রানার দিকে চোখ পড়ল অ্যালির—ঠোঁট নড়ছে ওর... কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোল্ড স্প্রিংসের বাসিন্দাদের চিন্তাভাবনার হল্লার মাঝে মিলিয়ে গেছে ওর কণ্ঠ। এক মুহূর্ত পর রানাও হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। নতুন দৃশ্য ভেসে উঠেছে অ্যালির সামনে। ঘোলা চোখে তাকাল মাটির দিকে—ওখানে যেন একটা ট্র্যাপডোর খুলে গেছে, উন্মুক্ত হয়ে গেছে একটা সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়ল অ্যালির দৃষ্টি, মেইল ট্রেনের মত ছুটছে ভেতর দিয়ে। চারপাশে নানা ধরনের কেইবল—খড়খড় করে উঠছে, গুঞ্জন করছে... ঠিক টাওয়ারের ওপরে লাগানো কালো সিলিণ্ডারটার মত। হঠাৎ থমকে গেল অ্যালি।

কে যেন রয়েছে সামনে... সুড়ঙ্গের ও-মাথায়... আরেকজন মানুষ!

মানুষটার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার পড়তে পাচ্ছে অ্যালি, দেখতে পাচ্ছে তার মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকা

ছবিগুলো। তুষারে ছাওয়া উঁচু-নিচু পাহাড়... একটা সুইমিং পুল.... সাঁতার কাটতে থাকা দুটি নগ্ন মেয়ে... কম্পিউটার আর নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে ভরা বিশাল একটা কামরা...

'দুই নম্বরের মড সিগনালে গোলমাল দেখতে পাচ্ছি,' বলে উঠল লোকটা। *'আরে! এ কী!'*

ভীষণভাবে চমকে উঠেছে মানুষটা। ভয় পেয়ে গেছে।

'হচ্ছে কী এসব? অ্যাই, কেউ মি. চার্লটনকে ডাকো! তাড়াতাড়ি!'

সুড়ঙ্গ ধরে পিছিয়ে এল অ্যালি। এবার নতুন একটা জায়গায় চলে এসেছে। সরু একটা গলি, সামনে একটা দরজা। চোখ পিটপিট করল ও। বুঝল, এটা ওর নিজের মনের অভ্যন্তর। দরজার ওপাশে রয়েছে বিশাল একটা কামরা, সেখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা আছে ওর সব স্মৃতি। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওখানে ঢোকার পথ রুদ্ধ। সাদাটে পর্দার মত কী যেন টানটান হয়ে ঝুলছে দরজায়—বাধা দিচ্ছে কামরায় ঢুকতে বা বেরুতে। অ্যালির চোখের সামনেই পর্দাটা ফুলে উঠল, যেন ভেতর থেকে কেউ ঠেলছে ওটা... পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

স্মৃতি... স্মৃতিদের কাণ্ড। ওরা মুক্তি চাইছে! অ্যালির মনে হলো, টাওয়ারটাই যেন ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে ওদের। বেরিয়ে আসার তাগিদ দিয়েছে। ঝাঁকুনিটা এখনও অনুভব করছে ও। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

কাঁধে রানার স্পর্শ টের পেল অ্যালি—ওকে টানছে রানা, সরিয়ে আনতে চাইছে টাওয়ারের পাশ থেকে। হাতের মুঠো শক্ত করল ও, ছাড়া পেতে চাইছে না, আরেকটু সময় চাই ওর। সাদা পর্দাটার গায়ে আঁচড় পড়তে দেখছে ও, কী যেন বেরিয়ে আসতে চলেছে ওখান দিয়ে। আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোয়—ছিঁড়ে গেছে পর্দা। আলোটা কমে গেলে নতুন একটা চেহারা দেখল অ্যালি। সুন্দরী এক নারী—গায়ে

সাদা অ্যাপ্রন, চোখে মমতা, ঠোঁটের কোণে হাসি।

'হ্যালো, অ্যালি! কেমন আছ আজ?' বলল সেই নারী।

একে চেনে অ্যালি। কী যেন নাম? মনের গভীরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে শুরু করল।

রানার গলা আবছাভাবে শোনা গেল। ওকে টানছে সে, টাওয়ার থেকে হাত সরাতে বলছে। গলার স্বরে উদ্বেগ আর আকুতি। আর তখুনি মনে পড়ল নামটা।

টিফানি। সুন্দরী ওই যুবতীর নাম টিফানি।

শুধুই টিফানি? না, তা নয়। আর কিছু আছে তার পরে। কী সেটা? একে কোথায় দেখেছে ও? ভাবার চেষ্টা করল। দরজাটা আবার দেখতে পাচ্ছে সামনে। পর্দাটা আছে, তবে মাঝখানটা ছিঁড়ে দিয়েছে কে যেন। পা বাড়াল ও। পর্দা পেরিয়ে ঢুকতে শুরু করল কামরায়। খিঁচুনি উঠল ওর শরীরে, কিন্তু থামল না। এগিয়ে চলল প্রাণপণে।

নিজের হাতে রানার হাতের ছোঁয়া পেল অ্যালি, ওর আঙুলগুলো ছাড়িয়ে আনছে টাওয়ারের গা থেকে। পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা এক টানে পেছনে ছিটকে পড়ল ও। খিঁচুনি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, যেন বিদ্যুতের একটা সুইচ অফ করে দেয়া হয়েছে। চোখের সামনে থেকে সরে গেল সব অপার্থিব দৃশ্য, টাওয়ারের পাদদেশে পড়ে রয়েছে ও—ওকে জাপটে ধরে রেখেছে রানা।

'অ্যালি! কী হলো তোমার? তুমি ঠিক আছ?'

উঠে বসল অ্যালি। ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো। ফিসফিসিয়ে বলল, 'টিফানি... টিফানি ক্যানট্রেল।'

'কী!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না অ্যালি। মনে মনে সবকিছু সাজিয়ে নিচ্ছে ও—সব চিন্তা... সব স্মৃতি—যেন লাইব্রেরির তাকে সাজিয়ে রাখছে এলোমেলো একগাদা বই। ওর মনে পড়ে গেছে, কোথায় শুনেছে ওই নাম।

একুশ

ত্রিশ সেকেণ্ড আগ পর্যন্ত ফুরফুরে মেজাজে ছিল লিরয় চার্লটন। নিজের অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, প্রসন্নচিত্তে তাকিয়ে ছিল নিচের ওঅর্কফ্লোরের দিকে। কয়েক বছর আগে, এই কম্পাউণ্ড যখন তৈরি করা হচ্ছিল, তখন বিল্ডিংটাকে বড় বড় ট্র্যাক্টরের গ্যারাজ হিসেবে ব্যবহার করত ইঞ্জিনিয়াররা। এখন আর ট্র্যাক্টরগুলো নেই, সে-জায়গায় তৈরি করা হয়েছে কাঁচঘেরা বারোটা রুম—ওপর থেকে একসঙ্গে সবগুলোই দেখতে পায় চার্লটন।

গুচ্ছ, বা ক্লাস্টারের আদলে বানানো হয়েছে রুমগুলো। মোট তিনটা ক্লাস্টার—একেকটা ক্লাস্টারে পরস্পরের সঙ্গে লাগোয়া চারটা করে রুম। ক্লাস্টারগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে স্থাপন করা তিনটা টেস্ট সাইটের প্রতিনিধিত্ব করছে—রেড সিটি, ওয়াইওমিং; কোল্ড স্প্রিংস, ইউটাহ্; এবং কুক ভ্যালি, নর্থ ডাকোটা। তিন সাইটে রয়েছে তিনটি অ্যান্টেনা।

জানালায় দাঁড়িয়ে নিচের দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে মনে যে-প্রশান্তি অনুভব করে চার্লটন, তার তুলনা হয় না। প্রতিটা কাঁচের রুম বা স্টেশনে থাকে একজন করে কণ্ট্রোলার—চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়, মাথায় কণ্ডাক্টিভ জেলের সাহায্যে লাগানো থাকে কয়েকটা ইলেকট্রোড। লাল বাতি জ্বলে কামরায়, ডার্করুমের মত। আধো-আলোকিত পরিবেশটার

সঙ্গে মাতৃজঠরের মিল খুঁজে পায় চার্লটন। দৃশ্যটা শান্তি জাগাবার মতই বটে। বিশেষ করে তার জন্যে—মোটাসোটা গড়নের খাটো, টাকমাথা একজন মধ্যবয়েসী মানুষ সে... তিন দশক আগে ডার্টমাথ থেকে সামান্য একটা ফিনান্সের ডিগ্রি নিয়ে যে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিল। জীবনের নানা মোড়ে ঠোকর খেতে খেতে, চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে... আজ সে এসে পৌঁছেছে এখানে। রবার্ট ওপেনহাইমার যেভাবে চোখে গগলস্ লাগিয়ে অ্যালামোগর্ডো মরুভূমিতে অ্যাটম বোমার ক্ষমতা দেখেছিলেন, সেভাবেই আজ চার্লটন তার জানালা থেকে নিজের কাজের ফসল প্রত্যক্ষ করে। কে জানে, কোনও একদিন হয়তো তার নামও উচ্চারিত হবে ওপেনহাইমারের মত!

সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ যে-কাজটা করছে... এখানে, এবং এখানকার মত অন্যান্য সাইটে... সেটাকে শুধু রোমহর্ষক বললে কম বলা হয়। তাদের প্রস্তুতি ও আয়োজন রীতিমত ভীতিকর—অ্যান্টেনা, কন্ট্রোলার এবং আরেকটা জিনিস, যার কথা শুনলে লোকে ভয় পেয়ে যায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই চার্লটনের, ওটা নিয়ে তার ভেতরেও যথেষ্ট অস্বস্তি আছে। জিনিসটা পুরোপুরি তৈরি বলা চলে, যে-কোনোদিন মাঠে নামানো হবে, আর তখন সেটাকে ফেরাবার কোনও উপায় থাকবে না। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে বড় ধরনের সবকিছুই প্রাথমিকভাবে ভয় করে লোকে, তাই বলে পিছিয়ে আসা চলে না। তা হলে আর দুনিয়ায় বড় বড় আবিষ্কারগুলো হতো না। আমরা পড়ে থাকতাম প্রস্তরযুগে।

এসব নিয়েই ভাবছিল চার্লটন, যখন গোলমালটা শুরু হলো। দু'নম্বর ক্লাস্টারের একটা সেকশনে কাজ করছিল মাইকেল শেফার্ড, আচমকা ধড়মড় করে উঠে বসল সে, হৈচৈ শুরু করল অ্যান্টেনা সাইট নিয়ে।

এখন, ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায়, তার পাশে পৌঁছেছে

চার্লটন, শান্ত করার চেষ্টা করছে যুবকটিকে। চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে মাইকেলের, টান দিয়ে খুলে ফেলেছে সব ইলেকট্রোড, কপাল আর একটা চোখের পাতা মাখামাখি হয়ে গেছে কণ্ডাক্টিভ জেলে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল চার্লটন।

'জানি না। মনে হলো... মনে হলো কেউ আমার কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করছে।'

'মানে কী?'

'মনে হলো, লাইনের ও-মাথায় রয়েছে কেউ... কোল্ড স্প্রিংসে। কানেকশনটা ধরে সে যেন এগিয়ে আসছিল আমার দিকে।'

অর্থহীন কথাবার্তা, মাইকেল নিজেও সেটা বুঝতে পারছে। তারপরেও পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারল না চার্লটন। কিছু একটা তো হয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে এমন করবে কেন!

কী হতে পারে? একটু ভাবল চার্লটন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গত কয়েক মাস ধরে ওপরমহল থেকে একটা কানাঘুষো ভেসে আসছে। কানাঘুষো অবশ্য সবসময়েই শোনা যায়, বিশেষ করে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিষ্ঠান যদি একই কাজে নিয়োজিত হয়, নানা ধরনের উড়ো কথা ভেসে বেড়ানোই স্বাভাবিক। তবে সম্প্রতি যেটা শোনা গেছে, সেটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেবার মত নয়। শোনা গেছে, পুরো প্রজেক্টকে হুমকিতে ফেলে দিতে পারে, এমন একটা বিপদ নাকি উদয় হয়েছে হঠাৎ করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু জানতে পেরেছে চার্লটন, তাতে বলা হয়েছে, ফোর্ট ডেট্রিকের অরিজিনাল প্রজেক্টের একটা ছেঁড়া সুতো নাকি রয়ে গেছে। বেঁচে যাওয়া এক সাবজেক্ট... অল্পবয়েসী একটা মেয়ে... তাকে কবজা করেছে ফিল্ডিং-গেলারের লোকেরা... আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, অ্যালেক্স লিয়ারি। মেয়েটা

ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে বলে শোনা গেছে, কিন্তু তারপরেও তিন অ্যান্টেনা সাইটে যে-ধরনের টেস্টিং চলছে, তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে মেয়েটি। মোটামুটি এ-রকম একটা সতর্কবাণীই পেয়েছে চার্লটন।

থমথমে মুখে মাইকেলের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কী অনুভব করেছ তুমি? খুলে বলো দেখি।'

'বললাম তো,' কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল। 'কেউ একজন ছিল ওখানে... একদম অ্যান্টেনাটার কাছে।'

'সেটা এই প্রথম ঘটছে না,' গম্ভীর গলায় মনে করিয়ে দিল চার্লটন। ইতিপূর্বে কিছু দুষ্টু ছেলে-ছোকরা উদয় হয়েছিল অ্যান্টেনা সাইটে, নিজেদের মধ্যে বাজি ধরে অ্যান্টেনায় চড়ার চেষ্টা করেছিল ওরা।

'এবারের অনুভূতিটা অন্যরকম,' বলল মাইকেল। 'পার্থক্যটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না... তবে আমার মনে হলো, ওখানে এমন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, যার থাকার কথা নয়।'

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল চার্লটন। যে-হুমকির কথা বলা হয়েছিল, এটা সেটাই নয় তো? কীভাবে বুঝবে?

অ্যান্টেনার সঙ্গে কোনও সিকিউরিটি ক্যামেরা নেই। মরুভূমিতে কী ঘটছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানার উপায় নেই কোনও। ওয়াশিংটনে এক বন্ধু আছে চার্লটনের, তাকে বললে হয়তো বা স্যাটেলাইট ডেটায় অ্যাকসেস পাওয়া যাবে। তবে তার জন্যে সময় দরকার—এক ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি। লিয়ারির প্রতি ঈর্ষা অনুভব করল চার্লটন, ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে লোকটার যোগাযোগ অনেক বেশি। চাইলে এমনকী স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণও নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। মনে সন্দেহ জাগল, ঘটনাটার পেছনে ফিল্ডিং-গেলারের হাত নেই তো?

কী করা যায়?

মাইকেলকে পেরিয়ে ওঅর্কস্টেশনের মেঝেতে চোখ গেল চার্লটনের। ইলেকট্রোডগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

'ওগুলো মাথায় লাগাও আবার,' নির্দেশ দিল সে।

আবার গাড়িতে চড়েছে রানা আর অ্যালি, টাওয়ারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে উত্তরদিকে। জায়গাটার সঙ্গে যত দূরত্ব বাড়ছে, ততই স্বাভাবিক হয়ে আসছে মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল রানা, ভেবেছিল টাওয়ারে হাত দিয়ে অ্যালি ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।

ইতিমধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা খুলে বলেছে অ্যালি। কোল্ড স্প্রিংসের অধিবাসীদের চিন্তা শুনতে পাওয়া, টাওয়ারের কানেকশনের ওপারে আরেকজন মানুষের কণ্ঠ, সবশেষে নিজের মনের গভীরে নিজের স্মৃতিদের বন্দি হয়ে থাকতে দেখা।

'আমার মনে হয়েছে, টিফানি ক্যানট্রেলের স্মৃতিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,' শেষে যোগ করল অ্যালি। 'ওটা ফিরে পাবার জন্যে যুদ্ধ করছিল আমার মন। যখন পেলাম, তখন মনে পড়ে গেল নামটা। ওটা আমি আগেও শুনেছি।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'এল্ সেডেরোয়। ওই যে, যেখানে আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ওখানকার লোকজনের চিন্তায় শুনতে পেয়েছি টিফানি ক্যানট্রেলের নাম। ডা. ক্যানট্রেল—টেক্সাসের অ্যামারিলোয় থাকেন। একজনকে ভাবতে শুনেছিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে—আগে হোক, বা পরে। তখন সেটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, দেয়ার মত অবস্থাও ছিল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার কেসটার সঙ্গে ভদ্রমহিলার সম্পর্ক আছে।'

অ্যালির কথাটা ভাবিয়ে তোলার মত। *দেখা করা* মানে

নির্দোষ সাক্ষাৎ নয়, রানার জগতে ওটা ভিন্ন অর্থ বহন করে। আর যদি তা-ই হয়, টিফানি ক্যানট্রেলের সামনে বড় ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে।

'আর কিছু মনে করতে পারছ ডা. ক্যানট্রেলের সম্পর্কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী ধরনের ডাক্তার সে? রিসার্চারদের কেউ নয়তো, যারা তোমার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল অ্যালি। 'অমন কোনও স্মৃতি নেই। আবছাভাবে শুধু এটুকু মনে পড়ছে যে, মহিলা খুব ভাল। আমার যত্ন নিত খুব। মন থেকে ভালবাসত আমাকে। লোক-দেখানো ভালবাসা নয়, খাঁটি ভালবাসা। ভান করলে বুঝে ফেলতাম... আমার সঙ্গে কেউ ভান করতে পারে না।'

তা ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

'লিয়ারির সঙ্গে ভদ্রমহিলা কীভাবে জড়িত, আমি বলতে পারব না,' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল অ্যালি। 'তবে আমাকে চেনেন তিনি। হয়তো আমার ব্যাপারে সবকিছুই জানেন। আর যদি তিনি বিপদে পড়ে থাকেন, আমাদের সাহায্য করা উচিত তাঁকে।' রানার দিকে তাকাল ও। 'ডা. ক্যানট্রেলকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? ডাক্তার যখন, অনলাইনে খোঁজ নিলেই তাঁর কণ্ট্যাক্ট ইনফরমেশন পাওয়া যাবে।'

দ্বিমত পোষণ করল রানা। বলল, 'লিয়ারি বা তার লোকেরা যদি ভদ্রমহিলার পেছনে লেগে থাকে, তা হলে তার ফোনে আড়ি পেতে রেখেছে।'

যদি এখনও বেঁচে থাকে আর কী, মনে মনে ভাবল ও।

চিন্তাটা নিজের অজান্তেই চলে এল মাথায়। চোখের কোনায় অ্যালিকে কেঁপে উঠতে দেখল সঙ্গে সঙ্গে।

'সরি,' বলল রানা।

'না, ঠিক আছে। আমিও একই কথা ভাবছিলাম।'

‘তোমার বুদ্ধিটা অবশ্য মন্দ না। ইন্টারনেট থেকে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন জোগাড় করার কথা বলছি। ঠিকানা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা যায়।’

‘ওতে ঝুঁকি আছে না?’

‘আছে। তবে ঝুঁকি এড়ানোরও কায়দা আছে। যতই চোখে চোখে রাখা হোক কাউকে, গোপনে দেখা করা যায়।’ একটু ভেবে নিল রানা। ‘অ্যামারিলোয় থাকে এই ডাক্তার, তাই না? দশ থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছুনো যাবে ওখানে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালি। ওর হাতদুটো কোলের ওপর রাখা, নার্ভাস ভঙ্গিতে নখ খুঁটছে।

পরের কয়েক মিনিট কেউ কথা বলল না। তাপতরঙ্গের মাঝ থেকে ধীরে ধীরে উদয় হলো কোল্ড স্প্রিংসের দক্ষিণ অংশ। হাত বাড়িয়ে গাড়ির পেছনের সিট থেকে বেসবল ক্যাপ আর সানগ্লাস নিল রানা। ওগুলো পরতে যাবে, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল অ্যালি।

যেন বাতাস ফুঁড়ে উদয় হলো পিকআপটা—হোণ্ডা অ্যাকর্ডের ত্রিশ ফুট সামনে। এক সেকেণ্ড আগেও ফাঁকা ছিল রাস্তা, কিন্তু এখন... ছোট একটা বালিয়াড়ির পেছন থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে গাড়িটা, রাস্তার ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে দুরন্ত বেগে, ঝাঁপ দিয়েছে শূন্যে। স্থানীয় কোনও বেপরোয়া ড্রাইভার, সন্দেহ হলো রানার—মরুভূমির ওপর দিয়ে শর্টকাট নিতে চাইছে, সেজন্যেই আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে রাস্তা। পলকের জন্যে উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে চালকের যে-চেহারা দেখল, তাতে ধারণাটা পাকা হলো আরও। ময়লা ওভারঅল, দাগঅলা শার্ট আর অবিন্যস্ত চেহারার এক তরুণ—চোখে-মুখে ফুটে আছে গ্রাম্য সারল্য।

একেবারে অ্যাকর্ডের নাকের ডগায় উঠে এসেছে পিকআপটা, কয়েক সেকেণ্ড পরে এলে পাশ থেকে গুঁতো

মেরে বসত। তাই বলে বিপদ কাটেনি, এখন ওটার পজিশন অনেকটা রোডব্লকের মত—পিকআপের গায়ে এবার অ্যাকর্ডই গুঁতো মারতে চলেছে। ব্রেক কষল রানা, কর্কশ শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাল ওর গাড়ির টায়ার, ঘষা খাচ্ছে অ্যাসফল্টে। পিছলাতে পিছলাতে হোণ্ডা অ্যাকর্ড ছুটে যাচ্ছে পিকআপের দিকে।

রানা আশা করেছিল, বিপদ দেখে স্পিড বাড়াবে পিকআপের ড্রাইভার, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোপাশে নেমে যাবার চেষ্টা করবে... কিন্তু তা করল না সে। তার বদলে ব্রেক চাপল, স্টিয়ারিং ঘোরাল বনবন করে—রাস্তার ওপর সিধে করতে চাইছে নিজের গাড়ি। আঁতকে উঠল রানা। ব্যাটা পাগল, নাকি বিপদের মুখে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট বুঝি আর ঠেকানো গেল না!

সত্যিই গেল না। তবে তার শিকার রানা নয়, বেপরোয়া ড্রাইভারই হলো। হিসেবে ভুল করেছে সে। তুমুল বেগে ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে গাড়ি, ঠিকমত কাজ করল না ব্রেক। মোমেণ্টামের কারণে গাড়িটা নিজ থেকেই এগিয়ে গেল খানিকটা, সামনের দু'চাকা চলে গেল অন্যপাশের ঢালে। সে-অবস্থায় স্টিয়ারিং ঘোরানোয় আরও বড় সর্বনাশ ঘটে গেল। সামনের দু'চাকা ঘুরে যাওয়ায় যেন একটা ধাক্কা খেল পিকআপ, পেছনদিকটা উঠে গেল ভূমি ছেড়ে, শূন্যেই মোচড় খেল পুরো চেসিস। রাস্তার ঢালে কাত হয়ে পড়ল গাড়িটা, গড়িয়ে গেল নিচে। মাত্র দু'ইঞ্চির জন্য মিস করে গেল অ্যাকর্ডকে। রাস্তার ওপর থেকে ছিটকে যেতে থাকা পিকআপের গা ঘেঁষে স্কিড করে গেল রানার গাড়ি, দশ ফুট সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে হতভম্ব চোখে বাইরে তাকাল রানা আর অ্যালি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে ঘটে গেছে একটা

মারাত্মক দুর্ঘটনা। গড়ান দিচ্ছে পিকআপটা—ঢাল থেকে নেমেও থামল না, নিচের জমিনে পৌঁছে আরও কয়েকবার গড়াল, থামল প্রায় সত্তর ফুট দূরে গিয়ে। মরা তেলাপোকার মত উল্টে গেছে। বিশ্রী আওয়াজ তুলে ঘুরছে পেছনের দুই চাকা। সামনে... ক্যাবের ছাতটা প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, ভেঙেচুরে ছিটকে গেছে একপাশের দরজা। ক্যাবের অভ্যন্তরটা কালো গর্তের মত লাগল দূর থেকে—ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না।

'ওহ্, গড!' পিকআপের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসাল অ্যালি।

ঠোঁট কামড়াল রানা। অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার, কিন্তু কীভাবে ডাকবে, বুঝতে পারছে না। সেলফোন নেই ওর কাছে, খবরটা দেয়ার জন্যে শহরে যেতে হবে। সেটা বিপজ্জনক। পুলিশ আসার আগেই কেটে পড়তে হবে ওদেরকে। তাই বলে দুর্ঘটনায় পড়া একজন মানুষকে ফেলে চলেও যাওয়া যায় না। আর কিছু না হোক, লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে, তা অন্তত দেখা দরকার। তাকে সাহায্য করা যাবে কি না, সেটা তখন বোঝা যাবে।

'এখানেই থাকো,' অ্যালিকে বলল ও। 'আমি দেখে আসছি।'

গাড়ি থেকে নামল রানা। ঝুঁকে ড্রাইভারের সিটের তলা থেকে বের করে আনল নিজের সিগ-সাওয়ার। সতর্ক থাকার তাগিদ অনুভব করছে। যেভাবে আচমকা বেরিয়ে এল পিকআপটা, ওটাকে স্বাভাবিক বলা চলে না মোটেই। সন্দেহ হচ্ছে ওর। পিস্তলটা কোমরের পেছনে বেল্টে গুঁজল। এরপর নামতে শুরু করল রাস্তার ঢাল বেয়ে।

খুন করো ওদেরকে, অ্যাডাম। বাইরে বেরিয়ে খতম করে দাও ওদেরকে। এখুনি!

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে অ্যাডাম। তীব্র ব্যথা... এতই তীব্র যে, রুক্ষ কণ্ঠের আদেশটা ঠিকমত শুনতেই পাচ্ছে না।

হেলায় সুযোগ নষ্ট করছ তুমি। অপেক্ষা করছ কীসের জন্যে?

শরীর ঘোরাল অ্যাডাম। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের কাছে কট্ করে উঠল কী যেন। ফুঁপিয়ে উঠল ও। চিৎকার করার শক্তি নেই। বাঁ হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। তবে হতাশ হবার কিছু নেই, ও ডানহাতি। ডান হাত ঠিক থাকলেই এমপি-ফাইভটা ব্যবহার করতে পারবে। অস্ত্রটার খোঁজে চোখ বোলাল। ওই তো, দু'ফুট দূরে পড়ে আছে ওটা—ধুলোয় একাকার।

বাইরে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যালো? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? সাড়া দিন।'

কপাল ভাল তোমার, অ্যাডাম। কাজটা সহজ করে দিচ্ছে ও। অস্ত্রটা তোলো। মিটিয়ে দাও ঝামেলা।

সাবমেশিনগানের দিকে ডান হাত বাড়াল অ্যাডাম। কিন্তু ওটুকু নড়াচড়াতেই অবর্ণনীয় ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল চুরমার হয়ে যাওয়া বাঁ কাঁধ থেকে। কেশে উঠে স্থির হয়ে গেল ও। পড়ে রইল মড়ার মত।

থামলে কেন, অ্যাডাম? শাস্তি পেতে চাইছ তুমি? আমার শাস্তি যে কত ভয়ঙ্কর, তা কি তুমি ভুলে গেছ?

কিছু বলল না অ্যাডাম। অসহ্য যে-ব্যথা সারা দেহে, তার সামনে দুনিয়ার সমস্ত হুমকি অচল। মাথার ভেতর অশরীরী কণ্ঠটা শুনতে পেল—কণ্ঠের মালিক যেন অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে।

একে দিয়ে কিচ্ছু হবে না— বাতিলের খাতায় চলে গেছে। অ্যাই, সাইট টু-র আশপাশে আর কারও অ্যাসেট আছে? থাকলে জলদি আনার ব্যবস্থা করো।

কাকে বলা হলো কথাটা? কিছুই মাথায় ঢুকছে না অ্যাডামের। অবশ্য, পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে ঘোলাটে। এর সূচনা হয়েছে খানিক আগে—যখন অপ্রত্যাশিতভাবে মাথার ভেতর রুক্ষ কণ্ঠটা শুনতে পেয়েছে। একটা গাড়ির রেডিয়েটর খোলায় দাদুকে তখন গ্যারাজে সাহায্য করছিল ও। এমনটা আগে কখনও ঘটেনি; দাদু আশপাশে থাকলে কখনও কথা বলেনি কণ্ঠের মালিক। কিন্তু আজ বলল।

অ্যাডাম, জরুরি একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

অবাক হয়েছিল অ্যাডাম। কণ্ঠটা নার্ভাস শোনাচ্ছিল, সেই সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরনের তাড়া।

'কী করতে হবে?' মনে মনে জিজ্ঞেস করেছে ও।

ম্যাট্রেসের তলা থেকে মেশিনগানটা বের করো। ওটা নিয়ে পিকআপে চড়বে। শহরের দক্ষিণে... পুরনো লেক রোডে যেতে হবে তোমাকে। এক্ষুণি!

অ্যাডামকে থমকে যেতে দেখে দাদু ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছেন। 'কী হয়েছে?' জানতে চেয়েছেন তিনি।

কোনোমতে মাথা নেড়েছে অ্যাডাম। 'না, কিছু না।'

বুড়োটার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। রওনা দাও এখুনি। মুভ!

'আমি একটু বাথরুমে যাব,' নিচু গলায় দাদুকে বলেছে অ্যাডাম। এক ছুটে বেরিয়ে এসেছে গ্যারাজ থেকে। মেশিনগান নিয়ে পিকআপে চড়তে লেগেছে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড। এরপর মরুভূমির মাঝ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়েছে লেক রোডের দিকে।

কী করতে হবে, সেটা পথিমধ্যে তাকে জানিয়েছে অশরীরী কণ্ঠ। ড্রাই লেকের রেডিয়ো টাওয়ারের পাশে, কিংবা ওখান থেকে ফিরতে থাকা অবস্থায় কাউকে দেখতে পাবে ও। সেই মানুষ বা মানুষগুলো যে-ই হোক না কেন, তাদেরকে থামিয়ে খুন করতে হবে।

দূর থেকেই হোণ্ডা গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল অ্যাডাম। একটা বালিয়াড়ির পেছনে ওত পেতেছিল। ভেবেছিল, পাশ থেকে গাড়িটাকে গুঁতো মেরে অচল করে দেবে। তারপর গুলি চালিয়ে খুন করবে ওটার আরোহীদের। কিন্তু হিসেবে সামান্য গরমিল হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটা মাঠে মারা পড়েছে।

সত্যিই কি ব্যর্থ হয়েছে ও? মাথা সামান্য উঁচু করে সাবমেশিনগানটার দিকে আবারও তাকাল অ্যাডাম। শার্টের একটা কোনা তুলে কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। এরপর শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করল; ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল অস্ত্রটার দিকে।

ত্রিশ গজ দূর থেকে পিকআপের ভেতরে নড়াচড়া দেখতে পেল রানা। এক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল দুটো পা। ধীরে ধীরে, উল্টোদিকে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে, তরুণ ড্রাইভারের দেহটা বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

'ঠিক আছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

'শুনতে পাচ্ছ?'

এবারও তরুণ নিরুত্তর।

এরপর যা ঘটল, তার জন্যে তৈরি ছিল না রানা। ছেলেটার দুর্দশা দেখে করুণা অনুভব করছিল, ঢিল দিয়েছিল সতর্কতায়, আর সে-কারণেই পড়ে গেল বিপদে। ওর চোখের সামনে আস্তে আস্তে পিকআপ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল তরুণ ড্রাইভার, বাম হাতটা বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলছে সামনে, মনে হলো কাঁধটা ভেঙে গেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে খোলা আকাশের নিচে বেরিয়েই দু'হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, পরমুহূর্তে মোচড় খেল, কাতর এক আর্তনাদ করে ঘুরে গেল রানার দিকে, পিকআপের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। আর তখুনি রানা দেখল, ছেলেটার হাতে একটা

সাবমেশিনগান শোভা পাচ্ছে—নলটা তাক করা হয়েছে ওর বুকের দিকে।

পেছন থেকে আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ শুনল রানা। ওদিকে না তাকিয়েও বুঝল, ওর নির্দেশ অমান্য করে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে অ্যালি, দেখতে পেয়েছে অস্ত্রটা।

'এদিকে এসো না, অ্যালি। খবরদার!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'গাড়ির আড়ালে চলে যাও, জলদি!'

এবার বাধ্য মেয়ের মত নির্দেশটা পালন করল অ্যালি। এক ছুটে চলে গেল অ্যাকর্ডের উল্টোপাশে।

অস্ত্রধারী তরুণের দিকে নজর ফেরাল রানা। হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রটা থরথর করে কাঁপছে—তবে এত বেশি নয় যে, গুলি করলে সেটা মিস হবে। আঙুলের ডগা যেভাবে চেপে বসেছে ট্রিগারে... চাপ আরেকটু বাড়ালেই গুলিবর্ষণ করবে এমপি-ফাইভ। রানা বুঝল, কোমর থেকে নিজের পিস্তলটা বের করার আগেই গুলি খেতে হবে ওকে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোনও শব্দ বেরুল না তরুণের মুখ দিয়ে। পালা করে রানা আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাকে দেখছে সে। ছেলেটা আহত, তবে পুরোপুরি অচল হয়ে যায়নি। রানাকে গুলি করার পর উঠে দাঁড়িয়ে অ্যালির কাছে যেতে পারবে। পালাবার চেষ্টা করতে পারে অ্যালি, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। ওকে ধাওয়া করার প্রয়োজন হবে না কোনও। চারদিকে উন্মুক্ত মরুভূমি, আড়াল নেবার মত কিছুই নেই... দূর থেকেই ওকে সাবমেশিনগান দিয়ে ঘায়েল করতে পারবে ছেলেটা।

'মাথা গরম কোরো না,' নরম গলায় তাকে বলল রানা। 'তুমি একটা ভুল করতে চলেছ।'

চোয়াল শক্ত হলো তরুণ ড্রাইভারের। ট্রিগারের ওপর চাপ আরেকটু বাড়াল সে।

গুলি করো, অ্যাডাম। খতম করো ওকে!

সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার ওপর মনোযোগ দিতে চাইছে অ্যাডাম, কিন্তু ওর চোখ বার বার চলে যাচ্ছে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড আগ পর্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ছিল সে—ভুতুড়ে কণ্ঠের হুকুম তামিল করবে, কণ্ঠটাকে বিদায় করবে মাথা থেকে। কিন্তু এখন...

মেয়েটাকে দেখে একটা ঝাঁকি খেয়েছে অ্যাডাম। কতই বা বয়স হবে? দশ? বারো? রুক্ষ কণ্ঠটা কিনা ওই ফুটফুটে মেয়েটাকে খুন করতে বলছে!

মাথা থেকে ওসব চিন্তা দূর করো, অ্যাডাম! কথা না শুনলে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে তোমাকে। ক্ষমা করব না কিছুতেই। শায়েস্তা করব তোমাকে... ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব!

'প্লিজ!' ফিসফিসাল অ্যাডাম।

আদেশ পালন করো। এটা আমার শেষ কথা।

বড় করে শ্বাস নিল অ্যাডাম, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল। টের পেল, বুকের ধুকপুকানি কমে যাচ্ছে। পরিচিত একটা অনুভূতি—সবকিছু মেনে নেবার অনুভূতি... যা হয় হোক, ওর কিছু যায়-আসে না।

মরিয়া হয়ে উঠেছে রানা, পিস্তলটা বের করবে বলে ভাবছে। সন্দেহ নেই, কোমরের পেছনে হাত বাড়ানোমাত্র গুলি খেতে হবে ওকে; কিন্তু মরার আগে একটা হলেও গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে ও। অস্ত্রধারী তরুণটিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। অ্যালি অন্তত বেঁচে যাবে তাতে।

সত্যিই কি বাঁচবে? বড় একটা খুঁত আছে প্ল্যানটায়। মেশিনগানটা যদি ফুল অটোতে সেট করা থাকে, তা হলে ট্রিগারে চাপ পড়লেই অঝোরে বেরিয়ে আসবে বুলেটের ধারা। ছিন্নভিন্ন করে দেবে ওকে। পিস্তল বের করারই সময়

পাওয়া যাবে না।

এমপি-ফাইভের ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, তরুণের কম্পিত হাতে সামান্য নড়ছে ওটা। একটিবারের জন্যেও যদি ওর দিক থেকে সরে যায়... সেটা যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক না কেন... একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেতে পারে।

হঠাৎ মুখ খুলল তরুণ। বলল, 'আমি নিরুপায়। আমার সত্যিই এসবের ইচ্ছে ছিল না।'

তার চোখে করুণার ছায়া দেখতে পেল রানা। খটকা লাগল ওর। অ্যাকসিডেন্টের আগ মুহূর্তে ছেলেটাকে দেখে যে-ধারণাটা হয়েছিল, তা ফিরে এল আবার। নিতান্তই এক গ্রাম্য, সরল ছেলে। পোড়খাওয়া কোনও খুনি নয়। এমন একজন মানুষকে কেন পাঠানো হয়েছে এ-কাজে? কী যেন ঠিক মিলছে না।

তবে ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামানো চলে না। বোকাসোকা হোক, বা না-ই হোক, ছেলেটা যে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চেহারা দেখে। এখন একটাই কাজ করা যেতে পারে। ছেলেটার অনভিজ্ঞতাই এখন রানার জন্যে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

'...আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো,' বলল তরুণ। উঁচু করল সাবমেশিনগান।

'তুমি সেফটি ক্যাচ অফ করোনি,' ওকে বলল রানা।

থমকে গেল তরুণ, অস্ত্রটা কাত করে দেখতে চাইল, কথাটা সত্যি কি না। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্যে নড়ে গেল ব্যারেল। রানার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট। বিদ্যুতের মত ছোবল দিল ওর ডান হাত, কোমরের পেছন থেকে বের করে আনল সিগ-সাওয়ার। তরুণ ড্রাইভার ওর দিকে ঠিকমত তাকাবার সময় পেল না, তার আগেই টিপে দিল রানা ট্রিগার।

কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো অ্যাডামের। বিস্ফোরিত

হলো মাথার পেছনদিক। ভীষণ একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। চলে গেল সমস্ত দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে এল রানা। কেন যেন বিবেকের দংশন অনুভব করছে, যদিও তার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। এক মুহূর্ত দেরি করলে ও নিজেই খুন হয়ে যেত। কিন্তু তারপরও...

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে। উল্টো ঘুরে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল ও।

বাইশ

কোল্ড স্প্রিংসে ঢোকা নিরাপদ মনে হলো না রানার কাছে। রাস্তা ছেড়ে মরুভূমিতে নামল ও, এবড়ো-খেবড়ো জমিনের ওপর দিয়ে ছোটাল গাড়ি। কয়েক মাইল যাবার পর একটা কাঁচা রাস্তার দেখা মিলল, সেটা উত্তরে গিয়ে ইউ.এস. ফিফটিতে মিলেছে। সেই রাস্তা ধরে ফ্রিওয়েতে উঠে এল অ্যাকর্ড। এবার গতি বাড়াল রানা।

পিকআপ ফেলে আসার পর থেকে একটা কথাও বলেনি কেউ। অ্যালিকে উসখুস করতে দেখে রানা নীরবতা ভাঙল। বলল, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। কী ঘটল ওখানে, তা আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

আরও ঘণ্টাখানেক না কাটা পর্যন্ত স্বস্তি পেল না ও। শেষে ইন্টারস্টেট সেভেন্টিতে পৌঁছে একটু ঢিল দিল সতর্কতায়। অঙ্গরাজ্যের পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে ছুটছে এখন ওদের

অ্যাকর্ড। কিছুক্ষণ পর সামনার নামে একটা ছোট্ট শহরের দেখা পেল। ফ্রিওয়ে থেকে শহরের আকার দেখে মনে হলো, ভেতরে একটা লাইব্রেরি পাওয়া যেতে পারে।

সত্যিই পাওয়া গেল—শহরের স্কুলের পাশে ছোট্ট পাবলিক লাইব্রেরি, পার্কিং লটটা প্রায় ফাঁকা। খুশি হলো রানা, খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে না। সানগ্লাস আর বেসবল ক্যাপ পরে আছে ও, কিন্তু তাতে চেহারা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না।

অ্যালিকে একাই লাইব্রেরিতে পাঠাবার কথা ভাবল রানা, কিন্তু পরক্ষণে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। একা থাকা চলবে না ওর। একাকী একজন অপরিচিত লোককে গাড়িতে বসে থাকতে দেখলে শহরবাসীর সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

'আমাকে একা দেখলেও সন্দেহ করতে পারে,' রানার মনের কথা পড়ে বলল অ্যালি। 'আমার বয়েসী একটা অচেনা মেয়ে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো রানা। দু'জনে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

লাইব্রেরির এণ্ট্রান্সের মুখে একটা ডেস্কে বসে আছে মাঝবয়েসী এক মহিলা—সে-ই লাইব্রেরিয়ান। রানা আর অ্যালিকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল, উপহার দিল সৌজন্যমূলক হাসি। নড করল রানা, মুখ ঘুরিয়ে নিল আরেকদিকে। ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল না মহিলা, উৎসাহী ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে সম্ভাষণ জানাল অ্যালি, বাধ্য করল নিজের দিকে তাকাতে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে... মনে মনে ওর কৌশলের প্রশংসা করল রানা।

'থ্যাঙ্কস,' নিচু গলায় বলল অ্যালি।

'লাইব্রেরিয়ান কী ভাবছে, বুঝতে পেরেছ? আমাকে চিনে ফেলেনি তো?'

মাথা নাড়ল অ্যালি।

লাইব্রেরির এক কোণে, একটা কাউন্টারের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে তিনটে কম্পিউটার। আশপাশে কেউ নেই। এখন পর্যন্ত অল্পবয়েসী এক ছেলে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি ওদের। দূরের একটা টেবিলে বসে নিবিষ্টমনে বই পড়ছে সে, কোনোদিকে খেয়াল নেই। চেয়ার টেনে একটা কম্পিউটারের সামনে বসল রানা, মাউস নেড়ে স্লিপ মোড থেকে জাগিয়ে তুলল ওটাকে। আরেকটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল অ্যালি।

ইন্টারনেট কানেকশন আছে কি না দেখে নিল রানা, এরপর ব্রাউজার খুলে সার্চবারে টিফানি ক্যানট্রেলের নাম টাইপ করল—ইয়েলো-পেজ-সার্চ চালাল অ্যামারিলো, টেক্সাসে।

ফলাফল, শূন্য।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবারও সার্চ করল রানা, এবার প্যারামিটার বদলে পুরো টেক্সাসে দেখছে। ডা. ক্যানট্রেল হয়তো অ্যামারিলোর বাইরে থাকে। কিন্তু আবারও ব্যর্থ হতে হলো।

সার্চ পেজ বন্ধ করে দিয়ে এরপর গুগল ম্যাপ ওপেন করল রানা, অ্যামারিলোর ওপর জুম করে হাসপাতাল খুঁজল। তিনটা বড় হাসপাতাল আছে শহরে, আর আছে বেশ কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিস। প্রাইভেট ডাক্তারদের কারও নাম টিফানি ক্যানট্রেল নয়।

বড় হাসপাতালগুলোর ওয়েবসাইটে এবার ঢুঁ মারল রানা। স্টাফদের তালিকা বের করে পড়তে থাকল সবক'টা নাম। তিন নম্বর হাসপাতালে গিয়ে একটু আশান্বিত হয়ে উঠল। টিফানি প্রাইস নামে একজন ডাক্তার রয়েছে ওখানে, তবে তার পরিচিতির পেজে কোনও ছবি দেয়া হয়নি। ভুলে বাদ পড়ে গেছে, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ছবিটা দেয়া হয়নি, কে

জানে। নিশ্চিত হবার জন্যে ফটো গ্যালারির সব ছবি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। খানিক পরেই পাশ থেকে অস্ফুট শব্দ করে উঠল অ্যালি।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলল অ্যালি, নিচদিকের একটা ছবিকে ইশারা করছে। হাসপাতালের ছাতের ছবি। স্ট্রেচারে করে একজন রোগীকে নিয়ে হেলিপ্যাডে অপেক্ষমাণ হেলিকপ্টারের দিকে যাচ্ছে দু'জন মেডিক্যাল স্টাফ। তবে তাদের দিকে নয়, অ্যালি ইশারা করছে স্টাফদের পেছনে, ছাতে বেরুবার করিডোরে দাঁড়ানো একটি নারীমূর্তির দিকে। ক্যামেরার দিকে পাশ ফিরে রয়েছে মেয়েটি, চেহারা পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না... প্রথম দর্শনে চোখ পড়ে না তার দিকে। রানাও মিস করে গিয়েছিল।

'ইনিই?' জিজ্ঞেস করল ও।

কম্পিউটারের স্ক্রিনের কাছে মুখ নিয়ে গেল অ্যালি। ভালমত দেখল ছবিটা। বলল, 'হ্যাঁ। আমি শিয়োর।'

গম্ভীর চোখে ছবির নারীকে খেয়াল করল রানা। ডাক্তারের অ্যাপ্রন পরে রয়েছে; বয়স খুব বেশি নয়, ত্রিশের আশপাশে। মাথায় সোনালি চুল। সত্যিই কি টিফানি ক্যানট্রেল? হতে পারে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। হয়তো নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করছে হাসপাতালে। টিফানি ক্যানট্রেলই হয়তো টিফানি প্রাইস—পুরো নাম না বদলে শুধু পদবী পাল্টেছে। এমনটা করে অনেকে, রানা দেখেছে।

নাম বদলানো, এবং কোথাও ছবি না দেয়া... মানেটা কী দাঁড়াল? এই ডাক্তার বিপদের মধ্যে রয়েছে, এবং সেটা সে জানে। সেজন্যেই নাম-ধাম বদলে আত্মগোপন করেছে।

ইয়েলো পেজে ফিরে গেল রানা। টিফানি প্রাইসের নাম টাইপ করে সার্চ বাটন চাপল। একটামাত্র এণ্ট্রি বেরুল। সঙ্গে ঠিকানা দেয়া আছে।

গুগল থেকে ঠিকানাটা ম্যাপে দেখে নিল রানা। স্ট্রিট ভিউ অপশন থেকে দেখে নিল বাড়ি ও তার আশপাশের রাস্তা। পুরনো আমলের একটা টাউনহাউস মডেলের বাড়িতে থাকে ডা. ক্যানট্রেল। আশপাশের সব বাড়ি ওই একই ডিজাইনে তৈরি।

'ডাক্তার যদি এখনও বেঁচে থাকেন, লিয়ারির লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে চোখে চোখে রাখছে,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল অ্যালি।

'নিঃসন্দেহে।' সায় দিল রানা।

'তা হলে ওঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব কীভাবে?'

'যোগাযোগের আগে ডাক্তারের সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিতে হবে আমাদেরকে,' রানা বলল। 'তোমার স্মৃতিতে তাকে ভালমানুষ মনে হয়েছে মানে এ-ই না যে, আগুপিছু না ভেবে সরাসরি হাজির হয়ে যাব তার সামনে। সে শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে!'

কম্পিউটারের স্ক্রিনে আবার মনোযোগ দিল ও। স্ট্রিট-ভিউ থেকে ভালমত দেখে নিচ্ছে ডাক্তারের বাড়ি, রাস্তা, আর পুরো পাড়াটা। ওখানে আড়ি পাতা যায় কি না, ভাবল। কার সঙ্গে, কী বিষয়ে কথা বলছে ডাক্তার, সেসব শুনতে পারলে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে—কারও সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছে কি না। সমস্যা হলো, আড়ি পাতার কোনও যন্ত্রপাতি নেই ওদের সঙ্গে। এসব জিনিস সাধারণ কোনও দোকানে পাওয়া যায় না।

রানার চিন্তাধারা অনুসরণ করছিল অ্যালি। এবার ও বলল, 'আড়ি পাতার আরেকটা কায়দা আছে।'

'কী কায়দা?'

টিফানির বাড়ির দু'পাশের বাড়িগুলো দেখাল অ্যালি। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোর কোনোটায় ঢুকতে পারব আমরা? মানে... কিছুটা সময় থাকতে পারব ওগুলোর কোনোটার

ভেতরে?'

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'একেবারে অসম্ভব বোধহয় না। ঘরের লোক বাইরে গেছে, এমন বাড়ি নিশ্চয়ই পাব। ভাড়া হয়নি, এরকম খালি অ্যাপার্টমেণ্টও থাকতে পারে। কিন্তু কেন?'

'একেকটা বাড়ি কতটুকু চওড়া?' জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন ছুঁড়ল অ্যালি।

'টাউনহাউস তো, পঁচিশ-ত্রিশ ফুটের বেশি হবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে লাইব্রেরির রিডিং এরিয়ার দিকে তাকাল অ্যালি। লাইব্রেরিতে হাজির হওয়া একমাত্র পাঠকটি একেবারে শেষ টেবিলে বসে বই পড়ছে।

'ছেলেটা আমাদের থেকে কত দূরে?' অ্যালির তৃতীয় প্রশ্ন।

'ষাট ফুট,' রানা বলল। 'সামান্য কম-বেশি হতে পারে।'

'গুড।' ওদিকে ঘুরে বসল অ্যালি, চোখ মুদল। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর, কুঁচকে গেল ভুরু। মনে হলো, দুর্বল কানেকশনের টেলিফোনে কিছু শোনার চেষ্টা করছে বুঝি। খানিক পর বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলঃ

...হি গিভস্ হিজ হারনেস বেলস্ আ শেক
টু আস্ক ইফ দেয়ার ইজ সাম মিস্টেক।
দি ওনলি আদার সাউণ্ড'স্ দ্য সুইপ
অভ ইজি উইণ্ড অ্যাণ্ড ডাউনি ফ্লেক।
দ্য উডস্ আর লাভলি, ডার্ক অ্যাণ্ড ডিপ,
বাট আই হ্যাভ প্রমিজেস টু কিপ,
অ্যাণ্ড মাইলস্ টু গো বিফোর আই স্লিপ...

চোখ খুলল অ্যালি। রানার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল।

'রবার্ট ফ্রস্ট,' বলল রানা।

মৃদু হাসল অ্যালি। দূরে বসা পাঠককে ইশারা করে বলল, 'ওর প্রিয় কবি। বসে বসে তাঁর কবিতা পড়ছে।'

ওর মতলবটা এবার বুঝতে পারছে রানা। মুখ ঘুরিয়ে কম্পিউটারের ছবি দেখল। ষাট ফুট... তারমানে, ডাক্তারের বাড়ি থেকে দু'বাড়ি দূরে পজিশন নিলেও তার মাইণ্ডরিডিং করতে পারবে অ্যালি। কে জানে, আরও দূর থেকেও হয়তো সম্ভব।

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করল ও।

'আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে?' জানতে চাইল অ্যালি।

'খুব,' বলে কিবোর্ডের বোতাম চাপল রানা, একটা রিয়াল এস্টেটের ওয়েবসাইট ওপেন করল। এক মিনিটের মাথায় টিফানি ক্যানট্রেলের পাড়ার লিস্টিং পেয়ে গেল ও। পছন্দসই রেঞ্জের ভেতর তিনটা অ্যাপার্টমেন্ট ফাঁকা রয়েছে। সবচেয়ে সুবিধেজনকটা টিফানির দুটো বাড়ি পরে। দোতলায়। টিফানির বাড়ির পুরোটাই অ্যালির নাগালের ভেতর থাকবে।

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে পৌঁছুতে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালি।

ডেস্কটপের কোনায় ঘড়ি দেখে নিল রানা। মনে মনে হিসেব করে বলল, 'মাঝরাত।'

'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

তেইশ

'স্বাভাবিকভাবে হাঁটো,' অ্যালিকে বলল রানা। 'লোকে যেন ভাবে, গ্রোসারি কিনে বাড়ি ফিরছি আমরা, ব্যস।'

টিফানি ক্যানট্রেলের পাড়ায় ঢুকেছে ওরা। যে-অ্যাপার্টমেন্টে উঠবে বলে ঠিক করেছে, সেটার উদ্দেশে হাঁটছে। হাতে মডেস্টো থেকে কেনা জিনিসপত্রের ব্যাগ। রাত হয়েছে বেশ, চারদিক অন্ধকার, সাইডওয়াকে মানুষজন নেই। শব্দ বলতে শহরের রাত্রিকালীন গুঞ্জন। কোথাও একটা বাসের ইঞ্জিন কেশে উঠল। ঘেউ ঘেউ করে ডাকল একটা কুকুর।

স্পিড লিমিটের পাঁচ কিলোমিটার ওপরে থেকে পুরো রাস্তা গাড়ি চালিয়েছে রানা। থেমেছে মাত্র দু'বার—একবার গাড়ির তেল নিয়েছে, দ্বিতীয়বার একটা হার্ডওয়্যার স্টোরে থেমে কিনে নিয়েছে তালা খোলার জন্যে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস। অ্যামারিলোয় পৌঁছেছে ওরা রাত সাড়ে বারোটায়। টিফানির বাড়ির আধমাইল দূরে একটা নির্জন পার্কিং লট খুঁজে নিয়ে সেখানে পার্ক করেছে গাড়ি। এরপর দু'জনে বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

কাঙ্ক্ষিত বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল ওরা একটু পরেই। সদর দরজায় তালা দেয়া—সেটাই স্বাভাবিক। তালা খোলার সরঞ্জাম সেজন্যেই কিনে এনেছে রানা। ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেগুলো নিয়ে, একটু পরেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে

ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে গেল দু'জনে। খালি অ্যাপার্টমেন্টটা ওখানেই। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় আরেকটা তালা খুলতে হলো, মিনিটখানেক পরেই ভেতরে ঢুকতে পারল ওরা।

খালি অ্যাপার্টমেন্ট যেমনটা হবার কথা, ভেতরটা তেমনই। কোনও ফার্নিচার নেই। দেয়ালে সম্প্রতি রঙ করানো হয়েছে, পেইন্টের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। আর ভাসছে ফ্লোর পলিশের গন্ধ। বাতি জ্বালল না রানা, অ্যালি চলে গেল পূর্বদিকের দেয়ালের পাশে—টিফানির বাড়ির যতটা সম্ভব কাছে থাকতে চাইছে। এরপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ মুদল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে চোখ সয়ে আসছে রানার। আলোর উৎস বলতে স্ট্রিটলাইটের আভা—জানালার কাঁচ ভেদ করে আসছে; আর কিচেনে লাগানো স্টোভের ডিজিটাল ডিসপ্লে।

'এখান থেকে নিশ্চয়ই জনাপঞ্চাশেক মানুষের চিন্তা শুনতে পাচ্ছ তুমি,' অ্যালিকে বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'হুঁ। মনে হচ্ছে যেন ভিড়ের হৈ-হল্লা থেকে নির্দিষ্ট একজন মানুষের কণ্ঠ খুঁজছি।'

'রাত হয়েছে, ডা. ক্যানট্রেল হয়তো ঘুমুচ্ছে।'

'আমার তা মনে হয় না। কেউ ঘুমালেও আমি তার মন পড়তে পারি। এ-মুহূর্তে ঠিক পাশের বাড়িটায় বেশ ক'জন মানুষকে রিড করতে পারছি। ওদিকে খানিকটা দূরে রয়েছে আরও কয়েকজন। কিন্তু মাঝখানটায় অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। আমার ধারণা, ওটা ডা. ক্যানট্রেলের বাড়ি... ওখানে কেউ নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ডাক্তাররা তো আর বাঁধাধরা রুটিন মেনে কাজ করে না। অপেক্ষা করা যাক।'

নিঃশব্দে সায় জানাল অ্যালি।

'আর কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে,

আমাদের শত্রুপক্ষের কোনও লোক?'

অনেকটা সময় জবাব দিল না অ্যালি। ভুরু কুঁচকে কিছু শোনার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি না। মন্দ লোকেরা সবসময় মন্দ চিন্তা করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই হয় ওদের চিন্তাভাবনা।'

আরও কয়েক মিনিট চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। এরপর চোখ খুলে সরে এল দেয়ালের পাশ থেকে।

লিভিং রুমের জানালাটা একদম রাস্তার ওপরে। ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। রাস্তায় সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না। একটু খেয়াল করতেই দেখতে পেল টিফানির সামনের পোর্চ। সিঁড়ির ওপর প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া একটা পত্রিকা পড়ে আছে।

জানালা থেকে সরে এল রানা। ব্যাগদুটো দরজার সামনে নামিয়ে রেখেছিল, ওখানে গিয়ে বের করে নিল ব্যাণ্ডেজ আর অ্যান্টিসেপটিক।

'এদিকে এসো,' অ্যালিকে ডাকল ও। 'তোমার হাতের ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময় হয়েছে।'

রাত আড়াইটা। এক ঘণ্টা হলো ঘুমিয়ে পড়েছে অ্যালি—পূর্বদিকের দেয়ালের গোড়ায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে ও। বিছানা বা বালিশ নেই, কিন্তু ঘুমের কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনও আওয়াজ করছে না ঘুমন্ত অবস্থায়, আচমকা নড়েও উঠছে না। ড্রাগের প্রভাব কেটে যেতে শুরু করেছে, অনুমান করল রানা।

স্বপ্নও দেখছে মেয়েটা—বুঝতে পারছে ও। চোখের পাতা নড়ছে, কপালে মৃদু ভাঁজ দেখা দিচ্ছে... সবই স্বপ্ন দেখার লক্ষণ। তবে রানার চোখে ঘুম নেই, বসে বসে অ্যালিকে পাহারা দিচ্ছে ও। চোখ জানালার দিকে। মাঝে মাঝে গাড়ির

হেডলাইটের আভা দেখা যায় পর্দার ওপারে, কখনও বা নিচের সাইডওয়াক থেকে ভেসে আসে পদশব্দ। সে-রকম কিছু হলেই জানালায় গিয়ে টিফানির বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে ও। তবে এখন পর্যন্ত ফিরতে দেখেনি ডাক্তারকে। পত্রিকাটা সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে আগের মতই।

অ্যাপার্টমেন্টটা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে রানা। মোট পাঁচটা কামরা: কিচেন, লিভিং রুম, একটা বাথরুম আর দুটো বেডরুম। দ্বিতীয় বেডরুমে রয়েছে একটা স্লাইডিং ডোর, সেটা পেরুলে বাড়ির পেছনদিকে একটা ছোট্ট ব্যালকনি। ব্যালকনিটা সরু, দেখতে অনেকটা ফায়ার এস্কেপের মত, ইস্পাতের তৈরি; শুধু মই বা সিঁড়ি নেই, এটুকুই পার্থক্য। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সংকীর্ণ একটা গলি দেখতে পেয়েছে রানা—সামনের রাস্তার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। গলির দুই প্রান্ত দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে আরও কিছু টাউনহাউস, তবে সেগুলো বসতবাড়ি নয়—রিয়াল এস্টেটের অফিস, ট্রাভেল এজেন্সি, কফি শপ, ইত্যাদি। ওগুলোর ফাঁকে রয়েছে বড় বড় গলি, মিশেছে দূরের রাস্তার সঙ্গে।

এ-মুহূর্তে সামনের জানালার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে রানা, যাতে না দাঁড়িয়েই পর্দা ফাঁক করে টিফানির পোর্চের দিকে তাকাতে পারে। চোখ কচলাল ও, গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় ঘুমানোর সুযোগ পায়নি। কখন পাবে, তাও জানে না। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই চোখের পাতা এক হয়ে আসতে চায়, তখন চোখ না কচলে, কিংবা উঠে হাঁটাহাঁটি না করে উপায় নেই।

আবছা শব্দ ভেসে আসছে বাড়িটার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এয়ার-কণ্ডিশনার চলছে, গান বাজাচ্ছে কেউ ওপরতলায়। ভালমত কান পাতলে শোনা যায় হাসাহাসির চাপা আওয়াজ—রাত জেগে পার্টি করছে কারা যেন। জীবন চলছে জীবনের মত।

‘তোমার কখনও ইচ্ছে করে না?’

অ্যালির কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। চোখ খুলেছে ও। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

‘কীসের ইচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এসব ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে? পরিবার শুরু করতে?’

‘কী জানি। কখনও ভাবিনি।’ কথাটা মুখে বলল বটে, কিন্তু পরক্ষণে রানার মানসপটে ভেসে উঠল রেবেকার চেহারা। তাকে নিয়ে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল ও, কিন্তু...

‘সরি,’ বলল অ্যালি। ‘ওকে খুব ভালবাসতে?’

বিব্রত বোধ করল রানা। এ-মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করার উপায় নেই।

‘আমি বোধহয় অনধিকারচর্চা করে ফেলছি, তাই না?’ লজ্জিত গলায় বলল অ্যালি। ‘ক্ষমা চাইছি... আসলে, তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি যা ভাবো তা আমি শুনতে পাই—না চাইলেও। আমারই ভুল, যা শুনছি তা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত হয়নি।’

‘আমি কিছু মনে করিনি, অ্যালি। ঘুমাবার চেষ্টা করো।’

চোখ মুদল মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘তোমার আসলে খুব দ্রুত একটা বিয়ে করে ফেলা উচিত—তোমার ছেলেমেয়েরা খুব ভাল একজন বাবা পাবে। আমি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!’

‘কী!’ যেন আকাশ থেকে পড়ল রানা।

আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল অ্যালি, রানার পাশে এসে বসল, ওকে জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল বুকে। মৃদু হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল রানা।

খানিক পর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল অ্যালির। রানাকে জড়িয়ে ধরে পরম নির্ভরতায় ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

ভোর চারটা। ওপরতলার পার্টি থেমে গেছে। অ্যালির শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

ঝিমুনি এসেছিল রানার, হঠাৎ সচকিত হলো। জানালার পর্দা আলোকিত হয়ে উঠেছে। একটা গাড়ি এসে থামল কোথাও। সাবধানে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা।

কালো একটা সেডান এসে থেমেছে টিফানির বাড়ির সামনে। দু'জন লোক ঝটপট নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, সতর্ক ভঙ্গিতে দেখে নিচ্ছে আশপাশ। ড্রাইভার বসে আছে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে।

'অ্যালি!' চাপা গলায় ডাকল রানা। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল মৃদু।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল অ্যালি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই সচকিত হয়ে উঠল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল সে। জিজ্ঞেস করল, 'এসেছে?'

জবাব না দিয়ে জানালার দিকে ইশারা করল রানা। পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখে নিল অ্যালি, এরপর চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল। যেন কিছু শুনবার চেষ্টা করছে।

'বাড়ির সামনে দু'জন নেমেছে, গাড়িতে আছে আরেকজন,' ফিসফিসিয়ে বলল রানা। 'ওদেরকে পড়তে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি।

'গাড়িতে আর কেউ আছে?'

মাথা নাড়ল অ্যালি।

বাইরে তাকাল রানা। রাস্তা দেখা শেষ হয়েছে লোকদুটোর। এবার সিঁড়ি ধরে উঠে গেল দরজার দিকে, তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। অ্যালি যেন অনুসরণ করছে ওদেরকে—লোকগুলোর মুভমেন্টের সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘুরছে ওর মাথা।

'ওদের চিন্তা থেকে মনে হচ্ছে চেকলিস্ট মেলাচ্ছে,'

বলল অ্যালি। 'কিচেন—ক্লিয়ার... ফ্রন্ট বাথরুম—ক্লিয়ার... হলওয়ে—ক্লিয়ার...'

'সিকিউরিটি সুইপের মত শোনাচ্ছে,' রানা বলল। 'বাড়ির মালিক আসার আগে শিয়োর হয়ে নিচ্ছে, ভেতরে কেউ ঘাপটি মেরে নেই।'

এর অর্থ, বডিগার্ড রয়েছে ডাক্তারের। ইণ্টারেস্টিং!

ওদের মাইণ্ডরিড করে চলেছে অ্যালি। মানসচোখে লোকদুটোকে কল্পনা করল রানা—একটার পর একটা কামরা দেখছে তারা, নিচতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত চেক করছে নিয়ম মেনে।

পাঁচ মিনিট পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লোকদুটো। পোর্চের তলায় সান্ত্রীর মত দাঁড়াল। সিঁড়ির ওপর থেকে সরিয়ে রাখল পত্রিকাটা। ড্রাইভার একাই গাড়ি নিয়ে চলে গেল বাড়ির সামনে থেকে। বিশ মিনিট পর আবার উদয় হলো ওটা। এবার পেছনের দরজা খুলে নামল একটা নারীমূর্তি। স্ট্রিটলাইটের আলোয় তার চেহারা দেখল রানা—হাসপাতালের ওয়েবসাইটে দেখা সেই ডাক্তার! তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল দুই রক্ষী, তারপর আবার ফিরে গেল পাহারায়।

অ্যালি ইতিমধ্যে ডাক্তারের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না, সময় নিচ্ছে তার মন পড়ার জন্যে।

'একটা ইমেইল লিখছেন উনি,' একটু পর বলল ও। 'লিলি নামে কোন্ এক রোগীর ব্যাপারে যেন। কী সব টার্ম ব্যবহার করছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। ওগুলো ওষুধের নাম হতে পারে।'

কপালের দু'পাশ আবার দপ দপ করছে রানার—পাচ্ছে হিমশীতল সেই স্পর্শ। নিশ্চয়ই অ্যালির মাইণ্ডরিডিঙের প্রভাব। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করল। দেখা যাক, কতদূর কী জানা

যায় ডা. ক্যানট্রেলের কাছ থেকে।

'পাঠিয়ে দিয়েছে ইমেইল,' খানিক পর বলল অ্যালি। চোখ খুলল না।

কয়েক মিনিটের নীরবতা। রানার মনে হলো, ধ্যানে বসেছে মেয়েটা। হঠাৎ চোখ মেলল। দেখে মনে হলো, কোনও কারণে চমকে গেছে।

উঠে দাঁড়াল অ্যালি। কোনও এক অমোঘ আকর্ষণে চলে গেল পূর্ব পাশের দেয়ালের কাছে। বিড়বিড় করল, 'হোয়াট দ্য...'

রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। অ্যালির দিকে এগোতে যাবে, এমন সময় একটা শব্দ শুনে জমে গেল। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠেছে কাঠ... ফ্লোরবোর্ডে পা ফেলছে কেউ। ঝট্ করে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজার ওপাশ থেকে আসছে শব্দটা। কেউ হাজির হয়েছে ওখানে!

চব্বিশ

শব্দটা অ্যালির কানেও গেছে। টিফানির ওপর থেকে মনোযোগ টুটে গেল ওর। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। ফ্যাল ফ্যাল করে প্রথমে দরজা, তারপর রানার দিকে তাকাল।

ঝুঁকে মেঝেতে রাখা পিস্তলটা তুলে নিল রানা। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, থামল দশ ফুট দূরে। অ্যালিও এল ওর সঙ্গে।

দরজার পাল্লার তলায় ছোট্ট একটা ফাঁক, সেখানে চোখ ফেলল রানা। সিঁড়ির আবছা আলো ঢুকছে ওখান দিয়ে, তবে পুরোপুরি নয়। বাধা পাচ্ছে দু'জায়গায়। দুটো পা রয়েছে ওখানে... মানুষের পা। কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। সিঁড়ি ধরে ওপরে যাচ্ছে না, নিচেও নামছে না। দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

আধ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের ভেতরে সমস্ত সম্ভাবনা যাচাই করল রানা, নিয়ে ফেলল সিদ্ধান্ত। না, কোনও ঝুঁকি নেয়া চলে না। মনে মনে কথা বলল অ্যালির সঙ্গে।

পেছনের বেডরুমে চলে যাও। ব্যালকনির দরজাটা খোলো। আমি তোমার পেছনে থাকছি।

দ্বিধা. করল না অ্যালি। ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ার মাঝে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে ওকে অনুসরণ করল রানা, তবে পিছনে হেঁটে। হাতের সিগ-সাওয়ার তাক করে রেখেছে সামনের দরজার দিকে। বেডরুমের দরজায় পৌঁছুতেই শুনতে পেল স্লাইডিং ডোর খুলে যাবার আওয়াজ। ধাতব মেঝেতে পায়ের শব্দও শুনল—ব্যালকনিতে বেরিয়ে গেছে অ্যালি।

পিছাতে পিছাতে স্লাইডিং ডোরের কাছে পৌঁছুল রানা, এখনও উল্টো, ঘোরেনি। বেডরুমের খোলা দরজা, আর প্যাসেজ পেরিয়ে সামনের দরজাটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। দরজার তলায় পায়ের ছায়াদুটো রয়েছে এখনও। ব্যালকনিতে সবে পা দিয়েছে, এমন সময় নড়ে উঠল দরজার হাতল। আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল অ্যালি।

ঘুরে রেলিঙের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল রানা। দশ ফুট নিচে মাটি। গলিটা আগেই দেখে নিয়েছে, এস্কেপ রুট হিসেবে চমৎকার—ছায়ায় ঢাকা, কোনও ধরনের বাধা নেই, এক দৌড়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছুনো যাবে।

'এসো,' রেলিঙের ওপর পা তুলতে তুলতে বলল রানা।

‘লাফ দিতে হবে আমাদেরকে।’

‘হাত-পা ভাঙব তো!’ অ্যালির গলায় শঙ্কা।

‘না, ভাঙবে না। কারণ আমি আগে নামছি। এরপর তুমি লাফ দেবে। নিচ থেকে আমি তোমাকে ধরব।’

রেলিঙের ওপর বসে দু’পা ঝুলিয়ে দিল রানা। পিস্তলটা ইতিমধ্যে গুঁজে নিয়েছে ওয়েস্টব্যাণ্ডে। রেলিঙের ওপর দু’হাতের ধাক্কায় আলতো এক ঝাঁপ দিল বাতাসে। মাটিতে পা ঠেকতেই হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল, পরক্ষণে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। উঁচু জায়গা থেকে লাফ দেবার কায়দা এটাই।

সোজা হয়ে অ্যালিকে ইশারা দিল ও। রানাকে অনুকরণ করে ইতিমধ্যে রেলিঙে বসে পড়েছে মেয়েটা। ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ ভেসে এল অ্যাপার্টমেন্টের দরজা থেকে। কেউ লাথি দিচ্ছে পাল্লায়। কেঁপে উঠল অ্যালি, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল নিচে।

তবে তৈরি ছিল রানা। দু’হাতে লুফে নিল ওকে। সাবধানে নামাল মাটিতে।

‘ওরা এসে গেছে!’ ভয়ার্ত গলায় বলল অ্যালি।

‘জানি,’ বলল রানা শান্ত গলায়। ‘দৌড়াও।’

ছুটতে শুরু করল দু’জনে। রানার এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে ধরে রেখেছে অ্যালির হাত। গলি পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছুবার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেণ্ডের মাথায় মড়মড়ানি শোনা গেল, অ্যাপার্টমেন্টের দরজা ভেঙে ফেলেছে অচেনা হানাদার। সেই শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ শোনা গেল খুব কাছ থেকে।

শটগান লোড করার আওয়াজ... ভেসে এসেছে দশ ফুট সামনে, গলির গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে।

থমকে দাঁড়াল রানা, অ্যালির হাত টেনে ধরল।

পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আলোয়। শটগানের ওপরে

লাগানো ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠেছে। একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল তার পেছন থেকে। 'একচুল নড়বে না! আমার দিকে পিস্তল ওঠালেই গুলি করব তোমাকে।'

গলা শুনেই বুঝল রানা, ধাপ্পা দিচ্ছে না। তারপরেও ঝুঁকি নেবে কি না ভাবল। সমস্যা হলো, অ্যালি একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। শটগানে যদি বাকশট ভরা থাকে, গুলি করলে ও-ও আহত হবে। অগত্যা আদেশটা না মেনে গতি নেই।

একটু অপেক্ষা করল নারীকণ্ঠ। তারপর বলল, 'পিস্তলের ম্যাগাজিন খোলো... সাবধানে! চেম্বারের বুলেটটাও বের করবে। এরপর অস্ত্রটা ফেলে দেবে মাটিতে।'

পেছনে ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে কেউ একজন লাফ দিয়ে নেমেছে নিচে।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন?' সামনে থেকে ভেসে এল ধমক।

নিঃশব্দে সিগ-সাওয়ারের ম্যাগাজিন খুলল রানা, চেম্বার খালি করল। অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিল সামনে। পায়ের শব্দ শুনল। পেছন থেকে এগিয়ে এসেছে দ্বিতীয় শত্রু। শটগানের লাইন অভ ফায়ার এড়িয়ে একটু পাশে গিয়ে পজিশন নিয়েছে।

ঝনঝন করে কিছু একটা আছড়ে পড়ল সামনে। একজোড়া হ্যাণ্ডকাফ। চকচক করছে আলোয়।

'উল্টো ঘোরো,' হুকুম এল। 'হাঁটু গেড়ে বসো। এরপর হাতদুটো পেছনে নিয়ে পরে ফেলো হ্যাণ্ডকাফ।'

ঘুরল রানা। পালন করল হুকুম। ক্লিক জাতীয় শব্দ তুলে দু'কবজিতে আটকে গেল হ্যাণ্ডকাফ।

এবার এগিয়ে এল দ্বিতীয়জন, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় তাকে দেখতে পেল রানা। আরেকটা মেয়ে। পরনে গাঢ় পোশাক।

হঠাৎ উদয় হওয়া দুই নারীর দিকে পালা করে তাকাচ্ছে অ্যালি। ওর চেহারায় বিস্ময়।

‘তোমরা কারা?’ জিজ্ঞেস করল ও। ‘আমি তোমাদের কারোরই চিন্তা শুনতে পাচ্ছি না কেন?’

‘না পাওয়ারই কথা, ডিয়ার,’ হাসিমুখে বলল দ্বিতীয় নারী।

কাছে এসে রানাকে ধাক্কা দিল সে, উপুড় করে ফেলল মাটিতে। পিঠে চড়ে বসল। পিন-গাঁথা প্রজাপতির মত দশা হলো রানার, নড়তে পারছে না। প্লাস্টিক ছেঁড়ার একটা আওয়াজ শুনতে পেল, প্যাকেট থেকে বের করা হচ্ছে কী যেন।

‘কী করছ তুমি ওকে নিয়ে?’ আতঙ্কিত গলায় জানতে চাইল অ্যালি।

‘শান্ত হও,’ ওকে বলল দ্বিতীয় নারী।

কিন্তু শান্ত হলো না অ্যালি। চেঁচিয়ে উঠল, ‘কী করছ তুমি?’

আরও কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু চাপা পড়ে গেল গলা। প্রথম মেয়েটি এগিয়ে এসে ওর মুখ চেপে ধরেছে।

এক মুহূর্ত পরেই ঘাড়ে সুঁইয়ের গুঁতো অনুভব করল রানা—ইঞ্জেকশন দেয়া হচ্ছে ওকে। প্লাঞ্জারে চাপ দিতেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল চামড়ার তলায়।

‘থামো!’ কোনোমতে মুখ ছাড়িয়ে চেঁচাল অ্যালি। ‘ঈশ্বরের দোহাই, থামাও এসব!’

রানাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দ্বিতীয় নারী। অ্যালির সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে পেরে উঠছে না প্রথমজন, সাহায্য করল তাকে। কষ্টেসৃষ্টে চিৎ হলো রানা, কিন্তু দেখতে পেল না ওদেরকে। চোখের ওপর ধূসর একটা পর্দা নেমে আসছে যেন। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে উত্তাপ। দেহের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল, উন্মুক্ত হলো অতল এক গহ্বর। সেখানে পড়ে গেল ও। হারিয়ে গেল সব শব্দ, নেমে এল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

পঁচিশ

মোলায়েম একটা কণ্ঠ শুনে জেগে উঠল রানা—ধীরে ধীরে। যেন অন্ধকার থেকে একটু একটু করে ফিরে এল আলোয়। মাঝখানে কতটা সময় পেরিয়েছে বলতে পারবে না। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের মাঝে শুনেছে কেবল নানা ধরনের শব্দ—মানুষের গলা, গাড়ির আওয়াজ, জেট ইঞ্জিনের গর্জন, ইত্যাদি। আস্তে আস্তে চোখ মেলল ও। চোখে পড়ল অচেনা একটা ছাত। গায়ের নিচে নরম গদি—কাউচে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ঢোক গিলতে কষ্ট হলো। খসখসে হয়ে আছে গলা, যেন কেউ শিরিষ কাগজ ঘষে দিয়েছে জিভের ভেতরদিকে।

'এটা খাও।'

অ্যালির গলা। মাথা ঘোরাতেই দেখতে পেল মেয়েটাকে—একটা জুসের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরেছে ওর দিকে, প্যাকেট থেকে বেরিয়ে আছে স্ট্র। কোনও কথা না বলে স্ট্র-টা মুখে নিল রানা, চোঁ চোঁ করে খানিকটা জুস চালান করল উদরে। গলা থেকে খসখসে ভাবটা দূর হলো কিছুটা, একই সঙ্গে সাড়া ফিরে পেল শরীরে।

নড়তে গিয়ে টের পেল রানা, ওর হাত থেকে হ্যাণ্ডকাফ খোলা হয়নি এখনও। কামরাটার ওপর নজর দিল। ছোট্ট একটা স্টাডি, দেয়ালগুলো বিবর্ণ। কোনও জানালা নেই। একপাশের দরজা গলে ঢুকছে আলো। কাউচ থেকে দরজার

ওপাশটা দেখা যাচ্ছে না।

'আমরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'বাড়িতে,' বলল অ্যালি।

'কার বাড়ি?' ভ্রূকুটি করল রানা। 'তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। 'আমাদের।' এক ধরনের উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল কণ্ঠে। পরিচয়ের পর এই প্রথম ওকে খুশি হতে দেখছে রানা।

মাথা এখনও দপ দপ করছে রানার, সঙ্গে রয়েছে ঠাণ্ডা স্পর্শের অনুভূতিটা। এখন তা আগের চেয়ে তীব্র... প্রায় তিনগুণ বলা চলে। কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হলো না। গলি ধরে পালাবার প্ল্যান মনে মনে ভেবেছিল ও, কাউকে জানায়নি। অথচ তারপরেও ওখানে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল অচেনা মেয়েটা।

'ওরাও মাইণ্ডরিডার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আবার মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। 'হ্যাঁ। ফোর্ট ডেট্রিকের ফসল—আমার মত। পাঁচ বছর আগে আমরা তিনজনই নাকি একসঙ্গে পালিয়েছিলাম ওখান থেকে। এরপর গা ঢাকা দিয়েছিলাম। ওদের মুখে অনেক কিছু শুনলাম। আমিও গত কয়েকদিনের ঘটনা জানিয়েছি ওদেরকে। আমার কথা অবিশ্বাস করছে না, তবে তোমার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাইছে... নিশ্চিত হতে চাইছে, তোমার ওপর ভরসা করা যায় কি না। তারপর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেবে। তোমার তাতে আপত্তি নেই তো?'

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল রানা। বলল, 'ডাকো ওদেরকে।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল অ্যালি।

'দাঁড়াও,' কী যেন মনে পড়েছে রানার, থামাল ওকে। 'একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও।'

'কী প্রশ্ন?'

'টিফানি ক্যানট্রেলের ব্যাপারে। শেষ মুহূর্তে ওর চিন্তায়

অস্বাভাবিক কিছু একটা শুনতে পেয়েছিলে তুমি, তাই না? মানে... আমরা আক্রান্ত হবার ঠিক আগ মুহূর্তে?'

চেহারায় মেঘ জমল অ্যালির।

'কী শুনতে পেয়েছিলে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা ফোন করার কথা ভাবছিল সে। জরুরি একটা ফোন। ফোন করে কী বলবে, তা ঠিক করে নিচ্ছিল মনে মনে। আমি শুধু প্রথম অংশটা শুনেছি।'

'কী?'

'মি. অ্যালেক্স লিয়ারি কি আছেন? আমি টিফানি ক্যানট্রেল। তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল অ্যালি। রানার কপালে তখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

একটু পরেই দুই যুবতীকে নিয়ে ফিরে এল অ্যালি। উজ্জ্বল আলোয় এই প্রথম তাদেরকে দেখল রানা। দু'জনেরই বয়স ত্রিশের আশপাশে। মাঝারি গড়ন, মাঝারি উচ্চতা। একজন স্বর্ণকেশী, অন্যজনের চুল কালচে-বাদামি। সাদামাটা চেহারা। লিপস্টিক, আই শ্যাডো, মেকআপ... কিছুই নেই মুখে। সম্ভবত ইচ্ছে করেই কোনও সাজগোজ করেনি, নিজেদের যতটা সম্ভব অনাকর্ষণীয় করে রাখতে চায়, যাতে কেউ মনে না রাখে ওদেরকে।

রানার কাউচের মুখোমুখি আরেকটা কাউচ আছে, সেটায় বসল দুই যুবতী। স্বর্ণকেশী বলল, 'আমি এলিনা। আর ও হলো ভেরোনিকা।'

গলিতে দেখা বৈরিতা উধাও হয়েছে ওদের হাবভাব থেকে। তবে ওখানকার ঘটনার জন্যে বিব্রত বা দুঃখিত মনে হলো না। রানা কিছু মনে করল না। যখন পরিস্থিতির প্রয়োজনে কঠোর হতে হয় কাউকে, পরে সে-নিয়ে বিব্রত বা দুঃখিত হবার কিছু নেই।

'ঠিক,' একমত হলো ভেরোনিকা—রানার মন পড়ছে

সে। 'পরিস্থিতির প্রয়োজনেই অমনটা করতে হয়েছে আমাদেরকে। আমরা তো জানতাম না তুমি কে। টিফানি ক্যানট্রেলের বাড়ির ওপর নজর রাখছিলাম, এমন সময় তোমরা হাজির হলে ওখানে। স্বভাবতই সন্দিহান হয়ে উঠলাম।'

'ওখানে তো সারাদিনই মানুষ আসা-যাওয়া করে,' রানা বলল। 'আমাদের ওপর আলাদা করে নজর পড়ল কেন?'

'কারণ, দেখলাম নতুন দু'জন মানুষ উদয় হয়েছে, তাদের একজনের চিন্তা পড়তে পারছি না। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছ... আমরা অ্যালির মনের কথা শুনতে পাই না। মাইণ্ডরিডাররা কেউই কারোটা শুনতে পায় না। যা হোক, তোমাদের ওপর মনোযোগ দিলাম আমরা। তোমার চিন্তাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম পরিষ্কার। সেখান থেকেই জানলাম, অ্যালি তোমার সঙ্গে আছে... ওকে নিয়েই সারাক্ষণ ভাবছিলে তুমি। ও যে স্মৃতি হারিয়েছে, তাও তোমার ভাবনা থেকেই জানলাম। তোমার আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছিল না, তা ছাড়া স্মৃতি হারানোয় অ্যালিও আমাদেরকে চিনতে পারবে না... তাই সবদিক ভেবে তোমাদেরকে তুলে আনাই ভাল বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে, যাতে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে ভালমত জেরা করা যায় তোমাকে।'

'বেশি সময় নেব না আমরা,' বলল এলিনা। 'আমাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও, এরপর আমরা তোমার প্রশ্নের জবাব দেব... যতটা পারা যায় আর কী। কী বলো, তুমি রাজি?'

সায় জানাল রানা।

পরের আধঘণ্টা রানাকে জেরা করল এলিনা আর ভেরোনিকা। অ্যালির কাছে সব শুনেছে, তারপরও রানার মুখ থেকে আবার শুনল সব—ওর অতীত, বর্তমান, এল্ সেডেরোয় উপস্থিত হবার কারণ, অ্যালিকে উদ্ধার ও তার

পরের ঘটনা, ইত্যাদি। কিছু লুকাল না রানা, সে-চেষ্টা করে লাভ নেই। অকপটে বলল সব।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্তুষ্ট দেখাল দুই মাইণ্ডরিডারকে। পকেট থেকে একটা চাবি বের করে রানার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিল এলিনা। দু'হাতের কবজি ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল রানা।

'তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?' বলল ভেরোনিকা। 'চলো, লাঞ্চ করতে করতে আমাদের গল্প শোনাব। টেবিল সাজানোর ফাঁকে অ্যালি তোমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাবে।'

কাউচ থেকে উঠে পড়ল রানা। অ্যালির পিছু পিছু বেরিয়ে এল কামরা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। সাধারণ কোনও বাড়ি ভেবেছিল জায়গাটাকে, আদপে তা নয়।

বিশাল এক লিভিং রুম দেখতে পেল রানা, দেয়ালটা কাঁচের তৈরি। শুধু তা-ই নয়, লিভিং রুমটা মাটি থেকে অন্তত সত্তর-আশি তলা ওপরে! কাঁচের ওপারে বিশাল এক নগরী, সবকিছু কেমন যেন খুদে দেখাচ্ছে। সময়টা দুপুর, নীল আকাশের নিচে কড়া রোদে স্নান করছে নগরীর উঁচু-নিচু বিল্ডিং আর রাস্তাঘাট। ভাল করে তাকাতেই একটা আকাশছোঁয়া বিল্ডিং চিনতে পারল—উইলিস টাওয়ার... বাংলাদেশি স্থপতি এফ. আর. খানের তৈরি করা বিশ্ববিখ্যাত ইমারত, আগে যেটা সিয়ার্স টাওয়ার নামে পরিচিত ছিল। এর অর্থ, শিকাগোয় রয়েছে ও।

'আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে, শিকাগোর হ্যানকক সেন্টারে,' পেছন থেকে বলল এলিনা। 'তিরাশি নম্বর ফ্লোরের পুরোটা জুড়ে আমাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। চোখে বিস্ময়। 'আর এটা কিনা তোমাদের হাইডআউট?'

হাসল এলিনা। 'হ্যাঁ। গা-ঢাকা দেবার জন্যে জায়গাটা যে কত ভাল, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ধনী লোকেরা

নিজেদের সুবিধের জন্যে আইনে হাজারটা ফাঁকফোকর রেখেছে। চাইলেই এরকম একটা জায়গা বেনামে কেনা যায়... কোনও ধরনের পেপার ট্রেইল ছাড়াই! সাধারণ কোনও বাড়ির বেলায় সেটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এখানে আমাদেরকে খোঁজার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না।'

'আরেকটা কারণ আছে এখানে বাস করার,' বলল ভেরোনিকা। 'তবে এ-মুহূর্তে সেটা তোমার না জানলেও চলবে। বরং প্রার্থনা করো, জানার মত পরিস্থিতি যেন দেখা না দেয়।'

রানার হাত ধরে টানল অ্যালি, অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। পা বাড়াতে গেল রানা, কিন্তু পেছন থেকে ডেকে উঠল এলিনা।

'দাঁড়াও।'

এগিয়ে এল সে। হাতে রানার সিগ-সাওয়ার, ম্যাগাজিনটা গ্রিপে লোড করে দেয়া হয়েছে। বাড়িয়ে ধরল ওটা।

'আমরা কৃতজ্ঞ, রানা,' বলল এলিনা, 'অ্যালির জন্যে এতকিছু করেছ বলে। প্রতিদান হিসেবে আর কিছু না হোক, অন্তত তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি আমরা।'

মৃদু মাথা ঝোঁকাল রানা। বাড়ানো হাত থেকে নিল পিস্তলটা। সেফটি চেক করে, গুঁজে রাখল ওয়েস্টব্যাণ্ডে। এরপর অ্যালির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্লোরটার ঠিক মাঝখানে মস্ত ফাঁকা জায়গা, অনেকটা হলঘরের মত। সেটার চারদিকে তৈরি করা হয়েছে সবগুলো কামরা। লিভিং রুমের পাশে কিচেন আর ডাইনিং রুম। ওটা দক্ষিণ দিক। উত্তরের প্রায় পুরো উইংটাই একটা বিরাট লাইব্রেরির দখলে। পূর্ব আর পশ্চিমের উইংদুটো বসবাসের জন্যে—প্রমাণ সাইজের ছ'টা বেডরুম আছে।

পশ্চিমের একদম কোনার রুমটা অ্যালির, ওখানে রানাকে

নিয়ে গেল সে। ভেতরে ঢুকে বিস্মিত হলো রানা—কামরাটা অগোছালো, দেখে মনে হচ্ছে নিয়মিত ব্যবহার হয় ওটা।

'আসলে তা নয়,' রানার মনের কথা পড়ে বলল অ্যালি। 'গত দু'মাস থেকে এভাবে পড়ে আছে কামরাটা, কেউ গোছায়নি। আমি যখন ধরা পড়লাম, এলিনা আর ভেরোনিকা পালিয়ে গিয়েছিল। ওরা ভয় পাচ্ছিল, আমাকে ইন্টারোগেট করে এখানকার ঠিকানা জেনে নিতে পারে লিয়ারি।'

বিছানার দিকে এগিয়ে গেল ও। নীল রঙের একটা তুলতুলে পুতুল—একটা ডায়নোসর—পড়ে আছে বালিশের পাশে। কম্বলে ঢাকা পড়ে আছে খানিকটা। ঝুঁকে পুতুলটা তুলে নিল অ্যালি।

'ওদের ধারণা, এসব দেখলে আমার স্মৃতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে,' বলল ও।

'সেটা অস্বাভাবিক নয়। স্মৃতি ফেরানোর জন্যে ডাক্তাররা পরিচিত পরিবেশে থাকার পরামর্শ দেয়।'

পুতুলের গায়ে হাত বোলাল অ্যালি। 'কাজ বোধহয় কিছুটা হচ্ছে। পুতুলটা চেনা চেনা লাগছে আমার। এটার একটা নামও দিয়েছিলাম আমি। নামটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না।'

ভুরু কুঁচকে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। চেষ্টা করছে নামটা স্মরণ করার। একটু পর হার মানল। পুতুলটা আবার নামিয়ে রাখল বিছানায়।

'সময় দাও,' ওকে বলল রানা। 'অস্থির হয়ো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অ্যালি, কিন্তু চোখের তারা থেকে অস্বস্তি দূর হলো না।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আস্তে শ্বাস ফেলল অ্যালি। 'খুব শীঘ্রি দেখতে পাবে।'

'বাইশ বছর বয়সে জেলে যাই আমি,' বলল এলিনা।

'কীসের জন্যে, সেটা বলব না।'

ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে আছে চারজনে, খেতে খেতে কথা বলছে। বাইরে মেঘ জমেছে। হ্যানকক সেন্টারের চূড়ায় জমাট বেঁধেছে কুয়াশা, ঢাকা পড়ে গেছে কাঁচের ওপারের সবকিছু। নিচের শহর অদৃশ্য হয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা থেকে।

'আগেও ছোটখাট অপরাধ করেছিলাম, কাজেই সেবার ষোলো বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলো,' বলে চলেছে এলিনা, 'অন্তত বারো বছর না কাটলে প্যারোলের কোনও সম্ভাবনা নেই। জেলে যাবার পর মাসখানেক কাটল, এরপরেই এক লোক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। না, ভিজিটর'স্ রুমে নয়... একেবারে আমার কামরায়! মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, সে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। কারাগারের চিফ অভ গার্ডস্-ও ছিল তার সঙ্গে—বিরক্ত চেহারা নিয়ে, তবে সে কোনও কথা বলছিল না। যা বলার বলল অচেনা লোকটাই। বলল, চাইলে সে-রাতেই কারাগার থেকে ছাড়া পেতে পারি আমি—যদি লোকটার সঙ্গে যেতে রাজি হই আর কী। আমাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাবে সে, ওখানে দু'বছর কাটাতে হবে। আর দু'বছর পর আমি সম্পূর্ণ মুক্তি পাব।

'বিস্তারিত জানতে চাইলাম। লোকটা তখন ব্যাখ্যা করল, যেখানে আমাকে রাখা হবে, সেটা একটা ডরমিটরির মত... আর্মির ডরমিটরি। মিলিটারির তত্ত্বাবধানে একটা ড্রাগের পরীক্ষা চালানো হবে আমার ওপর। প্রথম দু'সপ্তাহে তিনটে ইঞ্জেকশন দেয়া হবে আমাকে, লোকটার ভাষায় সেটা একটা আর.এন.এ. ইন্টারফ্যারেন্স ড্রাগ। এরপর আর কোনও কাজ নেই। বিশ্রাম নিতে পারব আমি, ইচ্ছেমত সময় কাটাতে পারব... ওরা মাঝে মাঝে ড্রাগের রিঅ্যাকশন চেক করে দেখবে। সবচেয়ে বড় কথা, ইঞ্জেকশনের ফলে কিছু ঘটুক বা

না-ঘটুক, দু'বছর ফুরোলে মুক্তি দেয়া হবে আমাকে। পুরনো সব ক্রিমিনাল রেকর্ড মুছে দেয়া হবে, যাতে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারি। আমাকে বোঝাল, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে চব্বিশ বছর বয়সে আবার সমাজে ফিরে যেতে পারব আমি, জেলে থাকলে চৌত্রিশ বছরের আগে ছাড়া পাবার কোনও সুযোগ নেই। তা ছাড়া তখন জেলখাটা দাগী আসামী হিসেবে বেরোতে হবে, নিষ্কলুষ রেকর্ড নিয়ে নয়। আমাকে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলল সে।

'ভাবাভাবির আসলে কিছু ছিল না। এক মাসেই জীবন নরক হয়ে উঠেছিল আমার। দু-দু'বার শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছি, ধর্ষিত হয়েছি। ওখানে বারো কিংবা ষোলো বছর তো দূরের কথা, আর একটা দিনও কাটাবার মত শক্তি ছিল না আমার। ভাবছিলাম আত্মহত্যার কথা। সে-অবস্থায় লোকটা যেন দেবদূতের মত হাজির হয়েছিল আমার সামনে। ড্রাগ ট্রায়াল নিয়ে মাথা ঘামালাম না। জেল থেকে বেরুনোটাই হলো আসল কথা! ট্রায়ালে যদি মারাও যাই, কী এসে-যায় তাতে? আমি তো এমনিতেই মরবার কথা ভাবছিলাম।'

'আমার অভিজ্ঞতাও অনেকটা একই রকম,' বলল ভেরোনিকা। 'খুব বাজে একটা জায়গায় আটকা পড়েছিলাম—একটা পতিতালয়ে... সেখান থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছিল আমাকে...'

পালা করে নিজেদের কাহিনী বলে চলল দু'জনে। বিপন্ন অবস্থায় অচেনা দুই লোক এসে প্রস্তাব দেয় ওদেরকে, দু'জনেই সেটা গ্রহণ করে। এরপর ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ফোর্ট ডেট্রিকে। সেখানকার একটা ডরমিটরিতে থাকতে দেয়া হয়। টিভিতে বা সিনেমায় যে-সব ডরমিটরি দেখা যায়, ওটাও সে-রকমই ছিল; পার্থক্য হলো, ওখান থেকে বেরুবার অনুমতি ছিল না ওদের। ওরা ছাড়াও আরও আটজন মেয়ে থাকত ওখানে—সবারই বয়স মোটামুটি একই রেঞ্জে;

সবাইকেই একই কায়দায় রিক্রুট করা হয়েছে। অল্পদিনেই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সবার। মিলেমিশে ডরমিটরিতে থাকতে শুরু করেছিল ওরা। পরিবেশ নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ ছিল না। অন্তত জেলের মত বাজে পরিবেশ ছিল না ওখানে।

ফোর্ট ডেট্রিকে যেদিন পৌঁছুল, সেদিনই প্রথম ইঞ্জেকশনটা দেয়া হয় ওদের। আলাদা কোনও বিশেষত্ব ছিল না ওটার, মেয়েদের কাছে ইঞ্জেকশনটা নিছক একটা টিটেনাস শটের মত লেগেছে। ইঞ্জেকশনের দায়িত্বে থাকা মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান বলেছিল, জ্বর-টর আসতে পারে, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। পরের দু'সপ্তাহে বাকি দুটো ইঞ্জেকশন দেয়া হলো, তারপরেও কিছু হলো না। ইঞ্জেকশনের কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়ল না কারও ওপর। পরবর্তী দু'মাস কাটল ওভাবেই।

দলের একটি মেয়ে বিজ্ঞানে লেখাপড়া করেছে, সে বলল, ওরা সম্ভবত *কণ্ট্রোল গ্রুপ*। বড় ধরনের যে-কোনও এক্সপেরিমেন্টে দু'ভাগে ভাগ করা হয় টেস্ট সাবজেক্টদের। একদলকে সত্যিকার ওষুধ দেয়া হয়, আরেক দলকে দেয়া হয় সাধারণ স্যালাইন... এই দ্বিতীয় দলটাই কণ্ট্রোল গ্রুপ নামে পরিচিত। এরপর দু'দলের মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওষুধের প্রভাব ও কার্যকারিতা বিচার করা হয়। মেয়েটি ধারণা করল, ওরা সেই কণ্ট্রোল গ্রুপে পড়েছে। কথাটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। ওষুধ-টষুধ ছাড়া ওখানে দু'বছর কাটিয়ে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কী হতে পারে?

কিন্তু তৃতীয় মাসের মাঝ নাগাদ বদলে গেল সবকিছু। দেখা দিল ওষুধের রিঅ্যাকশন। প্রথমে ছাড়া-ছাড়াভাবে, তখন পাত্তা দেয়নি কেউ; পরে সেটা এমন আকার ধারণ করল যে, অগ্রাহ্য করবার উপায় রইল না। অবশ্য তখনও সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করেনি কেউ, সবাই ভেবেছে ওটা

তাদের নিজস্ব সমস্যা। কারণ, ওটা ডরমিটরির অন্যান্যদের ওপর কাজ করে না; কাজ করে কেবল বাইরের লোকের ওপরে। মেডিক্যাল স্টাফরা যখন দেখা করতে আসে, কিংবা ডরমিটরির পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে বা গাড়ি নিয়ে যায়, শুধুমাত্র তখনই ব্যাপারটা অনুভব করে ওরা। ব্যাপারটা প্রায় এক সপ্তাহ নিজেদের ভেতর চেপে রাখল ওরা; ভাবল, কাউকে বলতে গেলে তাকে মানসিক রোগী ভাবা হবে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের দেয়ালটা ধসে পড়ল আচমকা। সপ্তাহে দু'দিন রুটিন মেডিক্যাল টেস্ট করা হয় মেয়েদের। এমনই একটা দিনে টেস্টের ফাঁকে হঠাৎ এক মেডিক্যাল স্টাফ জানতে চাইল, ওদের কেউ মাথার ভেতর অচেনা কোনও কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে কি না। এমন কিছু কি শুনতে পাচ্ছে, যা তারা নিজেরা ভাবছে না?

যে-মেয়েটিকে প্রশ্নটা করা হলো, সে চমকে উঠল। স্বীকার করল, সত্যিই সেটা ঘটছে; কিন্তু কেন ঘটছে বুঝতে পারছে না। অন্যেরা শুনতে পেল তার কথা, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেল সবার। এগিয়ে এসে জানাল, এই ব্যাপার ঘটছে তাদেরও। ওদের কথা শুনে পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করল সেই স্টাফ, যোগাযোগ করল কারও সঙ্গে। ব্যস, ওখানেই ইতি ঘটল ওদের ডরমিটরি জীবনের।

পরের এক ঘণ্টার ভেতর মেয়েদের সবাইকে আলাদা করে ফেলা হলো, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ভিন্ন ভিন্ন বিল্ডিঙে। এবার আর ডরমিটরি নয়, খাঁচার ভেতর স্থান হলো প্রত্যেকের। গরাদেঅলা ছোট ছোট যে-কামরাগুলোয় থাকতে দেয়া হলো ওদের, তার সঙ্গে খাঁচা বা কারাপ্রকোষ্ঠের বিশেষ তফাৎ ছিল না। নতুন একদল মানুষ এরপর উদয় হলো—মাঝবয়েসী, বিজ্ঞানীসুলভ চেহারা; কেউ বা আবার ইউনিফর্ম পরিহিত মিলিটারি অফিসার। মেয়েদের ওপর গবেষণা চালাতে শুরু করল তারা, ঠিক যেভাবে ল্যাবরেটরির

ইঁদুরের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এক হিসেবে ইঁদুরেই পরিণত হলো ওরা, কারণ মানুষ হিসেবে ওদেরকে আর গণ্য করছিল না কেউ। গবেষকরা ওদেরকে নিয়ে আলোচনা করত, কিন্তু ওদের সঙ্গে কোনও কথা বলত না। এমন একটা ভাব দেখাত, যেন ওদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

'লোকগুলোর চিন্তা থেকেই জানতে পেরেছিলাম, আমাদের মুক্তি নেই,' বলল এলিনা। 'দু'বছরে তো নয়ই, জীবদ্দশাতেই আমাদের ছেড়ে দেবার কোনও পরিকল্পনা নেই তাদের। সবচেয়ে ভয়ের কথা, ওরা জানত আমরা ওদের মন পড়তে পারি, কিন্তু পরোয়া করত না। যেন আমাদের শোনাবার জন্যে সামনে এসে ভাবত ওসব কথা। ভাব দেখে বুঝতাম, আমরা কী জানছি বা না-জানছি, তাতে কিছুই আসে-যায় না। ওদের জাল থেকে মুক্তি পাব না আমরা কোনোদিনই।'

'শুরুতে আমাদেরকে আড়ি পাতার কাজে ব্যবহারের কথা ভাবছিল ওরা,' ভেরোনিকা বলল। 'গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ভিভিআইপি-রা যখন হোটেলে ওঠে, তখন আমাদেরকে ছদ্মবেশে তাদের পাশের কামরায় রাখবে, যাতে আমরা আড়ি পেতে ওদের মনের সমস্ত খবর জেনে নিতে পারি। সোজা কথায়, এক ধরনের লিসেনিং ডিভাইস বানাতে চাইছিল... মনের লিসেনিং ডিভাইস। বুদ্ধিটা একেবারে মন্দ নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা করা হলো না।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বিজ্ঞানীরাই বাগড়া দিলেন। বললেন, আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ফেজে রয়েছি, সে-অবস্থায় আমাদের ফিল্ডে পাঠানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তারচেয়ে আমাদের দশজনকে পুরোপুরিভাবেই ল্যাব টেস্টে রাখা হোক। ড্রাগটার লং টার্ম এফেক্ট পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁরা। মানবশরীরে ড্রাগটা কতদিন কার্যকর থাকে, জানা দরকার তাঁদের। সময়ের সঙ্গে

মাইণ্ডরিডিঙের ক্ষমতা বাড়ে-কমে কি না, ড্রাগের কারণে শরীরে কোনও মরণব্যাধি—যেমন ধরো ক্যান্সার, নিউরন ডিজিজ, হার্টের সমস্যা, আলঝেইমার'স্, ইত্যাদি—দেখা দেয় কি না... এসবের ওপর গবেষণা চলবে।'

'ওরা আসলে আমাদের টেস্টের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মাইণ্ডরিডার সৃষ্টি করতে চাইছিল, যাদের ভেতরে কোনও ধরনের সমস্যা থাকবে না,' বলল এলিনা। 'সুস্থ, সবল, ত্রুটিহীন একদল মাইণ্ডরিডার।'

'বুঝতে পারছি,' বলল রানা।

'চরম সত্যটা বুঝতে পেরে আমাদের মনের কী দশা হয়েছিল, আন্দাজ করতে পারো? যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি পেতে চলেছিলাম আমরা। যতদিন বেঁচে থাকব, ল্যাবরেটরির গিনিপিগ হয়ে থাকতে হবে। বয়স ছাড়া আর কিচ্ছু বদলাবে না আমাদের... যতদিন না কবরে যাচ্ছি! মুষড়ে পড়েছিলাম সবাই। আর তখুনি একটা নতুন ঘটনা ঘটল। অ্যাম্বার মিচেল নামে একটা মেয়ে ছিল আমাদের মাঝে। একটা রুটিন মেডিক্যাল চেকআপের সময় আবিষ্কৃত হলো, সে প্রেগন্যান্ট। ড্রাগ ট্রায়ালে যোগ দেবার ঠিক আগেভাগে মেয়েটা গর্ভধারণ করেছিল, কিন্তু সেটা কেউ জানত না।'

একযোগে অ্যালির দিকে তাকাল এলিনা আর ভেরোনিকা। গল্পের এ-অংশটা ওকে আগেই জানিয়েছে ওরা, কিন্তু তারপরেও অ্যালিকে আবেগাপ্লুত হতে দেখল রানা। চোখ ছল ছল করছে।

'আমাদের বন্দিজীবনের অষ্টম মাসে জন্ম হয় অ্যালির,' ভেরোনিকা বলল। 'মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা হয়নি ওকে, অ্যাম্বারকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল সন্তানকে নিজের কাছে... ওই বন্দিশালায় রেখে বড় করে তোলার। না, সেটা মহানুভবতা ছিল না, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষারই আরেকটা ধাপ

ছিল। বিজ্ঞানীরা দেখতে চেয়েছিল, জরায়ুর ভ্রূণের ওপর ওদের আর.এন.এ. ইন্টারফ্যারেন্স ড্রাগের কোনও প্রভাব পড়ে কি না। আফটার অল, অ্যালি তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতে অ্যাম্বারকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছিল তো! এ-কথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে, প্রভাব পড়েছে... বেশ ভালমতই পড়েছে। তার কিছু নমুনা তুমি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই দেখেছ, রানা। যা দেখোনি, তা নিয়েই সব সমস্যা। ড্রাগটা অ্যালির ওপর এমনভাবে কাজ করেছে, যা আমাদের কারও ওপর করেনি। তার ফলে ও হয়ে উঠেছে আমাদের সবার চেয়ে আলাদা।'

'আলাদা?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কীভাবে?'

শব্দ করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। 'সেটাই ওরা আমাকে বলছে না।'

ছাব্বিশ

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। এরপর রানাকে লক্ষ্য করে ভেরোনিকা বলল, 'কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো এ-মুহূর্তে আমরা খুলে বলতে পারছি না। অ্যালি সহ্য করতে পারবে না। না, শুধু ওর ভিন্নতার কথা বলছি না, আর বেশ কিছু বিষয় আছে। ওর মায়ের পরিণতি... বন্দিদশা থেকে আমাদের পালানো... টিফানি ক্যানট্রেল...'

'তার মানে এ-ই নয় যে, আমরা ওসব চাপা দিতে চাইছি,' বলল এলিনা। 'সবই খুলে বলব তোমাদেরকে, কিন্তু

তার আগে অ্যালি ওর স্মৃতি ফিরে পেলে ভাল হয়। নইলে আমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারবে না ও। বিশ্বাস করতে চাইবে না।' অ্যালির দিকে তাকাল সে। 'তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ, অ্যালি, ওসবের একটাও সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।'

'ডায়েরি লেখার অভ্যেস আছে তোমার,' অ্যালিকে বলল ভেরোনিকা। 'গত কয়েক বছর থেকেই লিখছ। কিন্তু সে-ডায়েরি তোমাকে দেখাব কি না, এ-নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি আমি আর এলিনা। ওভাবে হয়তো শর্টকাটে সব জানতে পারবে তুমি, কিন্তু হজম করতে পারবে না। তারচেয়ে স্মৃতিগুলো স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসা ভাল। বাড়তি কোনও চাপ পড়বে না তোমার ওপর। বিশ্বাস করো, তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই এ-সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

'টিফানি ক্যানট্রেল কোথায় থাকেন, তা লিয়ারি জানে,' থমথমে গলায় বলল অ্যালি। 'তিনি যদি বিপদের মধ্যে থাকেন, তা হলে এভাবে অপেক্ষা করাটা কি ঠিক হবে আমাদের?'

'সত্যিই বিপদে আছে টিফানি,' স্বীকার করল এলিনা। 'বড় ধরনের বিপদ। কিন্তু খুব শীঘ্রি কিছু ঘটবে না তার কপালে। জানি, কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে... তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, অন্তত আগামী এক সপ্তাহের ভেতর কেউ ফুলের টোকাও দেবে না তার গায়ে।'

'তোমরা সেটা কীভাবে জানো?'

'যেভাবেই হোক, জানি,' সংক্ষেপে বলল এলিনা। ব্যাখ্যা দিতে গেল না। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

হতাশা দেখা দিয়েছে অ্যালির চেহারায়। তাকে দোষ দিতে পারল না রানা। ওর নিজের ভেতরেও উঁকি দিচ্ছে হতাশা। এরা কিছু বলতে চাইছে না কেন?

'লিয়ারি আমার নাগাল পেল কী করে?' জিজ্ঞেস করল

অ্যালি। 'দু'মাস আগে আমাকে কীভাবে খুঁজে পেল সে?'

'সেটাও পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত,' বলল ভেরোনিকা। 'আসলে... পুরোটাই একটা লম্বা কাহিনী। এখন সেটা তোমার না শোনাই ভাল।'

আসলেই কি ভাল? মনে মনে ভাবল রানা। নাকি অন্য কোনও মতলবে ওদেরকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে এরা?

ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই ভেরোনিকার ওপর চোখ পড়ল ওর—একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। চিন্তাটা পড়তে পেরেছে নিঃসন্দেহে। বিব্রত হলো রানা। বলল, 'সরি।'

'সরি বলার কিছু নেই,' একটু হাসল ভেরোনিকা। 'এমন পরিস্থিতিতে মনের ভেতর সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। তবে আমাদের কোনও কুমতলব নেই। বিশ্বাস করো!'

'তা হলে মরুভূমির মাঝখানের ওই সেল টাওয়ারটার কথা বলো,' বলল রানা। 'কেন ওটাকে ভয় পাচ্ছে লিয়ারি ও তার লোকেরা?'

'টাওয়ারটাকে ভয় পাচ্ছে না... ওটাকে এ-মুহূর্তে যে-কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাও ওদের ভয়ের কারণ নয়। এর পেছনে আরও বড় একটা রহস্য রয়েছে।' পালা করে রানা আর অ্যালির দিকে তাকাল ভেরোনিকা। 'সব প্রশ্নের জবাব খুব শীঘ্রিই পাবে তোমরা, নিশ্চিন্ত থাকো। তার আগ পর্যন্ত দয়া করে ধৈর্য ধরো। আমি শুধু এটুকুই বলব, পুরোটা জানার পর তোমাদের মনে হবে, ওসব না জানলেই ভাল হতো।'

সান্তা মনিকা উপসাগরের বুকে আঁধার নেমে এসেছে। ডাঙার এক মাইল ভেতরে, পাঁচশো ফুট উঁচুতে, নিজের বাড়ির প্যাটিয়ো থেকে আনমনে সেদিকে তাকিয়ে আছে লিয়ারি। চাঁদের আলোয় পশ্চিমে আবছাভাবে ফুটে উঠেছে পয়েন্ট ডিউমের সাগরসৈকত। আর পুবে, বিশ মাইল দূরে ঝিকমিক

করছে লস অ্যাঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের আলো। এয়ারপোর্টের পেছনে দেখা যাচ্ছে ব্যস্ত মহানগরীর কৃত্রিম আভা।

সুইমিং পুলের পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে বাতির আলো, চোখের সামনে তুলে ধরল একটা বাঁধাই করা ফোল্ডার। প্রথমবার ওটায় চোখ বোলানোর পর থেকে ফোল্ডারটার শিরোনাম তার জন্যে একটা চিরন্তন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউ.এস. আর্মি বায়ো-ওয়ারফেয়ার রিসার্চ ইন্সটিটিউট
(ইউ.এস.এ.বি.আর.আই.)
লিভিং ওয়েপন্স ইনিশিয়েটিভ—কোহর্ট ২৩.৩
অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট
"স্ন্যাপড্রাগন"

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ মুদল লিয়ারি। আর তখুনি পকেটে রাখা সেলফোনটা বেজে উঠল। রিংটোনটা হুপারের। চোখ না খুলেই ফোনটা বের করল সে, কানে ঠেকাল।

'শিকাগো অপশন চালু করা হয়েছে, স্যর,' জানাল হুপার।

'খুব ভাল,' বলে লাইন কেটে দিল লিয়ারি। ফোনটা নামিয়ে রাখল পাশে।

দু'মাস আগে, অ্যালি ধরা পড়ার পর ওর চামড়া আর চুলের পলিউট্যান্ট প্রোফাইল বের করা হয়েছিল। ওটা আসলে এক ধরনের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস—দীর্ঘ সময় কোথাও বাস করলে সেখানকার পরিবেশ দূষণের প্রভাবে মানুষের শরীরে অদৃশ্য একটা রাসায়নিক প্রলেপ পড়ে। সেই প্রলেপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায়, মানুষটা কোথাকার অধিবাসী। অ্যালির বেলায় শিকাগোর প্রোফাইল পাওয়া

গিয়েছিল। যদিও তাকে শিকাগো থেকে ধরেনি লিয়ারির লোকজন, তারপরেও ওই প্রোফাইল দেখে বোঝা যাচ্ছিল, মেয়েটা বেশ কিছুদিন শিকাগোতে থেকেছে। ওখানে নিশ্চয়ই কোনও আশ্রয়স্থল আছে ওর।

অবশ্য এত দ্রুত শিকাগোর ঠিকানা মনে করতে পারার কথা নয় অ্যালির, তাও কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না লিয়ারি। চালু করে দিয়েছে শিকাগো অপশন—মেয়েটাকে খুঁজে পাবার জন্যে। এক ধরনের মরিয়া পদক্ষেপও বলা যায় ওটাকে। নইলে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে লিয়ারি। যত সময় যাচ্ছে, ততই চোরাবালিতে ডুবে যাবার মত একটা অনুভূতি হচ্ছে তার।

'তুমি তা হলে লিভিং রুমে ঘুমাবে?' বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যালি। পরনে ঘুমানোর পোশাক, বুকের কাছে জাপটে ধরে রেখেছে ডায়নোসরের পুতুলটা—এখন ওকে সত্যিকার একটা বাচ্চা মেয়ের মত দেখাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। বলল, 'অ্যাপার্টমেন্টের দরজার যতটা সম্ভব কাছে থাকতে চাই। বিপদ এলে ওদিক থেকে আসবে। তিরাশি তলায় ঢোকার পথ ওই একটাই।'

'এখন বোধহয় অতটা সতর্ক না থাকলেও চলে,' বলল অ্যালি। 'এখানে আমরা নিরাপদ। তুমি আমার পাশের কামরায় থাকতে পারো না? তুমি কাছে থাকলে আমি সাহস পাই।'

'পাশের রুমটাও যথেষ্ট দূরে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'বড় বাড়িতে থাকার এই এক অসুবিধে।'

জোর করে একটু হাসল অ্যালি। লাঞ্চের পর থেকে আবার মনমরা হয়ে গেছে ও। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে, জানো? পুরনো স্মৃতি মনে করার জন্যে খুব

চেষ্টা করেছি গত ক'দিন, কিন্তু আজ ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, কোনোকিছু মনে না পড়াই হয়তো ভাল। খুব খারাপ কিছু লুকিয়ে আছে ওর ভেতর, তাই না? আমি তার সঙ্গে জড়িত।'

'ওটা তোমার অনুমান। সত্যি না-ও হতে পারে।'

'না, সত্যি। আমি সেটা অনুভব করছি, রানা। নিশ্চয়ই কোনও মন্দ কাজ করেছি আমি, সেটা জানতে চাই না। অথচ... না জেনেও তো উপায় নেই। আমার স্মৃতি ফিরবেই। এখুনি তার আভাস পেতে শুরু করেছি।'

'খামোকা দুশ্চিন্তা করছ, অ্যালি। ব্যাপারটা তেমন কিছু না-ও হতে পারে।'

'আর যদি হয়?'

কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না রানা। ওকে আর কিছু বলল না অ্যালি। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল, তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বন্ধ করে দিল রুমের দরজা।

অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা উল্টে চলেছে লিয়ারি। এই প্রথম নয়, আগেও বহুবার পড়েছে ওটা। তারপরেও মাঝে মাঝে রিভাইস দেয়। মাথায় গেঁথে নেবার চেষ্টা করে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য।

বরাবরের মত রিপোর্টের শেষদিকে একটা সেকশনে পৌঁছে থামল। ওপরে বড় করে শিরোনাম লেখা রয়েছে: *অ্যালিসন মিচেল।* পাতাটার ওপর হাত বোলাল লিয়ারি, কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে গেল শিরোনামের শব্দদুটো। যেন ওগুলোকে স্পর্শ করলেই আঙুল কেটে যাবে তার।

লিভিং রুমে রানার ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ভেরোনিকা, এরপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল নিজের কামরা থেকে। হাজির হলো এলিনার কামরায়। ভেজিয়ে দিল

দরজা। এলিনা তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লেক মিশিগানের পিয়ার থেকে ভেসে আসা আভায় নিশ্চল মূর্তির মত লাগছে ওকে।

পাশে গিয়ে দাঁড়াল ভেরোনিকা। বলল, ‘ওকে এভাবে অন্ধকারে রাখতে ভাল লাগছে না আমার।’

‘এভাবে বেশিদিন ও থাকবেও না,’ এলিনা বলল। ‘ধৈর্য ধরো।’

‘কী ঘটবে বলে মনে হয় তোমার? যখন সবকিছু মনে পড়বে ওর... সব ফিরে পাবে?’

নিঃশ্বাসের সঙ্গে চাপা হাসির মত একটা আওয়াজ করল এলিনা—কঠিন, শীতল হাসি। তবে একেবারে রসকষহীন নয়।

‘আর কিছু না হোক, দেখার মত একটা ব্যাপার হবে!’ বলল সে।

মনোযোগ দিয়ে অ্যালিকে নিয়ে লেখা সেকশনটা পড়ছে লিয়ারি। সংক্ষিপ্ত জীবনে মেয়েটা যা যা করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ আছে ওতে। বেশ কিছু রঙিন ছবিও আছে রিপোর্টের সঙ্গে। যথেষ্ট শক্ত ধাতের মানুষ লিয়ারি, কিন্তু তারপরেও ছবিগুলো তার স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে। অস্বস্তি চাপা দিয়ে ছবিগুলোয় চোখ বোলাচ্ছে সে। নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ব্যাপারটা কতখানি গুরুতর।

খানিক পর রিপোর্ট পড়া শেষ হলো লিয়ারির। ফোল্ডারটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রাখল। টের পেল, বরাবরের মত কাঁপছে তার হাত।

সাতাশ

হঠাৎ জেগে উঠল রানা। উঠে বসল ধড়মড় করে। তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশে তাকাল। কীসে ঘুম ভাঙিয়েছে, বুঝতে চাইছে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো, অযাচিত শব্দ বা আলোর ঝলকানি তার জন্যে দায়ী, কিন্তু তেমন কোনও আলামত দেখল না।

কাউচ থেকে উঠে পড়ল ও। সেন্টার টেবিল থেকে তুলে নিল সিগ-সাওয়ার। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে চক্কর দিতে শুরু করল—প্রথমে লিভিং রুমে, তারপর ডাইনিং রুম আর কিচেনে। কোথাও কেউ নেই। ঘড়িতে বাজে সোয়া চারটা।

লিভিং রুমে ফিরে এল ও। দক্ষিণের কাঁচের দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে ঘুমন্ত শহর। সুনসান রাস্তা। সমস্ত বাড়িঘরের আলো নিভে গেছে। মিটমিট করছে কেবল উঁচু উঁচু বিল্ডিঙের ছাতে লাগানো বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টেনার বাতি। সবচেয়ে উজ্জ্বল ঝলকানিটা ভেসে আসছে উইলিস টাওয়ারের ছাতে বসানো রেডিয়ো মাস্টের চূড়া থেকে। যেন ক্ষণকাল পর পর কালো অন্ধকারের বুক চিরে দিচ্ছে একটা চোখ ধাঁধানো ছুরি।

চোখ ধাঁধানো... ভ্রূকুটি করল রানা... হ্যাঁ, চোখ ধাঁধানোই বটে। বাতিটা শিকাগোর বাকি সব ব্লিঙ্কিং লাইটের চেয়ে অন্তত তিনগুণ উজ্জ্বল। মিটমিট করার ছন্দটাও ঠিক স্বাভাবিক নয়। নির্দিষ্ট বিরতিতে নয়, বরং এলোমেলোভাবে

জ্বলছে-নিভছে ওটা।

ঘাড় ফিরিয়ে কাউচের দিকে তাকাল রানা। যতবার জ্বলে উঠছে উইলিস টাওয়ারের বাতি, ততবারই আলোকিত হয়ে উঠছে কাউচটা। কাঁচ ভেদ করে লিভিং রুমের ভেতরে অনুপ্রবেশ করছে উজ্জ্বল আলো। সন্দেহ নেই, চোখের পাতায় ওই আলোর অত্যাচারেই ঘুম ভেঙেছে ওর।

সোজা হয়ে আবার বাতিটার দিকে তাকাল রানা। লজিক বলছে, অর্থহীন একটা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ও; কিন্তু মন মানল না। বাতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘোরের ভেতর চলে গেল... বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাস্তবতা থেকে। হঠাৎ অনুভব করল, আলোটা দেখতে পাচ্ছে না আর। তার বদলে চোখের সামনে ভাসতে শুরু করেছে ইংরেজি বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষর। মোর্স কোডের সঙ্কেত দেখলে এমন প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় ওর ভেতর।

এক মিনিট পেরুল। তারপরেই সচকিত হলো রানা। নিজের অজান্তেই বলে উঠল, 'এ কী!'

মনের ভুল নয়, সত্যি সত্যি মোর্স কোডে একটা মেসেজ ট্রান্সমিট করা হচ্ছে বাতিটার সাহায্যে। সোজাসাপ্টা মেসেজ নয়, সাঙ্কেতিক ভাষার মেসেজ। এই বিশেষ ভাষাটা রানা ও তার খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া কেউ জানে না!

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। এবার সচেতনভাবে পড়তে শুরু করল মেসেজটা। ছোট্ট মেসেজ, বার বার প্রচার করা হচ্ছে। সেটা বাংলা করলে অনেকটা এ-রকম দাঁড়ায়:

হ্যালো, রানা। আমি ববি। সিলভারফিন। লিয়ারির লোকদের সাহায্য করছি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। তোমার সঙ্গের মেয়েটা জানে না, সে কে, বা তার ক্ষমতা কতখানি। ক্ষমতাটা মাইণ্ডরিডিঙে সীমাবদ্ধ নয়, তার চেয়ে অনেক বড়। আর ওটার সাহায্যে

ইতিমধ্যেই সে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। মেয়েটির দুই সঙ্গিনী তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে। আমি তার প্রমাণ দেখেছি। তুমি এখুনি ওদের কাছ থেকে পালাও, এবং উইলিস টাওয়ারের সিকিউরিটি অফিসে এসে লিয়ারির প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করো, অথবা ফোন করো—০৬৫-৮৫০১৮৪। তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না। রিপিট। হ্যালো, রানা। আমি ববি। সিলভারফিন। লিয়ারির...

থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল রানা। কোনও সন্দেহ নেই, মেসেজটা ওর প্রাণের বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড পাঠিয়েছে। মোর্স কোডের ভেতরে সাঙ্কেতিক ভাষা, আর কোডওয়ার্ড 'সিলভারফিন' তার প্রমাণ। তারপরেও ওটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে, ববিকে হয়তো বোকা বানানো হয়েছে, কিংবা বাধ্য করা হয়েছে মেসেজটা পাঠানোর জন্যে... যদিও জানে, মুরল্যাণ্ডকে দুটোর কোনোটাই করা সম্ভব নয়। আর স্বেচ্ছায় মেসেজ না পাঠালে ওর বন্ধুটি কখনোই কোডওয়ার্ড ব্যবহার করত না।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করল রানা। মেসেজটা কি সত্যি হতে পারে? ডাইনিং টেবিলের আলোচনা মনে পড়ে গেল। এলিনা আর ভেরোনিকা তো বলেছেই, অ্যালি ওদের সবার চেয়ে আলাদা। তারমানে মাইণ্ডরিডিঙের বাইরে ক্ষমতা আছে ওর। কী সেই ক্ষমতা, সেটা বলেনি। দ্বিধা করেছে। সেটা কি এজন্যে যে, ক্ষমতাটা সত্যিই নিরীহ মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহার করেছে অ্যালি? সেজন্যেই কি ওরা বলছিল, বললে বিশ্বাস করবে না মেয়েটা, বড় ধরনের ধাক্কা খাবে? নিজেরা যদি ওকে দিয়ে কাজটা করিয়ে থাকে, তা হলেও সবকিছু গোপন করার পেছনে একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যালিও অবচেতন মন থেকে কোনও সঙ্কেত পেয়েছে

নিশ্চয়ই। ঘুমাতে যাবার আগে কি সে-কারণেই মন্দ কাজের প্রসঙ্গ তুলেছিল? ভয় পাচ্ছিল সত্যটা জানতে?

কিন্তু... কিন্তু ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে! নিজ থেকে মানুষ খুন করবে কেন? মেসেজে এলিনা আর ভেরোনিকাকে দায়ী করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, ওরাই অ্যালিকে দিয়ে মানুষ খুন করিয়েছিল। কীভাবে? কেন ওদের কথা শুনে খুনোখুনি করবে অ্যালি... তাও আবার দু-একজন নয়, বহু নিরীহ মানুষ?

অনেকগুলো প্রশ্ন। আনমনে মাথা নাড়ল রানা। একটারও জবাব জানা নেই ওর। তবে একটা জিনিস জানে। তা হলো, অ্যালিকে ফেলে চলে যাওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ববি মুরলাণ্ডের কথায় তো নয়ই, এমনকী বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানও যদি এখন আদেশ দেন, সেটা পালন করতে পারবে না ও। তার আগে প্রমাণগুলো নিজ চোখে দেখতে হবে ওকে। নিশ্চিত হতে হবে, অ্যালির ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে, তা সত্যি কি না। ফুটফুটে কিশোরীটি সত্যিই কোনও মানবরূপী দানবী কি না।

কী করবে ভাবছে রানা। লিয়ারির কাছে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। রানাকে হাতে পেলে কী করবে না-করবে, সেটা পরের কথা; কিন্তু অ্যালিকে দেখামাত্র খুন করবে সে। তা হলে? কী করা যায়?

ভেবেচিন্তে একটাই পথ দেখতে পেল ও। মুঠোয় ধরা পিস্তলটা নেড়েচেড়ে নিল, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল লিভিং রুম থেকে। হলঘর পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল অ্যালির রুমের দিকে।

ডায়নোসরের পুতুলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অ্যালি। যেন ইন্টারোগেট করছে ওটাকে... নাম বলাতে চাইছে। লাভ হলো না। প্রাণহীন পুতুলটা ড্যাবড্যাবে চোখে ওর দিকে

তাকিয়ে রইল কেবল।

'জাহান্নামে যাও,' বিড়বিড় করল ও। চিৎ হয়ে শুল।

জানালা ভেদ করে কামরার ভেতরে ঢুকছে শহরের অপর্যাপ্ত আলো। বিচিত্র সব ছায়া তৈরি করছে দেয়াল আর ছাতের গায়ে। ঘুম আসছে না। রানার অনুপস্থিতি অস্থির করে তুলছে ওকে। সারা রাতে অন্তত চারবার বিছানা ছেড়েছে ও, বালিশ-কম্বল হাতে নিয়ে রওনা হতে চেয়েছে লিভিং রুমের উদ্দেশে, যাতে রানার কাছাকাছি গিয়ে শুতে পারে, কিন্তু প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে নিরস্ত করেছে নিজেকে। না, রানা কিছু মনে করবে বলে নয়... তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই... থেমে গেছে নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করে। একটা রাত যদি একাকী থাকতে না পারে, পরে কী হবে? রানা তো আর সারাজীবন পিতা বা বড় ভাইয়ের মত ওকে পাহারা দেবে না! তেমনটা আশা করাও অন্যায়।

হাত বাড়িয়ে পুতুলটা আবার কাছে টেনে নিল অ্যালি, জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে। চোখ মুদল। তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না, পুতুলটাকে স্পর্শ করে জাগাতে চাইছে স্মৃতি। পুতুলের গায়ে হাত বোলাল ও। অনুভূতিটা চেনা চেনা লাগছে। কী যেন নাম পুতুলটার...

এক মুহূর্তের জন্য নামটা স্মৃতির সাগর থেকে ভেসে উঠল, কিন্তু ডুবে গেল পরক্ষণেই। একটুর জন্যে যেন ধরা পড়তে পড়তে পড়ল না।

হতাশায় মাথা দোলাল অ্যালি। পুতুলের নামটা স্মৃতির সুতোর প্রথম গিঁঠ হতে পারত। একটা গিঁঠ খুলতে পারলে সুতো ধরে বাকি সব গিঁঠও খুলে যাবে বলে আশা করছে ও। স্মৃতিরা ঠেলাঠেলি করছে বেরিয়ে আসার জন্যে—পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে। পুতুলটা জড়িয়ে ধরল আবার।

এই তো, আবার আলোড়ন উঠছে স্মৃতির সাগরে। তলা থেকে উঠে আসছে নামটা। আবছাভাবে ওটার অবয়ব

দেখতে পাচ্ছে অ্যালি। এখুনি পুরোটা দেখতে পাবে পরিষ্কার...

আচমকা ছিঁড়ে গেল চিন্তার সুতো। সচেতন হয়ে উঠল ও। বাইরে উদয় হয়েছে কেউ। রানা! যেন ঝড় উঠেছে ওর মাথায়। কী নিয়ে যেন চিন্তিত... উত্তেজিত। রানা যখন দরজা ঠেলে নিঃশব্দে কামরায় ঢুকল, তখন ওর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

'অ্যালি?' নরম সুরে ডাকল রানা।

'না!' ফিসফিসাল অ্যালি। 'এসব কী ভাবছ তুমি! তোমার ধারণা, আমি একজন খুনি?'

বিছানার কাছে চলে এল রানা। হাঁটু গেড়ে বসল। হাত রাখল ওর কাঁধে। বলল, 'আমি মোটেই তেমন কিছু ভাবছি না। শুধু সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখছি। সেটাও ইচ্ছেকৃতভাবে নয়। একটা মিথ্যে কথা শুনলেও মানুষ অবচেতনভাবে ওটার কথা ভাবে।'

'তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওসব করতে পারি?'

'এ-মুহূর্তে আমি কোনোকিছুই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করছি না। আসল সত্যটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। তার আগে এখান থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন। এখানে তুমি নিরাপদ নও।'

দ্বিধা ফুটল অ্যালির চেহারায়।

'অ্যালি, আমাকে তুমি চেনো... আমার মন তুমি পড়তে পারো। নিজেই বলো, কার কাছে নিরাপদে থাকবে তুমি? আমার কাছে, নাকি এলিনা আর ভেরোনিকার কাছে? ওদের মন পড়তে পারো না তুমি। তোমাকে নিয়ে ওরা কী প্ল্যান আঁটছে, তা জানার কোনও কায়দা নেই।'

তাও দ্বিধা দূর হলো না অ্যালির মাঝ থেকে।

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, অ্যালি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

‘করি,’ স্পষ্ট ভাষায় বলল মেয়েটা।

‘তা হলে বিশ্বাস করো আমার কথা। এক্ষুণি... এ-মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে আমাদেরকে।’

বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। মাথা ঝাঁকাল। তারপর নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ওর হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। কিন্তু দু’পা না যেতেই বোঁ করে উঠল মাথা। দপ দপ করছে কপালের দু’পাশ... আবারও পাচ্ছে সেই শীতল স্পর্শ। থমকে দাঁড়াল ও। পিস্তল তুলল দরজা লক্ষ করে। সন্দেহ নেই, ওপাশে উদয় হয়েছে দুই মাইণ্ডরিডার।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা ভেদ করে শোনা গেল ভেরোনিকার কণ্ঠ।

‘ওসব মিথ্যে, রানা। লিয়ারির কূটচাল বৈ আর কিছু নয়। তোমাকে ম্যানিপুলেট করে আমাদের নাগাল পেতে চাইছে। ভেবে দেখো!’

‘বুঝতে পারছি, তোমার মনে সন্দেহ ঢুকেছে,’ বলল এলিনা। ‘সেটাই স্বাভাবিক। যে-কেউই সন্দিহান হয়ে পড়বে তোমার পরিস্থিতিতে। আর সেজন্যেই চালটা দিয়েছে লিয়ারি।’

‘ফর গড’স্ সেক, রানা,’ চাপা গলায় বলে উঠল অ্যালি, ‘চলো, ওদের সঙ্গে কথা বলি। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে...’

‘এখুনি না,’ রানা ওকে থামাল। ‘আগে ব্যাপারটা বুঝে নিতে দাও আমাকে।’

‘...ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো ব্যাপারটা,’ ওপাশ থেকে বলছে এলিনা। ‘অস্ত্রশস্ত্রের অভাব নেই আমাদের। তোমাকে যদি সরাবার ইচ্ছে থাকত, এতক্ষণ কি বসে থাকতাম? আরও আগেই কি খুন করে ফেলতাম না?’

পয়েন্টটা নিয়ে ভাবল রানা। না, যুক্তিটা খুব সবল নয়। এতক্ষণ ওকে হুমকি হিসেবে গণ্য করেনি ওরা, তাই খুন

করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মাইণ্ডরিডিঙের কল্যাণে ও কখন কী ভাবছে, সব জানতে পারছে ওরা। রানা যদি হুমকি হয়ে ওঠে... এই যেমন এখন... তা হলে তো খুন করার সুযোগ থাকছেই। আগেভাগেই খামোকা হাত রাঙানো কেন?

কথাগুলো গলা চড়িয়ে বলতে গেল রানা, পরমুহূর্তে থামল। তার প্রয়োজন নেই, ওরা ওর চিন্তাভাবনা তো শুনতে পাচ্ছেই।

'রানা... ডাকল এলিনা। কণ্ঠ নরম, মায়াভরা। তবে ধোঁকা খেল না রানা। গলার সুরেই বুঝতে পারছে, এরা অন্য কোনও মতলব আঁটছে। দরজার দিক থেকে পিস্তল সরাল না ও। খোদা জানে ওপাশে ওরা কী বাগিয়ে ধরে আছে।

একটা আইডিয়া মাথায় খেলল ওর। সেটা পুরোপুরি দানা বাঁধার আগেই বিদ্যুৎ বেগে নড়ল, যাতে ওরা রিঅ্যাক্ট করার সুযোগ না পায়। এক ধাক্কায় মেঝেতে ফেলে দিল অ্যালির ওয়ার্ডরোবটা, পরক্ষণে আরেক ধাক্কায় ওটাকে ঠেলে দিল সামনে। পিছলে দরজার পাল্লায় গিয়ে ঠেকল ওয়ার্ডরোব। ব্যস, এবার সহজে ভেতরে ঢুকতে পারবে না ওরা। বাইরে থেকে এলোপাতাড়ি গুলিও ছুঁড়তে পারবে না, কারণ ভেতরে অ্যালি আছে।

'পাগলামি করছ তুমি, রানা!' রাগী গলায় চেঁচিয়ে উঠল ভেরোনিকা।

'প্রমাণ করো, তোমরা সত্যি কথা বলছ,' পাল্টা জবাব দিল রানা। 'অ্যালির ডায়েরিটা দাও আমাদের। দরজার তলা দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দাও ভেতরে। যদি দেখি, সত্যিই পাগলামি করেছি, হাজারবার ক্ষমা চাইব।'

ক্ষণিকের নীরবতা। এরপর বাইরে থেকে ভেসে এল রাইফেল কক করার শব্দ। সব সন্দেহের অবসান ঘটল ওতেই।

কেঁপে উঠল অ্যালি। রানাকে জড়িয়ে ধরল।

‘এসব সাময়িক ভুল-বোঝাবুঝি, অ্যালি,’ দরজার ওপাশ থেকে বলল ভেরোনিকা। কণ্ঠ থেকে মায়াদয়া উধাও হয়েছে। ‘সবকিছু যখন মনে পড়ে যাবে, তখন তুমি এ-ঘটনা নিয়ে হাসবে।’

আচমকা নড়ে উঠল অ্যালি। ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তলটা, দরজা তাক করে দ্রুত তিনবার গুলি করল। পাল্লা ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। ওপাশে দড়াম করে পড়ল কেউ—ঝাঁপ দিয়েছে, কিংবা আছড়ে পড়েছে মেঝেতে। রাইফেল ছুটে গেছে হাত থেকে, খটখট আওয়াজ উঠল। শোনা গেল বিশ্রী গালাগাল।

কপালের দু’পাশের দপদপানি একটু কমল রানার। অনুমান করল, নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে গেছে মেয়েদুটো।

‘সাহস থাকে তো গুলি করো তোমরাও!’ চেঁচাল অ্যালি।

কিন্তু গুলি করল না ওরা।

অ্যালির হাত থেকে পিস্তলটা নিল রানা। বলল, ‘বাপ রে, তুমি যে এত সাংঘাতিক মেয়ে, তা আগে বুঝিনি।’

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল অ্যালি। ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, ‘এখন আমরা কী করব?’

কামরার ভেতরে নজর বোলাল রানা। দুটো দেয়াল নিরেট, আর কোনার দেয়ালদুটো কাঁচের। নিরেট দেয়াল ভেদ করে বেরুবার উপায় নেই, আর কাঁচের ওপারে শূন্যতা। অ্যাটাচড্ বাথরুম আছে, তবে সেটা কোনও কাজে আসছে না। পাগলাটে একটা আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করল—বিছানার চাদর পাকিয়ে দড়ি বানানো যেতে পারে, সেই দড়িতে ঝুলে নিচের ফ্লোরে নেমে যাওয়া যায়। কাঁচ ভাঙার জন্য পিস্তলের গুলিই যথেষ্ট। কিন্তু তাতে আদৌ কাজ হবে কি? কাজে নামার আগেই প্ল্যানটা ওর মাথা থেকে জেনে নেবে দুই মাইণ্ডরিডার... এখুনি হয়তো জেনে গেছে। তারমানে, ওরা নিচে নামতে গেলেই লিফট বা সিঁড়ি ধরে

ওখানে চলে যাবে ওরা, ওত পেতে বসে থাকবে।

সমস্যা শুধু এই একটা প্ল্যানের বেলায় নয়, রানা যা-ই ফন্দি আঁটুক, সব জেনে যাবে ওরা। এখন উপায়?

'আমি তো আছি,' বলল অ্যালি। 'আমার মাথা থেকে কিছু জানতে পারবে না ওরা।'

'তোমার কোনও প্ল্যান আছে?'

দ্বিধা করল অ্যালি। তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

রানার চিন্তাধারা অনুসরণ করছে ভেরোনিকা। অ্যালির কথায় একটু যেন থমকে গেল বাঙালি যুবক। মেয়েটাকে বিশ্বাস করে ও, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে, কিন্তু তারপরেও কোনোকিছু না জেনে প্রস্তাবটায় সায় জানাতে দ্বিধা করছে। যেন বিমানের পাইলটের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে কোনও যাত্রী।

তবে দ্বিধান্বিত অবস্থাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। সৈনিকসুলভ লজিক খাটাতে শুরু করল রানার মগজ—দ্রুত, পরিষ্কার। এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল যে, চিন্তার ট্রেনটাকে ঠিকমত ধরতেই পারল না ভেরোনিকা। শুধু বুঝল, নিজের প্ল্যান খাটানোর কোনও উপায় নেই বলে অ্যালির প্ল্যান মেনে নিচ্ছে রানা, সেটা যা-ই হোক না কেন। কোনও কৌতূহলও দেখাল না প্ল্যানটা জানার। সংক্ষেপে অ্যালিকে কাজে নামতে বলল।

ভেরোনিকার পাশে অন্ধকারে উপুড় হয়ে আছে এলিনা, সে গাল দিয়ে উঠল, 'শিট!'

ওর গলায় শঙ্কা আর ভয়ের ছাপ। একই অবস্থা ভেরোনিকারও। অ্যালির প্ল্যান জানে না রানা, কাজেই ওদেরও তা জানার উপায় নেই। অনুমান করতে হবে। নতুন একটা অভিজ্ঞতা। শেষ কবে কারও মনের খবর জানতে পারেনি ওরা, তা স্মরণ নেই। এক হিসেবে, অনুমান করতেই

ভুলে গেছে ওরা। আক্রান্ত হয়েছে অনিশ্চয়তায়।

এলিনার দিকে তাকাল ভেরোনিকা। 'এভাবে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। ওপর আর নিচতলার লোকে নিশ্চয়ই গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। সিকিউরিটিকে খবর দেবে ওরা। এলিভেটর দিয়ে নামতে পারব না আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল এলিনা। 'আমি প্যারাশুট নিয়ে আসছি।'

'আমার জন্যে ট্যাণ্ডেম হারনেস এনো।'

উঠে পড়ল এলিনা। ছুটে গেল নিজের রুমের দিকে।

অ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকেছে অ্যালি। দোরগোড়ায় একটু থামল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে ও, পিস্তল হাতে কাভার করছে কামরার দরজা। কৃতজ্ঞ বোধ করল অ্যালি, প্রিয় এই মানুষটা ওর ওপর আস্থা রাখছে বলে। সেই আস্থার প্রতিদান দিতে পারবে তো ও?

রিডিং ডেস্কের ওপর থেকে কর্ডলেস ফোনটা তুলে নিল অ্যালি, ঢুকে পড়ল বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে দিল। নৈঃশব্দ্যের মাঝে মন দিল রানার চিন্তায়। উইলিস টাওয়ারের বাতি থেকে পাওয়া মেসেজটা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে ওখানে।

...*উইলিস টাওয়ারের সিকিউরিটি অফিসে এসে লিয়ারির প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করো, অথবা ফোন করো—০৬৫-৮৫০১৮৪... তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না...*

রানার কোনও ক্ষতি করা হবে না, কিন্তু ওর কী হবে? ওকে কি দেখামাত্র গুলি করবে না ওরা? যা হবার হোক, পরোয়া করছে না অ্যালি। রানাকে বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কথা।

বেসিনের ওপরে লাগানো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ও। করুণ হাসি হাসল। বিড়বিড় করল,

'তোমার সময় শেষ।'

কর্ডলেসের টক বাটন চাপল ও। তারপর ডায়াল করল উইলিস টাওয়ারের নাম্বারটায়। একটা রিং হতেই কলটা রিসিভ করা হলো। কথা বলল না অ্যালি, লাইন খোলা রেখে ফোনটা নামিয়ে রাখল কাউন্টারের ওপর। তারপর বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। রানার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল।

ঘড়ি দেখল রানা। বড়জোর দু'মিনিট পেরিয়েছে। এই অল্প সময়ে মেয়েটা কী কৌশল খাটিয়েছে, ভেবে পেল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কাজ শেষ?'

'হুঁ। খুব শীঘ্রি তার ফল দেখতে পাবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল অ্যালি।

রানার মনে হলো, কবরস্তানের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া শীতল হাওয়ার পরশ পেল গায়ে।

আটাশ

শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে নিজের বাড়ির প্রাইভেট অফিসে ঢুকল লিয়ারি। টেলি-কনফারেন্সের কম্পিউটারগুলো অন করল। পর্দায় ভেসে উঠল তার সান্তা মনিকার অফিসের কম্পিউটার রুম। টেকনিশিয়ানরা মৌমাছির মত ব্যস্ত, সমস্ত কম্পিউটার রিকনফিগার করছে, যাতে ইনকামিং ডেটা রিসিভ করতে অসুবিধে না হয়। মিরাণ্ডাগুলোকে রিঅ্যাসাইন করা হয়েছে শিকাগোর ওপর। ব্লাইণ্ড জোন কাভার করার জন্যে নেয়া হচ্ছে শহরের সব স্ট্রিট ক্যামেরার ফিড।

মিরাণ্ডার মাস্টার ফ্রেমটা পাঁচ মাইল বিস্তৃত। লেক মিশিগানের পাশে পুরো শহর যেন মাকড়সার জালের মত ফুটে উঠেছে থারমাল ইমেজে। এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্যে দুটো এ.এইচ.সিক্স লিটল বার্ড হেলিকপ্টার রাখা হয়েছিল দুটো বিল্ডিঙের ছাতে, সেগুলো টেকঅফ করতে শুরু করেছে। প্রথমটা ইতিমধ্যে উঠে গেছে আকাশে, দ্বিতীয়টাও উঠতে দেরি নেই।

হেডসেট তুলে নিল লিয়ারি। যোগাযোগ করল কপ্টারের পাইলটের সঙ্গে। বলল, 'বিল্ডিংটা একশো তলা। টপ ফ্লোর থেকে নিচের দিকে গুনতে শুরু করো। তোমাদের টার্গেট, তিরাশি নম্বর ফ্লোর। ওখানে যাকেই পাবে, তাকেই গুলি করার অনুমতি দেয়া হলো তোমাদের।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

রানার হাত ধরল অ্যালি। মুঠো শক্ত করার আগে ওর হাতে কাঁপুনি অনুভব করল রানা।

'কীসের জন্যে?' জানতে চাইল ও।

'আমাকে এভাবে ভালবাসার জন্যে... আমাকে আগলে রাখার জন্যে। আমি সব শুনতে পাই, রানা। সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে ভাবছ তুমি। এই যেমন, এখন। নিজেকে বাদ দিয়ে তুমি আমার কথা ভাবছ। চাইছ, তুমি মরলেও আমার যেন কিছু না হয়। অথচ এমন ভালবাসা পাবার মত কিছু করিনি আমি। আমি এর যোগ্য নই।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা। অ্যালির কণ্ঠে কীসের যেন সুর ফুটে উঠেছে। বিচ্ছেদের সুর? নাকি বিদায়ের?

'অ্যালি, কী করেছ তুমি?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল ও।

'আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।' রানাকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

কাঁচের দেয়ালের ওপাশে চোখ চলে গেল রানার। স্কাইলাইনে ফুটে উঠেছে একটা আকাশযানের আলো—বড়জোর মাইলখানেক দূরে। এদিকে ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। আবছাভাবে শোনা গেল রোটরের আওয়াজ। এ.এইচ.সিক্স কিংবা তার কাছাকাছি কোনও মডেল, চিনতে পারল রানা। হিম হয়ে এল শরীর। মানসচোখে দেখতে পাচ্ছে, রাইফেল বাগিয়ে কপ্টারের খোলা দরজায় বসে আছে স্নাইপার—গুলি করতে উদ্যত। কিন্তু ওরা খবর পেল কী করে?

ঘাড় ফিরিয়ে এবার বাথরুমের দিকে তাকাল রানা। খোলা দরজা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাউন্টারের ওপর রাখা কর্ডলেস ফোন। জ্বলজ্বল করছে ডিসপ্লের সবুজ আলো।

কী করেছে অ্যালি, তা বুঝতে আর অসুবিধে হলো না ওর।

প্যারাশুট হারনেসের শেষ ক্লিপটা লাগাতে গিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ভেরোনিকা। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হলো এলিনার সঙ্গে। তারও একই অবস্থা। দু'জনেই রানার মন পড়তে পারছে।

'সর্বনাশ!' ফিসফিসাল এলিনা। 'সত্যি সত্যি ফোন করেছে?'

'দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি,' বলল ভেরোনিকা। হাতের রাইফেলটা এলিনাকে দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। চলে গেল দক্ষিণের দেয়ালে। কাঁচের ওপর দু'হাত ঠেকিয়ে বাইরে তাকাল।

ইতিমধ্যে নদী পেরিয়ে এসেছে হেলিকপ্টার। মিশিগান অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে আসছে সামনে। পেছনে, আর.এম.সি. প্লাযার ছাত থেকে আরেকটা হেলিকপ্টার টেকঅফ করল।

মৃদু একটা ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল এলিভেটরের দিক থেকে। নিশ্চয়ই বিল্ডিঙের সিকিউরিটি পার্সোনেল আর পুলিশ এসেছে। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাল না ভেরোনিকা। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা যথেষ্ট ভারী। ওটা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ।

আসল সমস্যা হলো হেলিকপ্টারদুটো। কিছু একটা করতে হয় ওগুলোর ব্যাপারে। সবচেয়ে কাছের ক্লজিটটার দিকে এগিয়ে গেল ও। দরজা খুলে তাকগুলোর গায়ে ধাক্কা দিল। ভেতরদিকে সরে গেল তাক, উন্মুক্ত হলো একটা গোপন কেবিনেট—তাতে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছে রানা। অ্যালিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে, অন্য হাতে পিস্তল তাক করে রেখেছে দরজার দিকে। কিন্তু এরপর কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। কাঁচের দেয়ালের দিকে তাকাল, মৃত্যুদূতের মত ছুটে আসছে দুটো হেলিকপ্টার। ঠেকাবার কোনও কায়দা নেই।

'আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো,' আবার বলল অ্যালি।

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। অ্যালির দিকে তাকাল। বলল, 'এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ো না। এখনও বেঁচে আছি আমরা।'

'আমার কথা ভুলে যাও, রানা,' করুণ গলায় বলল অ্যালি। 'আমি হয়তো সত্যিই একটা দানব। আমার মরে যাওয়াই ভাল।'

'বাজে কথা! তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'যদি কপালজোরে আমরা কোনোভাবে বেঁচে যাই, আর আমি সেই ভয়ঙ্কর মানুষটায় পরিণত হই, তখন তুমি এ-মুহূর্তটার কথা ভাববে, রানা। তোমার মনে হবে, আমাকে না-বাঁচানোই উচিত ছিল। আমি চাই না, আমাকে নিয়ে কখনও তোমার অমন চিন্তা আসুক। তারচেয়ে মরতে দাও আমাকে।'

'অসম্ভব! মরতে হয়, দু'জনেই মরব। তার আগে একটু চেষ্টা করতে দাও আমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যালি। এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বুঝেছি, তোমাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারব না। বেশ, করো চেষ্টা।'

একটু হাসল রানা। 'এ-ই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা!'

হাতের সমস্যার দিকে এবার নজর দিল ও। বিশ সেকেণ্ডের ভেতর পৌঁছে যাবে সামনের কপ্টার। অন্যদিকে হলঘরে ওদের অপেক্ষায় রয়েছে দুটো সশস্ত্র মেয়ে। নাকি একজন? এক জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে রানা, সম্ভবত ওদের একজন হেলিকপ্টারের পজিশন দেখতে গেছে। তারমানে হলঘরে রয়েছে একজন, অ্যালিকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইলে এখুনি হামলা করবে সে। তার আগেই যা করার করতে হবে রানাকে।

বেডরুমের দরজার দিকে তাকাল রানা। পাল্লাটা প্লাইউডের তৈরি, ঠুনকো। ওয়ার্ডরোবের ধাক্কায় ফাটল দেখা দিয়েছে ওতে। মাথায় বিদ্যুৎচমকের মত একটা আইডিয়া এল, কিন্তু সেটাকে চাপা দিল ও। ভাবল আরেকটা কৌশল নিয়ে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। অ্যালিকে চমকে উঠতে দেখল ও, নিঃসন্দেহে পড়তে পারছে ওর মন। হাত বাড়িয়ে রানাকে বাধা দিতে চাইল মেয়েটা, কিন্তু সে-বাধা মানল না রানা, কাঁচের দেয়ালের দিকে ছুট লাগাল। সর্বান্তঃকরণে ভাবছে, গুলি করে কাঁচ ভাঙবে, তারপর ঝাঁপ দেবে বাইরে। আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল অ্যালি।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মত পাল্টাল রানা। উল্টো ঘুরে এবার প্রাণপণে ছুটল বেডরুমের দরজার দিকে। মেঝেতে পড়ে থাকা ওয়ার্ডরোবটাকে স্প্রিংবোর্ডের মত ব্যবহার করল, একটা পা ঠেকিয়ে ঝাঁপ দিল সামনে। শূন্যে থাকতেই দু'পা ভাঁজ করে ফেলল, পাল্লার গায়ে আছড়ে পড়ল হাঁটু ঠেকিয়ে।

যা আশা করেছিল, তা-ই ঘটল। দুর্বল পাল্লা নিতে পারল না ওর আঘাত। বিশ্রী শব্দ তুলে ফেটে গেল প্লাইউড। দরজার একটা অংশসহ হলঘরের ভেতর আছড়ে পড়ল রানা। পড়েই একটা গড়ান খেল, এরপর পিস্তলটা ছাতের দিকে তুলে একটা গুলি করল। নির্দিষ্ট কোনও টার্গেট নেই, গুলি ছুঁড়ল স্রেফ মাযল ফ্ল্যাশের জন্যে, যাতে সেই আলোয় দেখে নিতে পারে শত্রুর অবস্থান। চকিতের জন্যে দেখতে পেল এলিনাকে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার বামে, কয়েক গজ দূরে। হাতে একটা জি-থার্টি সিক্স অ্যাসল্ট রাইফেল। দারুণ কৌশলে রানা বোকা বানিয়েছে ওকে—জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দেবার কথা ভেবেছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিক পাল্টে বেরিয়ে এসেছে হলঘরে। পুরো ঘটনা ঘটেছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে, রানার ভাবনাচিন্তা এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে যে, তাল মেলাতে পারেনি বেচারি।

তবে প্রাথমিক চমকটা কাটতে সময় লাগল না এলিনার। মাযল ফ্ল্যাশের আলো নেভার আগেই তাকে রাইফেল ঘোরাতে দেখল রানা, গুলি করতে চলেছে। তাকে সে-সুযোগ দিল না ও, এলিনার লোকেশন লক্ষ্য করে যন্ত্রচালিতের মত তিনটা গুলি করল। গলা আর বুক পেতে সেগুলো গ্রহণ করল এলিনা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

একটা চিৎকার শুনল রানা। অ্যালি নয়, ভেরোনিকার গলা। অ্যাপার্টমেন্টের দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা, মেঝে হাতড়াচ্ছে। এলিনার রাইফেলটা পেয়ে গেল শীঘ্রি। ওটা তুলে তাক করল দক্ষিণ দেয়ালের দিকে। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে—ভেরোনিকা সরে গেছে।

বেডরুমের দরজায় উদয় হলো অ্যালি। ওর দিকে এগোতে গিয়ে থেমে গেল রানা, পায়ে ধাতব কিছু একটা বাড়ি খেয়েছে। এলিনা পড়ে যাবার সময়ও শব্দটা শুনতে

পেয়েছে ও। রাইফেলের ওপর একটা ফ্ল্যাশলাইট লাগানো আছে, সুইচ টিপে অন্ করল ওটা। আলো ফেলল এলিনার ওপর। প্যারাশুট পরে আছে মেয়েটা। ওটার ক্লিপের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে রানার পা।

আলোটা আবার নিভিয়ে ফেলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাপার্টমেন্টের দক্ষিণ দিকে। এখনও খালি। ওদিক থেকে হামলা না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভেরোনিকা। রানার হাতে একটা ভারী অস্ত্র চলে এসেছে—সেটা মাইণ্ডরিডিং না করেও বুঝতে পেরেছে মেয়েটা। ঠোঁটের কোণে হালকা এক টুকরো হাসি ফুটল রানার। এ-মুহূর্তে ওই মাইণ্ডরিডিং একটা বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে ওকে। কপালের দু'পাশের ব্যথাটার তীব্রতা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, শত্রু কাছে কি দূরে রয়েছে।

ঘুরে হলঘরের উত্তর প্রান্তে তাকাল ও। ছায়ায় ঢাকা। হামলা চালানোর জন্যে আদর্শ। দক্ষিণ প্রান্ত থেকে লাইব্রেরির ভেতর দিয়ে পৌঁছুনো সম্ভব ওখানে। ভেরোনিকা নিশ্চয়ই সে-চেষ্টা করছে।

অ্যালির বেডরুমের জানালায় অদ্ভুত এক গুঞ্জন শোনা গেল। হেলিকপ্টারের আওয়াজে কম্পন উঠেছে কাঁচে। দরজা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। সামনের কপ্টারটা চলে এসেছে—দক্ষিণের একটা বিল্ডিঙের ছাত পেরিয়ে গেল, ওটা মাত্র এক ব্লক দূরে।

'ধরো এটা।' অ্যালির হাতে সিগ-সাওয়ারটা ধরিয়ে দিল রানা। ম্যাগাজিনে এখনও দুটো বুলেট আছে। ইশারা করল হলঘরের উত্তর প্রান্তের দিকে। 'কোনোকিছু নড়তে দেখলেই গুলি করবে।'

বাধ্য মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। পিস্তল বাগিয়ে দাঁড়াল।

হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসল রানা। রাইফেলটা নামিয়ে

রাখল একপাশে। তারপর দ্রুত হাতে এলিনার শরীর থেকে খুলতে শুরু করল প্যারাশুটটা।

প্রথম হেলিকপ্টারের কোডনেম *স্প্যারো ফোর-ওয়ান।* কম্পিউটার রুমের দুটো মনিটরে ভেসে উঠেছে ওটার আরোহী দু'জন স্নাইপারের হেলমেট-ক্যামেরা ফিড। এ-মুহূর্তে টাওয়ারের দক্ষিণ পাশ দেখাচ্ছে ক্যামেরাদুটো। নিজের অফিসে বসে লিয়ারিও দেখতে পাচ্ছে সেই ছবি।

পাইলটের কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে। 'নো মুভমেণ্ট অন দ্য টার্গেট লেভেল।'

হেলিকপ্টারের আওয়াজে জেগে উঠেছে ওপর-নিচের সব ফ্লোরের অধিবাসীরা। ছুটে এসেছে জানালায়। কী ঘটছে দেখতে চায়। হেলিকপ্টার থেকে একটা স্পটলাইট জ্বেলে তিরাশি নম্বর ফ্লোরে আলো ফেলা হলো। দক্ষিণ পাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরানো হলো আলোটা। কিন্তু কারও দেখা পাওয়া গেল না।

"স্প্যারো ফোর-ওয়ান, বিল্ডিঙের চারপাশে ঘুরে দেখো,' কম্পিউটার রুম থেকে নির্দেশ দিল হুপার। 'ওরা ভেতরেই আছে। প্রতিবেশীরা গুলির শব্দ শুনেছে ওখান থেকে। স্প্যারো ফোর-টু, তোমার লোকদের নামাও।'

'ইয়েস, স্যর। আউট।'

জুম করা মিরাণ্ডার ফ্রেমে দ্বিতীয় কপ্টারটাকে পৌঁছুতে দেখা গেল। টাওয়ারের ছাতের ওপরে গিয়ে স্থির হলো ওটা, টপাটপ ওটা থেকে লাফিয়ে নামল চারজনের একটা স্পেশালিস্ট টিম। নিচে নেমেই দৌড়াতে শুরু করল। স্টেয়ারওয়েল অ্যাকসেসের কাছে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে থামল তারা। একটু পরেই জ্বলজ্বলে একটা হিট সিগনেচার দেখা গেল ওখানে, বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সিঁড়িঘরের দরজার তালা। বাধাটা দূর হতেই সিঁড়ির ভেতরে

অদৃশ্য হয়ে গেল টিমটা।

হারনেসের শেষ ক্লিপটা খুলে ফেলেছে রানা। প্যারাশুটটা এলিনার শরীর থেকে খুলে নিয়ে হাতে তুলল রাইফেল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চকিতে তাকাল হলঘরের দক্ষিণ কোণে। এখনও দেখা নেই ভেরোনিকার।

দুটো কপ্টারেরই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন। প্রথমটা বিল্ডিঙের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়টা ল্যাণ্ড করেছে ছাতে। ওটার ভাইব্রেশন ছড়িয়ে পড়েছে বিল্ডিঙের পুরো কাঠামোয়... তবে খুব সামান্য সময়ের জন্যে। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর কম্পনটা থেমে যাওয়ায় রানা বুঝল, একটা টিম নামিয়ে দিয়ে গেছে ওটা। মনে মনে হিসেব করল তাদের টাইমলাইন। ছাত থেকে তিরাশি তলায় পৌঁছুতে মোটামুটি চার মিনিট নেবে ওরা। ঠেকানোর উপায় নেই। দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে ওপরতলার মেঝে কেটে ঢুকবে। তার আগেই ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঝটপট প্যারাশুটটা পরে ফেলল রানা। ক্লিপ লাগিয়ে শরীরের সঙ্গে শক্ত করে আঁটল। তারপর ইশারা করল অ্যালিকে। মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। পিস্তল নামিয়ে ঢুকে পড়ল বেডরুমে। ওকে অনুসরণ করল রানা।

‘আমার গায়ে চড়বে তুমি,’ ভেতরে ঢুকে বলল রানা। ‘পা দিয়ে জড়িয়ে ধরবে কোমর, আর দু’হাত দিয়ে ধরবে গলা। যত জোরে পারো। আর কোনোদিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। ওকে?’

দোনোমনো ভঙ্গিতে সায় জানাল অ্যালি। ভয় পাচ্ছে ও।

আর তখুনি কপালের দু’পাশে অদৃশ্য এক চাপ অনুভব করল রানা। ভেরোনিকা। কাছে চলে এসেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

আর দেরি করল না অ্যালি, এক লাফে উঠে পড়ল রানার

গায়ে। জাপটে ধরল ওকে। রাইফেলটা এক হাতে উঁচু করল রানা... সুইচটা আগেই সেট করেছে অটোতে... টিপে দিল ট্রিগার। মুষলধারে বুলেট ছুটল। পিছু পিছু ছুটল রানা। শেষ মুহূর্তে হাত থেকে ফেলে দিল রাইফেল, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল অ্যালিকে, এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁচের ওপর। গুলির আঘাতে ফাটল ধরেছিল, এবার আর অক্ষত রইল না কাঁচ, ভেঙেচুরে পথ করে দিল। তিরাশি তলা থেকে নিচে পড়ছে রানা আর অ্যালি।

ঊনত্রিশ

কানের পাশে শোঁ-শোঁ বইছে বাতাস। ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবী। ওপরে শোনা যাচ্ছে হেলিকপ্টারের রোটরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। হ্যানকক সেন্টারের গা ঘেঁষে তীরবেগে নিচে পড়ছে দুটো দেহ।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেলে সচেতন হয়ে উঠল রানা। মাথা ঘুরিয়ে টাওয়ারের চূড়ার দিকে তাকাল, বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতি। মোটামুটি দশ তলা নেমে এসেছে ও আর অ্যালি, নিচে রয়েছে আরও অন্তত সত্তর তলা। অ্যালির গা থেকে একটা হাত সরিয়ে প্যারাশুটের রিলিজ টানল, তারপর আবার জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে।

প্যাক থেকে সাঁৎ করে বেরুল পাইলট শুট, ওটার টানে পরক্ষণে বেরিয়ে এল মেইন শুট। একটা ঝাঁকুনি খেল রানা, হারনেস টান খেয়েছে। পতনের গতি কমে গেল

নাটকীয়ভাবে, কান থেকে দূর হলো বাতাসের গর্জন। মাথা তুলে ওপরে তাকাল ও। বিশাল এক ব্যাঙের ছাতার মত ফুলে উঠেছে ক্যানোপি, মৃদুমন্দ বেগে ধীরে ধীরে নিচে নামছে ওরা।

তবে স্বস্তিতে থাকা গেল না। বাতাসের প্রবাহে ধীরে ধীরে বিল্ডিঙের দিকে সরছে ওরা, বাড়ি খেতে চলেছে।

'ছেড়ে দিলে আমাকে ধরে থাকতে পারবে?' অ্যালিকে জিজ্ঞেস করল ও।

মৃদু মাথা ঝাঁকাল অ্যালি। রানার কাঁধে মাথা গুঁজে রেখেছে ও, দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে ওর গলা।

ওকে ছেড়ে দিল রানা, প্যারাশুটের স্টিয়ারিং লাইনদুটো দু'হাতে ধরল। বামের লাইনটা আস্তে করে টানল ও, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ক্যানোপি। ভেসে ভেসে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে শুরু করল রানা আর অ্যালি, বায়ুপ্রবাহকে ফাঁকি দিয়ে বিল্ডিঙের পাশ থেকে সরে আসছে।

মনে মনে হিসেব কষল রানা। নব্বুই সেকেণ্ড লাগবে নিচে পৌঁছুতে। ততক্ষণে প্যারাশুটটা দেখতে পাবে হেলিকপ্টারের আরোহীরা, গ্রাউণ্ড টিমকে সতর্ক করে দেবে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দক্ষিণে উদয় হলো তিনটে কালো রঙের গাড়ি, মিশিগান অ্যাভিনিউ ধরে ঝড়ের বেগে হ্যানকক সেণ্টারের দিকে ছুটে আসছে। এবার আর হিসেব করার প্রয়োজন হলো না, এক নজরেই রানা বুঝল, ওরা মাটিতে পা ঠেকাবার আগেই গাড়িগুলো পৌঁছে যাবে বিল্ডিঙের তলায়।

বিকল্প খুঁজতে শুরু করল রানা। রাস্তার ওপারে সাদা মার্বেলের একটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে—উঠে এসেছে দশ তলা উঁচু, এবং প্রায় এক ব্লক জুড়ে বিস্তৃত একটা বেইস স্ট্রাকচার থেকে। ছাতটা বেশ চওড়া, ল্যাণ্ডিঙের উপযোগী। সবচেয়ে বড় কথা, বিল্ডিংটাই একটা বড় ধরনের কৌশলগত

সুবিধে দেবে ওদেরকে। বিশাল ওই বিল্ডিঙে ঢুকতে পারলে সহজে ওদেরকে খুঁজে পাবে না শত্রুরা। চেষ্টাচরিত্র করে যদি বেজমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছুনো যায়, সেখান থেকে ঢুকে পড়া যাবে ভূগর্ভস্থ সার্ভিস টানেলে—স্যাটেলাইটের নজরের বাইরে।

প্যারাশুটের গ্লাইড অ্যাঙ্গেল ইতিমধ্যে ওদেরকে নিয়ে চলেছে ছাতটার দিকে। বড়জোর এক মিনিট লাগবে। গ্রাউণ্ড টিম পৌঁছুবার আগেই ওখানে নেমে যেতে পারবে ওরা। আশাবাদী হয়ে উঠল রানা।

ঠিক তখুনি আলোকিত হয়ে উঠল প্যারাশুটের ক্যানোপি, সেটার ছায়া গিয়ে পড়ল নিচের রাস্তায়। আলোর উৎসের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা। স্পটলাইট! ওদেরকে খুঁজে নিয়েছে একটা হেলিকপ্টার! প্রমাদ গুনল ও। ষাট সেকেণ্ড প্রয়োজন ল্যাণ্ড করার জন্যে, সেটা পাচ্ছে না ওরা। শুধু স্পটলাইট ফেলে ক্ষান্ত হবে না হেলিকপ্টার, ওদেরকে পাশের বিল্ডিঙের ছাতে নামতে দেখলে হামলা চালাবে।

কপ্টারের টারবাইনের আওয়াজ বদলাতে শুরু করেছে, স্পটলাইটও নড়ছে ঘন ঘন। যান্ত্রিক ফড়িংটাকে উচ্চতা কমাতে দেখল রানা, ওদের কাছাকাছি পৌঁছুবার চেষ্টা করছে। নাগালের ভেতরে পেলে নিশ্চয়ই গুলি করবে।

স্বাভাবিকভাবে আর নামার চেষ্টা করে লাভ নেই, বেইস স্ট্রাকচারের ছাতে আরও দ্রুত পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। একটা স্টিয়ারিং লাইন ছেড়ে দিল রানা, মুক্ত হাতটা ওপরে তুলল, মুঠো করে ধরল প্যারাশুটের তিনটে লাইন, নিচের দিকে টান দিল একটা। চোখের পলকে বাতাস হারাল ক্যানোপির একটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল পতনের গতি। স্বাভাবিক ডিসেন্ট রেটের দ্বিগুণ বেগে এখন নিচে পড়ছে ওরা—ঘুরপাক খেতে খেতে।

বিপজ্জনক একটা অবস্থা। এখন আর ভাসছে না রানা আর অ্যালি, গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত পড়ে যাচ্ছে নিচে।

দক্ষিণের বদলে বাতাস ওদেরকে ঠেলে নিয়ে চলেছে উত্তর দিকে... আবারও হ্যানকক সেন্টারের গায়ে। চুলচেরা হিসেব করতে হচ্ছে রানাকে—এভাবে কতদূর নামবে, ঠিক কখন আবার বাতাস ভরবে ক্যানোপিতে। কিন্তু হিসেবটা শেষ করার আগেই আচমকা দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা বয়ে গেল। বেসামাল হয়ে গেল রানা। আতঙ্কিত চোখে দেখল, দৃষ্টিসীমায় বড় হয়ে চলেছে হ্যানককের কাঁচের দেয়াল... ওটার গায়ে আছড়ে পড়তে চলেছে ওরা!

মুঠোয় ধরা লাইনগুলো ছেড়ে দিল রানা, অ্যালিকে আঁকড়ে ধরল যত জোরে পারে। ক্যানোপি আবার ফুলে উঠল বাতাসে, বিল্ডিঙের কয়েক গজ দূরে থাকতে থেমে গেল গোঁত্তা খাওয়া। তারপরেও দেয়ালের দিকে উড়ে চলল ওরা—ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে। সর্বশক্তিতে দৌড়াতে থাকা অবস্থায় দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়লে যা হয়, তেমন কিছুই একটা ঘটতে চলেছে। পাক খেল রানা, পিঠ নিয়ে গেল বিল্ডিঙের দিকে, যাতে অ্যালির গায়ে কোনও আঘাত না লাগে।

এরপরেই বিল্ডিঙের গায়ে আছড়ে পড়ল দু'জনে। পিঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড ব্যথা, রানার মনে হলো, একটা চলন্ত বাস ধাক্কা দিয়েছে ওকে। ককিয়ে উঠল শরীরের সবগুলো অস্থিসন্ধি। নিজের অজান্তেই অ্যালিকে ছেড়ে দিল ও। ঝাঁকুনিতে অ্যালির হাত-পায়ের বাঁধনও ছুটে গেছে, পড়ে গেল সে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে সচল হলো রানা, পাগলের মত হাত ছুঁড়ল, নাগালে পেল অ্যালির একটা হাতের কবজি, খপ করে ধরে ফেলল সেটা।

বাড়ি খেয়ে এক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হয়েছিল ওরা, এবার বিল্ডিঙের দেয়াল ঘষটে নিচে নামতে শুরু করল। প্যারাশুট ঠিকমত ওদের ওজন নিতে পারছে না, ঘষা খাচ্ছে দেয়ালে। নিচে তাকাল রানা, আরেক দফা আঁতকে উঠল।

মাটি থেকে প্রায় চারশো ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, পড়ছে দ্রুত... কিন্তু তারচেয়েও বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ত্রিশ ফুট নিচে একটা কার্নিশ দেখা যাচ্ছে। ঠিক কার্নিশ নয়, ওটা আসলে স্টিলের তৈরি মোটা একটা পাত—বিল্ডিঙের এক্সটেরিয়র ডিজাইনের অংশ। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল এরকম অনেকগুলো বিম রয়েছে হ্যানকক সেন্টারের গায়ে। প্রায় দেড় ফুট পুরু সেই বিমটাই কার্নিশের মত বেরিয়ে আছে বাইরে, আর সেটার দিকে তুমুল বেগে ছুটে যাচ্ছে ওরা!

দ্রুত কমছে বিম আর ওদের মাঝে দূরত্ব। বিশ ফুট। দশ ফুট। টেনে অ্যালিকে ওপরদিকে তুলল রানা, হাতটা নিয়ে গেল ঘাড়ের কাছে, আগের মত ওর গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল অ্যালি। ঠিকমত ধরার আগেই বিম স্পর্শ করল রানার পা-দুটো।

আবারও তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা, মনে হলো কংক্রিটের ওপর লাফ দিয়ে নেমেছে। ঢেউয়ের মত ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ল পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত। ঝাঁকি খেয়ে আবারও পড়ে যাচ্ছিল অ্যালি, কোনোমতে সেটা ঠেকাল রানা, জাপটে ধরল ওকে। মাথার ওপর পত্ পত্ আওয়াজ হলো—প্যারাশুটটা নেতিয়ে গেছে পুরোপুরি, এখন ওটা দলা পাকানো বিশাল এক চাদর, নেমে আসছে নিচে, বিমের ওপর দাঁড়ানো রানা আর অ্যালিকে পেরিয়ে গেল নিমেষে। তাড়াতাড়ি লাইনগুলো ডিটাচ করে দিল রানা, নইলে প্যারাশুটের টানে ওরা ছিটকে পড়বে বিম থেকে। বন্ধনহীন প্যারাশুট এবার খানিকটা বাতাস ধরে ফুলে উঠল, নামতে থাকল ভেসে ভেসে।

রোটরের আওয়াজ বাড়তে শুরু করেছে। ঘাড় ফেরাতেই একটা হেলিকপ্টারটাকে এগোতে দেখল, স্পটলাইট তাক করে রেখেছে ওদের দিকে। ধীরে ধীরে ওদের সামনে এসে

স্থির হলো, ঘুরে গেল একপাশে। খোলা দরজায় অস্ত্রধারী দু'জন স্নাইপারকে দেখা গেল এবার, হাতের রাইফেল তাক করে রেখেছে বিমের ওপর আটকা পড়া দুই শিকারের দিকে।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার হৃদয়। সব শেষ। বাঁচার কোনও উপায় নেই। সত্যি বলতে কী, নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই ওদের। এখুনি স্নাইপারের গুলিতে সাঙ্গ হবে ওদের জীবন। সাবধানে অ্যালিকে কোল থেকে নামাল ও। পাশ ফিরে হাত রাখল ওর কাঁধে।

'সরি,' বলল ও। 'তোমার জন্যে কিছু করতে পারলাম না।'

ঠোঁট কেঁপে উঠল অ্যালির। রানাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সে। আর তখুনি প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চতুর্দিক।

চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকাল রানা। বিশাল এক আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। জ্বলন্ত এক উল্কার মত ধ্বংসাবশেষটা খসে পড়ল নিচে।

'হচ্ছেটা কী ওখানে?' মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল লিয়ারি।

রেডিয়োতে ভেসে এল স্প্যারো ফোর-টুর পাইলটের আতঙ্কিত কণ্ঠ। কী এক মিসাইল অ্যাটাকের কথা বলছে। মিরাণ্ডা ইমেজে তার হেলিকপ্টারকে ঘুরে যেতে দেখল লিয়ারি—লেজ তুলে পশ্চিমদিকে পালাচ্ছে।

স্প্যারো ফোর-ওয়ান থেকে কোনও রেসপন্স পাওয়া গেল না। পাবার কথাও নয়। বিশাল একটা হিট সিগনেচার দেখা যাচ্ছে ওটার জায়গায়... আগুনের একটা গোলা। লিয়ারির চোখের সামনে মিশিগান অ্যাভিনিউতে আছড়ে পড়ল ওটা।

ভাঙা জানালার পাশে উপুড় হয়ে আছে ভেরোনিকা, শরীরের খানিকটা বের করে রেখেছে বাইরে, কাঁধে ঠেকিয়ে রেখেছে একটা এফ.জি.এম.-১৪৮ লঞ্চার। এটা দ্বিতীয় লঞ্চার, প্রথমটা খালি করা হয়েছে আগেই—ওটা দিয়েই প্রথম হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়েছিল সে; খালি লঞ্চারটা পড়ে আছে তার পাশে। এখন দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটাকে ভূপাতিত করার চেষ্টা করছে।

লাভ হলো না। দ্বিতীয় কপ্টারের পাইলট যথেষ্ট চালু, প্রথমটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখেই পিঠটান দিয়েছে, চোখের পলকে চলে গেছে রেঞ্জের বাইরে। সহজে ফিরবে বলে মনে হয় না। নিচে তাকাল ভেরোনিকা। রানা আর অ্যালিকে বিন্দুর মত দেখাচ্ছে ওপর থেকে।

উঠে দাঁড়াল ভেরোনিকা। পিছিয়ে গেল কয়েক গজ। প্যারাশুটের হারনেস ভাল করে এঁটে নিল গায়ে। তারপর ছুট লাগাল। ভাঙা জানালার সীমানায় পৌঁছুতেই দক্ষ অ্যাথলিটের মত লং জাম্প দিল—বেরিয়ে গেল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

হেলিকপ্টারের ধ্বংসস্তূপ থেকে চোখ সরাল রানা। মনোযোগ দিল নিজেদের সমস্যার দিকে, এখন সেটাই জরুরি। বিমের ওপর আটকা পড়েছে ওরা, নিচে নামার উপায় নেই। এর বিকল্প হচ্ছে, বিল্ডিঙের ভেতরে ঢোকা। উল্টো ঘুরে কাঁচের ওপর নাক-মুখ ঠেকাল। ওপাশটায় একটা অন্ধকার অফিস, কেউ নেই।

ঠোঁট কামড়াল রানা। বন্দুক-পিস্তল কিছু নেই যে, গুলি করে কাঁচ ভাঙবে। লাথি-ঘুসি মেরেও এই পুরু কাঁচের দেয়াল ভাঙা সম্ভব নয়। সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, এমন সময় ওপর থেকে শোনা গেল কাপড়ের খসখস আর প্যারাশুটের লাইন টানটান হয়ে যাবার টঙ্কার। ঝট্ করে ওদিকে তাকাল ও। ছিপছিপে গড়নের একজন মানুষ... নিঃসন্দেহে

ভেরোনিকা... নেমে আসছে দ্বিতীয় একটা প্যারাশুটে ভর করে। টাওয়ার থেকে ষাট ফুট দূরে, এবং রানা-অ্যালির একশো ফুট ওপরে পৌঁছে প্যারাশুট খুলেছে সে। বাতাসের প্রতিকূলে লড়ছে না, বরং বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে মোড় নিচ্ছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরেই পরিষ্কার হয়ে গেল, প্যারাট্রুপার হিসেবে ভেরোনিকার দক্ষতা তুলনাহীন। রানা নিজেও মন্দ নয়; প্রায় দু'শো প্যারাজাম্প করার অভিজ্ঞতা আছে ওর, কিন্তু তারপরেও ভেরোনিকার তুলনায় তা কিছুই না। মেয়েটার অ্যাক্রোব্যাটসুলভ মুভমেণ্টই বলে দিচ্ছে, সে একজন স্পেশালিস্ট—দীর্ঘদিন থেকে একটা নির্দিষ্ট ধরনের প্যারাজাম্পিঙের ওপর ট্রেইনিং নিয়েছে, দক্ষতার চরম সীমায় পৌঁছেছে।

আরেকটা কারণ আছে এখানে বাস করার। প্রার্থনা করো, সেটা জানার মত পরিস্থিতি যেন দেখা না দেয়।

কথাটা ভেরোনিকার। আর এখন সেটার অর্থ অনুধাবন করতে পারছে রানা। প্যারাজাম্পিঙের কথা বলছিল মেয়েটা। বিরূপ পরিস্থিতিতে পালাবার জন্যে সবচেয়ে অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত কৌশল। এজন্যেই তিরাশি তলার অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়েছিল ওরা। বছরের পর বছর ধরে ট্রেইনিং নিয়েছে উঁচু বিল্ডিং থেকে প্যারাজাম্প করার। তার ফলাফল চাক্ষুষ করছে রানা। বাতাসের প্রবাহ বা মাধ্যাকর্ষণকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে ভেরোনিকা। প্যারাশুট তো নয়, যেন নিজের দেহের একটা অঙ্গ পরিচালনা করছে, পাখির মত অনায়াসে ভাসছে বাতাসে। নেমে আসছে রানা আর অ্যালিকে লক্ষ্য করে।

বাজে একটা কিছু ঘটতে চলেছে, বুঝতে পারল রানা। অ্যালির সঙ্গে চোখাচোখি হলো, রানার মনের ভেতর বাজতে থাকা বিপদঘণ্টা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে।

'আমাকে ছেড়ে দাও,' অ্যালি বলল। 'ওকে ঠেকাবার

চেষ্টা কোরো না।'

'অসম্ভব,' দাঁতে দাঁত পিষল রানা। দ্রুত হাতে পিঠে বাঁধা প্যারাশুটের প্যাকটা খুলল। একটা হারনেসের ক্লিপ আটকাল পেছনের জানালার ফ্রেমে। অন্য হারনেসে ঢোকাল বাম হাত, স্ট্র্যাপটা রইল কনুইয়ের ভাঁজে। ব্যস, এবার আর বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়বে না বিম থেকে।

দশ সেকেণ্ড পর এল আক্রমণ। ওদের খানিক ওপরে পৌঁছে আচমকা ক্যানোপির বাতাস ছেড়ে দিল ভেরোনিকা, ডাইভ দিল বিম লক্ষ্য করে। এক হাতে তাকে ঠেকাতে পারল না রানা, সরাসরি ওর বুকের ওপর গাছের গুঁড়ির মত ধাক্কা দিল মেয়েটার জোড়া-পা। পেছনের কাঁচের ওপর আছড়ে পড়ল ও, বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস। বিম থেকে পড়ে যাচ্ছিল, বেঁচে গেল স্ট্র্যাপটার কারণে। ওটার টান খেয়ে স্থির হলো দেহ।

মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হলো রানা। তাকাল পাশে। বিমের ওপর নেমে এসেছে ভেরোনিকা, অ্যালিকে জাপটে ধরেছে এক হাতে। চোখের কোণে রানাকে সোজা হতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে মনের সুখে ওর নাকের ওপর একটা ঘুসি মারল রানা। টের পেল, নাকটা বসে গেল মুঠোর ওপারে, রক্ত বেরিয়ে এল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ভেরোনিকা, পাগলের মত লাথি মারল একটা। কোনোকিছু দেখে মারেনি, স্রেফ কপালজোরে রানার উরুসন্ধিতে তার জুতোর ডগা। জান্তব এক গোঙানি ছেড়ে বসে পড়ল রানা, আবারও প্যারাশুটের স্ট্র্যাপটা ওকে বাঁচিয়ে দিল নিচে পড়ে যাওয়া থেকে।

অ্যালি ধস্তাধস্তি করতে চাইছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। ওকে শক্ত করে জাপটে ধরল ভেরোনিকা, তারপর লাফ দিল বিম থেকে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যালি। ঝুলন্ত অবস্থায় হাত ছুঁড়ল রানা, ওদেরকে খামচে ধরতে চাইল, কিন্তু নাগালে

পেল না। ভেরোনিকার ক্যানোপি আবার ফুলে উঠতে দেখল ও, অ্যালিকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে সে।

লিয়ারির টিমের গ্রাউণ্ড ভেহিকেলগুলো মিশিগান অ্যাভিনিউর শেষ ব্লকটা অতিক্রম করছে। হ্যানকক সেণ্টারের পাশ ঘুরে দক্ষিণ পাশে পৌঁছুনোর চেষ্টা করল, কিন্তু থমকে গেল রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা হেলিকপ্টারের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের কারণে। গাড়ি থেকে নামল না কেউ, ধ্বংসস্তূপে কেউ বেঁচে আছে কি না দেখার চেষ্টা করল না, তার বদলে ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার প্রয়াস নিল। তবে আক্ষরিক অর্থেই একটা আগুনের ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে রাস্তায়, সেটা পেরুতে পারল না গাড়িগুলো।

বিশ সেকেণ্ডের মাথায় ভূমি স্পর্শ করল ভেরোনিকা। রাস্তায় পা ঠেকিয়েই বিদ্যুৎবেগে খুলে ফেলল হারনেস, বাতাসের টানে মুক্ত প্যারাশুটটা উড়ে চলে গেল পেছনে—ভূতের মত ভেসে ভেসে। অ্যালিকে সাবধানে মাটিতে নামাল সে, কোমরে গোঁজা একটা ক্রো-বার বের করে হাঁটু গেড়ে বসল। বিস্মিত চোখে ওকে একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলতে দেখল রানা। অ্যালিকে নামাল ওখান দিয়ে, নিজেও নামল। শেষে টেনে দিল ম্যানহোলের ঢাকনা।

তিক্ততায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল, ওদের এস্কেপ প্ল্যান শুধু প্যারাজাম্পিঙে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। সন্দেহ নেই, ম্যানহোলের তলার টানেল নেটওঅর্ক হাতের তালুর মত চেনে ভেরোনিকা... কোথা দিয়ে ঢুকে কোথা দিয়ে বেরুবে, সব ঠিক করা আছে। একটা গাড়িও নিশ্চয়ই রেখেছে ওখানে।

বিল্ডিঙের উল্টোপাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ম্যানহোলের কাছে পৌঁছুতে গ্রাউণ্ড ভেহিকেলগুলোর লাগল পুরো দু'মিনিট। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে অ্যালি আর ভেরোনিকা।

ত্রিশ

বিল্ডিঙের ছাতে নামা টিমটাই সবার আগে রানার কাছে পৌঁছুল। বিমের পাশের অফিসটায় ঢুকল ওরা, কাঁচ ভেঙে রানাকে টেনে নিল ভেতরে। হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো ওর। উদ্ধার হবার ফাঁকে লোকগুলোর অস্ত্র দেখে নিল রানা। নাইন মিলিমিটার বেরেটা রয়েছে সবার কাছে, কোমরের হোলস্টারে খাপবদ্ধ অবস্থায়। কাঁধে ঝুলছে ট্র্যাঙ্কুইলাইযার রাইফেল। খটকা লাগল রানার। হেলিকপ্টারের স্নাইপারের হাতেও একই ধরনের রাইফেল দেখেছিল বলে মনে হচ্ছে। তবে কি ওদেরকে খুন করতে চাইছিল না ওরা?

বিল্ডিং থেকে বের করে একটা গাড়িতে তোলা হলো রানাকে। একটা শব্দ করল না ও, লোকগুলোও আগ বাড়িয়ে কোনও কথা বলল না ওর সঙ্গে। মিশিগান অ্যাভিনিউ ধরে উইলিস টাওয়ারে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। উত্তরে রওনা হলো গাড়ি, কয়েক মিনিট পর পশ্চিমে মোড় নিয়ে উঠে এল ইন্টারস্টেট-নাইণ্টি ফোরে। শহরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল উত্তর-পশ্চিমে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ও'হেয়ার এয়ারপোর্টের আভা।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে একটা সুঁইয়ের খোঁচা অনুভব করল রানা। জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

কানের কাছে তুড়ির শব্দ। ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা।

অচেনা একটা কণ্ঠ বলল, 'চোখ পিটপিট করুন।'

করল রানা। এবার কণ্ঠের মালিককে দেখতে পেল। অ্যাপ্রন পরা একজন মানুষ... ঝুঁকে আছে ওর ওপর। সম্ভবত ডাক্তার।

'সামনের দাঁতের পেছনে জিভের ডগা ঠেকান,' নির্দেশ দিল লোকটা।

ঠেকাল রানা।

'চোখে ঝাপসা দেখছেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'লাইটের আলোয় কি চোখ ব্যথা করছে?'

আবারও মাথা নাড়ল রানা। দেখে নিল আশপাশ। বড়-সড় একটা প্রাইভেট জেটের কেবিনে বসে আছে ও। শোনা যাচ্ছে টার্বোফ্যানের গুঞ্জন। হ্যাঙার থেকে ধীরে ধীরে বেরুচ্ছে বিমানটা। পোর্টহোল দিয়ে শেষরাতের আবছা আলোয় বিশাল এয়ারপোর্টের কাঠামোও দেখা গেল।

রানার হাত-পা এখনও বাঁধা। শুধু তাই নয়, চওড়া একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে সিটের সঙ্গে ওর ঊর্ধ্বাঙ্গও বেঁধে রাখা হয়েছে। আইলের ওপাশে, সামনে আর পেছনে বসে আছে বেশ কয়েকজন পাহারাদার—হাতে ডার্ট গান, সতর্ক নজর রাখছে ওর ওপর।

'মাথা তুলে ওভারহেড লাইটের দিকে তাকান,' বলল ডাক্তার। 'এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনুন।'

গুনল রানা। লাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও মুখ নামাল না। নামাল ডাক্তারের ইশারা পাবার পর।

'কোনও কংকাশন নেই,' পাহারাদারদের একজনের উদ্দেশে বলল ডাক্তার। 'ছোটখাট কিছু আঘাত বাদ দিলে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করে ডায়াল করল। কল রিসিভ করা হলে বলল,

‘আমরা টেকঅফের জন্যে তৈরি, স্যর।’

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। ওপাশ থেকে কী যেন বলা হচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল পাহারাদার। ‘ওকে, স্যর। ওখানে পৌঁছে আপনি ওকে তৈরি অবস্থায় পাবেন।’

সংক্ষিপ্ত ফ্লাইট শেষে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র কাছে, অ্যাণ্ড্রুজ এয়ারফোর্স বেসে ল্যাণ্ড করল জেট। ট্যাক্সিইং করে রানওয়ে থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা একতলা বিল্ডিঙের সামনের টারমাকে থামল। পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হলো রানার, বিমান থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে ঢোকানো হলো বিল্ডিঙে। লম্বা করিডোর পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটা বড় অফিস রুমে। বড় একটা ডেস্ক টেবিল, কয়েকটা চেয়ার আর এক সেট সোফা রয়েছে কামরায়।

সোফায় বসানো হলো রানাকে। পা বেঁধে ফেলা হলো আবার। প্রহরীদের লিডার বলল, ‘চাইলে ঘুমিয়ে নিতে পারো।’

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এ-মুহূর্তে করার কিছু নেই, তারচেয়ে বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা যাক। পরে কাজে লাগতে পারে। সোফায় পা তুলে শুয়ে পড়ল রানা। চোখ মুদল।

ওর পাহারায় দু’জনকে রেখে বাকি প্রহরীরা বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

করিডোরে পদশব্দ। ঝট্ করে চোখ মেলল রানা। দেখল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দুই পাহারাদার। ক্ষণকাল পরেই দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সুঠাম দেহ। খাকি স্ল্যাকস্ আর সাদা অক্সফোর্ড শার্টের ওপর কালো উইণ্ডব্রেকার পরেছে। হাবভাবে সামরিক কেতা... তবে এ-ও বোঝা যায়, সে-

জীবনটা পেছনে ফেলে এসেছে বহুদিন আগে, এখন ভিন্ন কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িত।

উঠে বসল রানা। প্রশ্নের সুরে বলল, 'অ্যালেক্স লিয়ারি?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। তার পিছু পিছু কামরায় ঢুকল জনা ছয়েক লোক। হাতে ল্যাপটপ-সহ নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট। ডেস্কের ওপর সেগুলো সেটআপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সবার শেষে যে-মানুষটা ঢুকল, তাকে দেখে চমকে উঠল রানা।

'ববি!'

ভুল দেখছে না রানা, সত্যিই ববি মুরল্যাণ্ড ঢুকেছে কামরায়। ছোটখাট মানুষ সে, বেঁটেই বলা যায়, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পুরো করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হয় তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে রানা তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন, আর বন্ধুর জন্য পারে না এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই। রানাকে দেখে উজ্জ্বল হলো তার চেহারা, প্রায় ছুটে এসে জাপটে ধরল। 'হাই, দোস্ত!'

বহুদিন পর দেখা হয়েছে দু'জনের, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু হাঁসফাঁস করে উঠল রানা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি মুরল্যাণ্ডের, লম্বা ও চওড়ায় ছোটখাট একটা ভল্লুকের সঙ্গে শতকরা আটানব্বই ভাগ মিল রয়েছে তার। উত্তেজনায় এত জোরে রানাকে চাপ দিচ্ছে যে মনে হলো, হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে যাবে এখুনি।

‘আরে... ছাড়ো, ছাড়ো! মেরেই ফেলবে নাকি!’

‘আমি মারব কী, তুমি তো এমনিতেই মরতে বসেছিলে।’ রানাকে মুক্তি দিল মুরল্যাণ্ড। ভ্রূকুটি করে রানার কালশিরে পড়া চেহারাটা দেখল। স্বভাবসুলভ কৌতুকের স্বরে বলল, ‘তুমি আর বদলালে না। একটা না একটা ঝামেলায় জড়াবেই! শেষ কবে তোমাকে সুস্থ আর অক্ষত অবস্থায় দেখেছি, মনে পড়ে না।’

‘এখন সুস্থ অবস্থাতেই দেখছ,’ বলল রানা। বাঁকা চোখে তাকাল লিয়ারির দিকে। ‘বিমানে ওঠার পর ডাক্তার এসে চেকআপ করেছে আমার।’

‘এঁদের দয়ার শরীর,’ বাঁকা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড।

‘কিন্তু তুমি এখানে কেন, ববি? এদের সঙ্গে কেন?’

‘সবই জানবে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।’

‘কী কাজ?’

‘সব খুলে বলো আমাদের। গত তিনদিনের সব ঘটনা—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কিচ্ছু বাদ দিয়ো না। তোমারটুকু শোনার পর আমাদের অংশটা বলব। তা হলেই বুঝবে, ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস।’

মুরল্যাণ্ডের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে রানা, গোপন কোনও সঙ্কেত দিলে যাতে বুঝতে পারে। লিয়ারির মত লোকের পক্ষ হয়ে ও কাজ করবে, ভাবা যায় না। হয়তো বাধ্য করা হচ্ছে ওকে। তবে শেষ পর্যন্ত কোনও সঙ্কেত দিল না মুরল্যাণ্ড। ভণিতা নেই হাবভাবে। সিরিয়াসলিই রানাকে সব খুলে বলতে বলছে। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বসে পড়ল সোফায়।

‘এগুলো খুলে দেয়া যায় না?’ রানার হাত-পায়ের বাঁধনের দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। ‘কথা দিচ্ছি, পাশের হ্যাঙারে ঢুকে ও এয়ারফোর্স ওয়ান চুরি করে পালাবে না।’

প্রহরীকে ইঙ্গিত করল লিয়ারি। এগিয়ে এসে রানার বাঁধন খুলে দিল লোকটা।

তিনদিনের বিশদ বর্ণনা দিতে এক ঘণ্টা নিল রানা। বারবারা হোল্ডেনের নাম উহ্য রাখল ও; তাঁকে আইডেণ্টিফাই করা যেতে পারে, এমন সব তথ্যও চেপে গেল; এ ছাড়া লুকাল না কিছুই। কথা বলার ফাঁকে তুলা আর অ্যাণ্টিসেপটিক দিয়ে ওর মুখ-হাতের কাটাছেঁড়ার পরিচর্যা করে দিল মুরল্যাণ্ড।

রানার কথা শেষ হলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লিয়ারি। হাবভাবে মনে হলো, নিজের চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে চাইছে।

'আপনার লোকেরা শিকাগোয় ট্র্যাঙ্কুইলাইযার গান ব্যবহার করছিল কেন?' জানতে চাইল রানা। 'এর আগ পর্যন্ত আপনারা তো অ্যালিকে খুন করতে চেয়েছেন।'

'আপনাকেও, মি. রানা,' বলল লিয়ারি। বলার ভঙ্গিতে ক্ষমাপ্রার্থনার কোনও সুর বাজল না।

কয়েক মুহূর্ত পর নড়েচড়ে বসল লোকটা। বলল, 'বেশ, এবার তা হলে গোড়া থেকে সব খুলে বলছি আপনাকে, মি. রানা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে হলে সবকিছু জানা থাকা ভাল। মি. মুরল্যাণ্ডও গোঁ ধরেছেন, আপনাকে সব জানাতে হবে।'

পাশ থেকে সায় জানাল মুরল্যাণ্ড।

'প্রথমে নিজের পরিচয় জানাই,' বলল লিয়ারি। 'ফিল্ডিং-গেলার নামে একটা ডিফেন্স কণ্ট্রাক্টর কোম্পানির প্রধান নির্বাহী আমি। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলো সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ নামে একটা কোম্পানি, জিনেটিক রিসার্চে তারা বহুদিন থেকে আমাদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে। দু'মাস আগে অ্যালিসন মিচেল... মানে, অ্যালিকে কাস্টডিতে নিই আমি, কারণ বহু বছর আগেকার যে-

মিলিটারি রিসার্চের ওপর ভিত্তি করে আমরা ও সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ কাজ করছি, অ্যালি ছিল তারই ফসল... গবেষণার জন্যে খুব মূল্যবান এক সাবজেক্ট। শুধু মানুষ হিসেবে নয়, ও যা যা জানে, তাও আমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অ্যালি আর ওর দুই সঙ্গিনী... ওদের সঙ্গে তো দেখা হয়েছে আপনার... বহুদিন থেকে নজর রাখছিল আমাদের দুই কোম্পানির ওপর; আমরা কী করছি না করছি, তা জেনে নিচ্ছিল। মাইণ্ডরিডারদের জন্যে সেটা কোনও কঠিন কাজ নয়, তা ছাড়া যৌক্তিক কারণও ছিল এর পেছনে। ওরা জানতে চাইছিল, আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করে বসছি কি না, যা ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। যা হোক, এ-কারণেই অ্যালিকে ধরে ইণ্টারোগেশন শুরু করলাম আমরা—নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে, সেই সঙ্গে সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটসের হাঁড়ির খবর জানার পর। বলা বাহুল্য, ড্রাগ-ইনডিউসড্ স্লিপ ইণ্টারোগেশনের ফলে কিছুই গোপন করার উপায় রইল না মেয়েটার, গড়গড় করে পেট থেকে সব তথ্য উগরে দিল। আর সেখান থেকে সাদার্নের রিসার্চ সম্পর্কে নতুন একটা ব্যাপার জানতে পারলাম। না, আমি অ্যাণ্টেনা সাইট, বা ওগুলো যে-কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তার কথা বলছি না। সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যাপার।'

'এমন কিছু, যেটা আপনাদের ভয় পাইয়ে দিল,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল লিয়ারি। 'কেন সেটা ভয়ের, তা শীঘ্রি বুঝতে পারবেন। কেন অ্যালিকে তার বান্ধবীরা ওটা খুলে বলেনি... তাও। এর সঙ্গে ওর অতীতের সম্পর্ক আছে। এই নতুন জিনিসটার পেছনে যারা রয়েছে, তারাও ভয় পাচ্ছে অ্যালি জীবিত থাকা অবস্থায় ওটা কাজে লাগাতে। তাদের ধারণা, অ্যালির পক্ষে ওটায় বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব। আমিও তা-ই মনে করি। আর এ-কারণেই সরকারের উঁচু

মহল থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়, মেয়েটাকে হত্যা করতে হবে। আমি যে খুব আগ্রহ নিয়ে কাজটা করতে চেয়েছি, এমন নয়। আমার আসলে এখানে বলার কিছু ছিল না।'

'স্রেফ আদেশ পালন করেছেন, এই তো?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'অজুহাতটা মন্দ নয়।'

পাশ থেকে হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড।

লিয়ারি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। বলল, 'যা খুশি ভাবতে পারেন, আমি সেটা গোনায় ধরছি না। যা হোক, বন্দি অবস্থায় অ্যালিকে খুন করতে ব্যর্থ হলাম আমরা। ও পালাল। আশ্রয় নিল আপনার কাছে। আপনি আমাদেরকে রীতিমত ঘোল খাইয়ে উধাও হয়ে গেলেন এল্ সেড়েরো থেকে। উপায়ান্তর না দেখে হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির হেডের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমি, তাকে ছাড়া আপনাদেরকে খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। আমি ভেবেছিলাম, সবকিছু খুলে বললে সে আমাদের দিকটা বুঝবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। দিয়েওছিল। কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়।'

'মানে?' ভ্রূকুটি করল রানা।

এবার মুখ খুলল মুরল্যাণ্ড। 'হোমল্যাণ্ডের ওই ভদ্রলোকের নাম আলবার্ট ফুলার—বিবেক-বুদ্ধি এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে তাঁর। মি. লিয়ারির কথায় তোমার বিরুদ্ধে ম্যানহাণ্ট চালু করলেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে খোঁজখবর নিলেন তোমার সম্পর্কে। যখনই জানলেন, তুমি নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, বিপদে-আপদে বহুবার সাহায্য করেছ আমেরিকাকে, সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর আমার সঙ্গে। আমরা তখন তোমার বস, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। সেই মোতাবেক খুঁজে বের করলাম

ডা. টিফানি ক্যানট্রেলকে। সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, এভাবে ব্যাপারটা চলতে দেয়া যায় না। তখন মি. লিয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো, তাকে একটা হুমকি দিলাম আমরা। এসব গত পরশু রাতের কথা।'

যে-রাতে ডা. ক্যানট্রেলের ওপর আড়ি পাততে গিয়েছিল ও আর অ্যালি, মনে মনে ভাবল রানা। টিফানিকে লিয়ারির কাছে ফোন করতে শুনেছিল অ্যালি। কেন, তার ব্যাখ্যা মিলছে এবার।

'এর সঙ্গে ডা. ক্যানট্রেল কীভাবে জড়িত?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা খানিক পর তার মুখ থেকেই জানতে পারবেন,' গম্ভীর গলায় বলল লিয়ারি।

'হুম। তা... কী হুমকি দেয়া হয়েছে আপনাকে?'

'সবকিছু ফাঁস করে দেবার,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'যা কিছু ঘটেছে, তার জন্যে মি. লিয়ারি ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ম দায়ী। এর জন্যে তোমাকে বলির পাঁঠা বানানো চলে না। তাই ওঁকে প্রস্তাব দেয়া হলো, খুনোখুনি থামিয়ে বিকল্প কোনও সমাধান বের করতে হবে এই সমস্যার। কী করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে মেজর জেনারেল রাহাত আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আলোচনা করে একটা আইডিয়া দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি।'

'আপনি সে-আইডিয়া মেনে নিয়েছেন?' লিয়ারিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সত্যি বলতে কী, বিশাল যে-সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি, সেটার সবচেয়ে ভাল সমাধান এটাই,' লিয়ারি বলল। তার লোকদের কাজ শেষ হয়েছে—ডেস্কের ওপর কম্পিউটার আর একটা ডিজিটাল প্রজেক্টর বসিয়েছে তারা। উঠে গিয়ে প্রজেক্টরটা অন্ করল সে। দেয়ালের গায়ে ফুটে উঠল একটা স্লাইড। তাতে লেখা: *ফোর্ট ডেট্রিক*। তলায়

বারো বছর আগেকার একটা তারিখ।

রানার দিকে ফিরল লিয়ারি। 'অ্যালি সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে আপনার, মি. রানা। বিশেষ করে আপনার বন্ধুরা যা করতে চাইছেন, সেটার জন্যে ওর ব্যাপারে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আপনার।'

একটু থামল সে। কথা গুছিয়ে নিল। এরপর শুরু করল বলতে, 'অ্যালি হলো... রিসার্চের ভাষায় যাকে বলে... একটা নকআউট। সহজ করে বলতে গেলে, অপ্রত্যাশিত একটা ফলাফল। এই রিসার্চটার গোড়া লুকিয়ে আছে বহু আগে, সেই নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে। ফোর্ট ডেট্রিকের বায়ো-ওয়ারফেয়ার ল্যাবে বানর দিয়ে সূচনা হয়েছিল এর। প্রাণীগুলোর ওপর সেন্সরি ডিপ্রাইভেশন টেস্ট চালানো হয়েছিল—বন্দি করে রাখা হয়েছিল এমন সব প্রকোষ্ঠে, যেখানে শব্দ, আলো, গন্ধ... কোনোকিছুরই প্রবেশাধিকার নেই। ফুলপ্রুফ সেল আর কী। কিছুদিন পর ল্যাব ওঅর্কাররা দেখল, সবকিছু বন্ধ রাখার পরেও বানরগুলোর মাঝে অদৃশ্য এক যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একটা সেলের বানর যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা হলে পাশের সেলের বানরটাও উত্তেজিত হয়ে উঠছে। অথচ তা হবার কোনও কারণ নেই। শতকরা পাঁচ ভাগ ক্ষেত্রে ঘটছিল এমন ঘটনা।'

কম্পিউটারের পাশ থেকে সরে এল লিয়ারি। 'আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন, কী ঘটছিল ওখানে। তবে সে-আমলের বিজ্ঞানীরা জানতেন না। জানতে পারলেন, পাঁচ-ছয় বছর পরে... যখন জিনোম সিকোয়েন্সিং সহজ হয়ে উঠল। বানরের জিন বিশ্লেষণ করে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, যে-বানরগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল, কারণ, তাদের দেহে একটা বিশেষ জিন প্রাকৃতিকভাবে অনুপস্থিত। জিনটার নাম এনপি-২০। এই জিনটা দেহের কিছু প্রাচীন জিনকে অবদমিত অবস্থায় রাখে। আমাদের

বিশ্বাস, ওই জিনগুলো প্রাচীনকালের বিভিন্ন প্রাণীকে পরস্পরের আলফা ওয়েভ, বা ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি পড়ার ক্ষমতা দিত।'

'ঠিক যেভাবে ইইজি মেশিন ব্রেইন ওয়েভ পড়তে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এগজ্যাক্টলি,' সায় জানাল লিয়ারি। 'বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কোনও বানর যদি এনপি-২০ জিন ছাড়া জন্মগ্রহণ করে, কিংবা কৃত্রিমভাবে ওই জিন অচল করে দেয়া যায়, তা হলে পুরনো জিনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে ব্রেইনের সিনাপটিক প্যাটার্ন বদলে যায়, এমন সব কাঠামো তৈরি হয় যা ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মত কাজ করতে পারে। এ-কারণেই সব ইন্দ্রিয় বন্ধ করে দেবার পরেও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে ওরা। আমাদের এখনকার রিসার্চের মূলমন্ত্র এল ওখান থেকেই। ইউ সি, এনপি-২০ জিনটা শুধু বানর নয়, উঁচু সারির সব প্রাইমেটের মধ্যেই আছে। মানে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, মানুষ... সবার মধ্যে। পার্থক্য হলো যে, মানবশরীরে এনপি-২০ এর পাশাপাশি আরও তিনটে জিন আছে, যেগুলো ওটার মত প্রাচীন জিনগুলোকে দমিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করে। ব্যাপারটা অনেকটা বন্দুকে বাড়তি সেফটি ক্যাচ লাগানোর মত আর কী। কিছুতেই যাতে গুলি বেরিয়ে না যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, প্রকৃতি মনেপ্রাণে চেয়েছে, আমরা যেন কিছুতেই একে-অন্যের চিন্তা পড়তে না পারি।'

'কিন্তু কেন?' পুরনো প্রশ্নটা আবার তুলল রানা। 'প্রকৃতি কেন এমন একটা ক্ষমতা কেড়ে নিল আমাদের কাছ থেকে?'

'এর উত্তর শুধু প্রকৃতিই দিতে পারে,' লিয়ারি বলল। 'তবে আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। ওই ক্ষমতা দিয়ে ভালর চেয়ে মন্দ হচ্ছিল বেশি, তাই কেড়ে নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, লক্ষ-কোটি বছর আগে... আধুনিক

প্রাইমেটদের পূর্বপুরুষদের মাঝে আলফা ওয়েভ রিড করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। ওটা ছিল এক ধরনের ডিফেন্সিভ মেকানিজম—প্রাগৈতিহাসিক আমলের শিকারি পশুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আদিম একটা অ্যালার্ম সিস্টেম, যেটার মাধ্যমে কেউ একজন বিপদের আভাস পেলে দলের সবাইকে নিঃশব্দে সতর্ক করে দিতে পারত। কিন্তু বিবর্তনের ফলে প্রাইমেটরা যত উন্নত হলো, ওটার মন্দ দিক দেখা দিতে শুরু করল। আদিম প্রাণীদের জীবন ছিল নিম্নস্তরের—খাওয়াদাওয়া আর বেঁচে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক বানরের কথাই ধরুন। পশু হলেও এদের মধ্যে রয়েছে সামাজিক বন্ধন, দীর্ঘমেয়াদি স্মরণশক্তি, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, আনন্দ-বিষাদ-ঘৃণাসহ নানা ধরনের আবেগ। আবেগপূর্ণ একটা প্রাণীর জন্যে মাইণ্ডরিডিঙের ক্ষমতা মোটেই ভাল নয়। কথাটা মানুষের বেলায় আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ আমরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর... অপরের আচরণে আমরা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হই। আর আমাদের রয়েছে প্রতিশোধস্পৃহা। কাজেই অন্যেরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে, সেটা না জানাই ভাল। নইলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।' ক্লিষ্ট দেখাল লিয়ারির মুখ। 'অ্যালি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।'

'কীসের কথা বলছেন আপনি?' প্রশ্ন করল রানা।

'একটু ধৈর্য ধরুন। আগে অ্যালির বৈশিষ্ট্যটা জানাই আপনাকে—কেন সে এলিনা, ভেরোনিকা বা ফোর্ট ডেট্রিকের যে-কোনও টেস্ট সাবজেক্টের চেয়ে আলাদা।' হেঁয়ালি ফুটল লিয়ারির কণ্ঠে। 'আপনি কিন্তু ওটার কথা জানেন। খানিক আগে যা যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে ওটা আপনি স্বচক্ষে দেখতেও পেয়েছেন।'

'কী দেখেছি?' রানা বিভ্রান্ত। 'কখন দেখেছি?'

'ফ্রেজনো থেকে বের হবার সময়ে,' বলল লিয়ারি। 'আপনিই তো বললেন, অ্যালিকে নিয়ে আপনি একটা গাড়ির

ট্রাঙ্কে লুকিয়েছিলেন। একজন পুলিশ অফিসার ওটা চেক করতে চাইছিল। রীতিমত জোরাজুরি করছিল সে। কিন্তু আচমকা মত পাল্টে সে আপনাদের গাড়িটাকে ছেড়ে দেয়, তাই না?'

'আচরণটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি আমার কাছে,' রানা স্বীকার করল। 'কিন্তু এর সঙ্গে অ্যালির কী সম্পর্ক?'

'পুরোটাই,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল লিয়ারি।

'মানে?'

'অ্যালি মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারে, রানা,' বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'ওর ক্ষমতা শুধু মাইণ্ডরিডিঙে সীমাবদ্ধ নয়। এ-মুহূর্তে হয়তো মনে করতে পারছে না, কিন্তু দুটো ক্ষমতাই আছে ওর।'

'মাইণ্ডরিডিংটা প্যাসিভ,' ব্যাখ্যা করল লিয়ারি। 'তার জন্যে কিছু করতে হয় না, আপনাআপনিই অন্যের চিন্তা শুনতে পায় অ্যালি। কিন্তু মাইণ্ড কন্ট্রোলের জন্যে চাই সচেতন প্রচেষ্টা। মনোযোগ একত্র করাসহ নানা ধরনের মানসিক কাজ আছে ওতে। বছরের পর বছর সাধনা করে ওই ক্ষমতা শানিয়ে নিয়েছে অ্যালি, তবে এ-মুহূর্তে সেসবের কিছুই মনে নেই বলে কাজে লাগাতে পারছে না।'

'একেবারে পারছে না, তাও নয়,' মুরল্যাণ্ড বলল। 'যদ্দূর শুনলাম, খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলে, কিংবা মানসিক চাপের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলে নিজের অজান্তেই মাইণ্ড কন্ট্রোলের ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করে অ্যালি। অবচেতনভাবে। নিজেও বোঝে না যে, কাজটা সে-ই করছে।'

'তারমানে, ফ্রেজনোর ওই পুলিশ অফিসারের মাইণ্ড কন্ট্রোল করেছিল ও?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা। 'তাকে বাধ্য করেছিল আমাদের ছেড়ে দিতে?'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'হায় খোদা!' বিড়বিড় করল রানা।

‘ওখানে যা দেখেছেন, তা আসলে কিছুই না,’ বলল লিয়ারি। ‘অ্যালি যখন সচেতনভাবে কাউকে নিয়ন্ত্রণে নেয়, তখন যে তাকে দিয়ে কত কিছু করিয়ে নিতে পারে তা কল্পনা করতে পারবেন না।’

‘এটা শুধু ও-ই পারে? আর কেউ না?’

‘ওর মত না। ফোর্ট ডেট্রিকে অরিজিনাল যে-ড্রাগটা ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটা শুধু মাইণ্ডরিডিঙের ক্ষমতা দিতে পারত সাবজেক্টদের, আর কিছু না। এলিনা আর ভেরোনিকার ক্ষমতাও তাই ওটুকুতেই সীমাবদ্ধ। তবে সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ সম্প্রতি ওই ড্রাগের একটা ইম্প্রুভ্‌ড্ ভার্শান তৈরি করেছে—সেটা ঠিক মাইণ্ড কন্ট্রোল নয়, তবে মাইণ্ড ইনফ্লুয়েন্সের খানিকটা ক্ষমতা দিতে পারে। সোজা কথায়, মনকে প্রভাবিত করা আর কী। কাউকে টার্গেট করে তার সঙ্গে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়—টার্গেটের কাছে মনে হবে, তার মাথার ভেতরে বসে কথা বলছে কেউ। টার্গেটের ব্রেইন ওয়েভ ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতিও সৃষ্টি করা যায়—রাগ, ক্ষোভ, অনুশোচনা, ব্যথা, আনন্দ, যৌনতা, ইত্যাদি। এর কোনোটাই কিন্তু সরাসরি মাইণ্ড কন্ট্রোল নয়। তবে ঐসবের মাধ্যমে টার্গেটকে প্ররোচিত করা যায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্যে—প্যাসিভ কন্ট্রোলের মাধ্যমে। অ্যান্টেনা সাইটগুলোর মাধ্যমে তা-ই করছে সাদার্ন। নিজস্ব কিছু অপারেটিভকে নতুন ড্রাগটা দিয়েছে ওরা, অ্যান্টেনার মাধ্যমে তাদের মাইণ্ড ইনফ্লুয়েন্সের রেঞ্জ বাড়িয়ে নিচ্ছে, তারপর সাধারণ কোনও মানুষকে টার্গেট বানিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছে... তাকে বাধ্য করছে ঘৃণ্য সব কাজ করতে। এক ধরনের ট্রেইনিংও বলতে পারেন—এদেরকে তৈরি করা হচ্ছে প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে।’

‘ইউটাহ্‌র সেই পিকআপ ড্রাইভার...’

'সাদার্নের হতভাগ্য এক শিকার। নিশ্চয়ই বহুদিন থেকে তাকে ট্রেইনিং দেয়া হচ্ছিল। ফাইনালি তাকে মাঠে নামানো হয় আপনাকে খুন করার জন্যে।'

তরুণটির চেহারা মনে পড়ল রানার। বার বার ক্ষমা চাইছিল সে। বলেছিল, কাজটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হচ্ছে তাকে।

'সাদার্নের অপারেটিভরা... যারা নতুন ভার্শানের ড্রাগটা পেয়েছে... তাদেরকে খাটো করে দেখার কোনও উপায় নেই,' বলল লিয়ারি। 'তবে অ্যালির সামনে ওরা স্রেফ দুগ্ধপোষ্য শিশু। নখেরও যোগ্য নয়...'

'কিন্তু অ্যালি তো নতুন ড্রাগটা পায়নি,' রানা বলল। 'ও পেয়েছে পুরনোটা... ওর মায়ের শরীর থেকে। তা হলে ও এত শক্তিশালী হলো কী করে।'

'জবাবটা আপনার কথার মধ্যেই রয়েছে। মায়ের শরীর থেকে ড্রাগটা পেয়েছে অ্যালি, জরায়ুতে থাকা অবস্থায়। আপনার বুঝতে হবে, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের জিনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা খুবই মুশকিল—কারণ ততদিনে তার ডিএনএ সুগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। কিন্তু অ্যালি যখন ওটা রিসিভ করল, তখন সে এক হিসেবে একটা ভেজা মাটির দলা, কোনও ধরনের আকৃতি পায়নি। তখন থেকেই ড্রাগটা কাজ করতে শুরু করেছে, অ্যালির জিন ও ডিএনএ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। কাজেই ওর ওপর ড্রাগের প্রভাবটা হয়েছে অন্য সবার চেয়ে আলাদা।'

চকিতে দেয়ালে ফুটে থাকা লেখাটার দিকে তাকাল সে। তবে প্রজেক্টরে যা দেখাতে চাইছে, সেটা শুরু করল না। তার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মি. রানা, অ্যালির জন্ম আর বেড়ে ওঠা... দুটোই হয়েছে ফোর্ট ডেট্রিকের বন্দিশালায়। খুব অল্প বয়সেই তার ভেতরে মায়ের মত মাইণ্ডরিডিঙের ক্ষমতা

আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা—আঠারো মাস বয়সে। দ্বিতীয় ক্ষমতাটার খোঁজ তাঁরা তখন পাননি... ইন ফ্যাক্ট, ওর বয়স সাত হবার আগে তাঁরা কল্পনাও করেননি অমন একটা ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকতে পারে। যখন টের পেলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে-ঘটনা এবার আপনাকে বলব, তবে তার আগে জানাই, এসবের বেশিরভাগই আমরা এতদিন জানতাম না। জেনেছি দু'মাস আগে, অ্যালিকে ইন্টারোগেট করার পর।'

চুপ করে রইল রানা।

'নিজের ক্ষমতার বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের দিয়েছে অ্যালি,' বলে চলল লিয়ারি। 'একটা নামও দিয়েছে সেটার: *লক করা।* ছোটবেলায় ওটা ছিল তার জন্যে এক ধরনের খেলা। কিন্তু প্রথম যেদিন মাকে ক্ষমতাটা দেখাল—একজন ল্যাব টেকনিশিয়ানকে লক করে তাকে মাথা চুলকাতে বাধ্য করল—অ্যাম্বার মিচেল প্রায় অজ্ঞান হতে বসেছিল। অ্যালিকে শপথ করায় সে, কোনোদিন এই ক্ষমতা কোনও ডাক্তার বা বিজ্ঞানীকে দেখাবে না। অ্যাম্বার জানত, ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, অ্যালিকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেবে বিজ্ঞানীরা, আলাদা কোনও ল্যাবে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। মেয়েকে হারাতে চায়নি সে...'

সেলফোনের রিংটোনে বাধা পড়ল কথায়। লিয়ারির এক সঙ্গীর ফোন বেজে উঠেছে। ক্ষমা চেয়ে কলটা রিসিভ করল সে, সংক্ষেপে কথা সেরে কেটে দিল লাইন। তারপর রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে লিয়ারিকে জানাল, 'উনি ল্যাণ্ড করেছেন। পাঁচ মিনিট লাগবে এখানে পৌঁছুতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে ফিরল লিয়ারি। বলতে থাকল, 'মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে অ্যালি। কারও কাছে ফাঁস করেনি নিজের দ্বিতীয় ক্ষমতার কথা। তবে গোপনে চর্চা চালিয়ে গেছে। সেটা কঠিন কিছু ছিল না, কারণ

যাকে ও লক করে, সে-মানুষটা কিছু বুঝতে পারে না। কাজেই যদি কাউকে চশমা খুলে কাঁচ মুছতে বলা হয়, কিংবা জগ থেকে পানি ঢেলে খেতে বলা হয়, তার ভেতরে কোনও অস্বাভাবিকতা পাবে না সে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কিছু করাত না অ্যালি, টার্গেটের মনে শুধু একটা আকাঙ্ক্ষা বা তাড়না সৃষ্টি করত, যাতে সে নিজ থেকে কাজটা করে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়ারি। 'এসব অবশ্য শুরুর দিকের কথা। এখন সামান্য চশমা মোছানোর চেয়ে অনেক বড় বড় কাজ করাতে পারে মেয়েটা।'

'কী কাজ?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'যেমন ধরুন, লোয়ার ম্যানহাটনের একটা হোটেল রুমে বসে দু'ব্লক দূরের একজন পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজারকে লক করতে পারবে—তাকে দিয়ে দুনিয়ার আরেক প্রান্তের একটা অ্যাকাউন্টে দশ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করাতে পারবে। এরপর তাকে বাধ্য করবে গলা পর্যন্ত মদ গিলতে... বেহুঁশ হয়ে যেতে। যখন বেচারার জ্ঞান ফিরবে... নেশা কাটবে, ততক্ষণে টাকাটা ডজনখানেক অ্যাকাউন্টে ঘুরপাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, ট্রেস করার কোনও উপায় থাকবে না।'

উদাহরণটা খুবই স্পেসিফিক, ভাবল রানা, বাস্তব থেকে নেয়া নয় তো? হ্যানকক সেন্টারের গোটা একটা ফ্লোর কেনার টাকা কীভাবে এসেছিল, তার একটা ব্যাখ্যা মিলছে এবার।

'মাইণ্ডরিডিঙের থেকে লকিং সম্পূর্ণ আলাদা,' বলল লিয়ারি। 'প্রচুর পার্থক্য আছে দুটোয়। রেঞ্জের কথাই ধরুন। মাইণ্ডরিডিঙের জন্যে কাছাকাছি থাকতে হয়, কিন্তু এক মাইল দূর থেকেই আপনাকে লক করতে পারবে অ্যালি। কিচ্ছু টের পাবেন না আপনি। কপাল ব্যথা করবে না, ঠাণ্ডা কোনও স্পর্শ পাবেন না। লক করা অবস্থায় টার্গেটের মাইণ্ডরিডিং চালিয়ে যেতে পারে ও, তাকে দিয়ে যা-খুশি-তাই করিয়ে নিতে পারে।'

চুপচাপ তথ্যগুলো হজম করতে থাকল রানা।

'কী নিয়ে সবাই ভয় পাচ্ছে, সেটা এলিনা আর ভেরোনিকা কেন অ্যালিকে বলেনি, জানেন? কারণ ও নিজেই সেই ভয়ের উৎস। প্রথম উৎস।'

'প্রথম?' কপালে ভাঁজ পড়ল রানার।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লিয়ারি। 'অ্যালির কেসটার ওপর ভিত্তি করে নতুন একদল মাইণ্ড-কণ্ট্রোলার তৈরি করেছে সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্। জরায়ুতে থাকা অবস্থায় ড্রাগটা দেয়া হয়েছে ওদেরকে, সেটা প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। বাচ্চাগুলোর বয়স এখন চার, ইতিমধ্যেই তাদের ভেতর অ্যালির ক্ষমতাগুলোর নিদর্শন পাওয়া গেছে। অ্যান্টেনা সাইটের সাহায্যে ওদেরকে দিয়ে খুব শীঘ্রি ট্রায়াল শুরু করা হবে। প্রথমদিকে বড় ধরনের কিছু হয়তো করানো হবে না...' লিয়ারির গলা মনে হলো শুকিয়ে গেছে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে, '...কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, কয়েক বছরের ভেতরেই নিজেদেরকে খুবই ভিন্ন একটা পৃথিবীতে আবিষ্কার করব আমরা।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পেরে গা শিরশির করে উঠল রানার। রুমের তাপমাত্রা যেন আচমকা কমে গেছে। ও মুখ খোলার আগেই বাইরে শোনা গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। একটা গাড়ি এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে। একজন প্রহরী বেরিয়ে গেল, খানিক পরেই ফিরে এল নতুন একজন মানুষকে নিয়ে।

ডা. টিফানি ক্যানট্রেল।

একত্রিশ

টিফানির সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল লিয়ারি। সেদিন রাতে দূর থেকে ওকে দেখেছে রানা, এবার কাছ থেকে নজর বোলানোর সুযোগ পেল। সুন্দরী, মায়াময় চেহারা। তবে ঘুমের অভাবে ভুগছে বলে মনে হলো। চোখের নিচে কালি পড়েছে। রোগা শরীর, খাওয়াদাওয়াতেও অনিয়ম হচ্ছে নিঃসন্দেহে। বয়সের ব্যাপারে রানার আন্দাজই ঠিক—ত্রিশের আশপাশে।

হাত মেলাল রানা। 'নাইস টু মিট ইউ, ডা. ক্যানট্রেল।'

'আমাকে শুধু টিফানি বলে ডাকলে খুশি হব,' বলল টিফানি। 'অ্যালির জন্যে আপনি যা করেছেন, তাতে আমি আপনার বন্ধু হতে চাইব, মি. রানা।'

'সেক্ষেত্রে আমাকেও রানা বলে ডাকতে পারো।'

'সো নাইস অভ ইউ, রানা।'

'তুমি কি ফোর্ট ডেট্রিকের সঙ্গে জড়িত ছিলে?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তবে অ্যালির সঙ্গে নয়... মানে, শুরু থেকে আর কী,' বলল টিফানি। 'আমি ওখানে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের হয়ে অন্য একটা গবেষণা করছিলাম। ছ'মাসের মাথায় মাইণ্ডরিডিঙের প্রজেক্টটার সঙ্গে যুক্ত হবার প্রস্তাব পাই। খুব যে আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলাম, তা নয়। আমাকে বলা হয়েছিল, ওখানে কিছুদিন সাহায্য করলে আমার ক্যান্সার

রিসার্চের জন্যে মোটা অঙ্কের অনুদান দেয়া হবে। বলা বাহুল্য, রাজি হবার আগে প্রজেক্টের কিছুই আমাকে জানানো হয়নি। শেষে যখন জানলাম, তখন আর পিছিয়ে আসার উপায় ছিল না।'

'অ্যালির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'খুব ভাল। আসলে, ওকে কখনও টেস্ট সাবজেক্ট হিসেবে ভাবিনি। আমি যখন প্রজেক্টে যোগ দিই, তখন ওর বয়স পাঁচ বছর। এতগুলো বন্দি মেয়ের মাঝখানে ছোট্ট একটা বাচ্চা... মায়া হতো খুব। আদর করতাম ওকে। যতটা পারি যত্ন নেবার চেষ্টা করতাম। এক অর্থে ওটাই শেষ পর্যন্ত বিপদে ফেলে আমাকে।'

'কী বিপদ?'

'এখুনি জানবেন, মি. রানা,' বলে উঠল লিয়ারি। 'আমি আমার গল্পের শেষ অংশে পৌঁছে গেছি। এবার আপনাকে বলব, কীভাবে ফোর্ট ডেট্রিক থেকে অ্যালি, এলিনা আর ভেরোনিকা পালায়। ওখান থেকেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন আপনি। তার আগে ওখানকার বন্দিনীদের ব্যাপারে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিতে চাই। ওদের সবাইকে আনা হয়েছিল জেল থেকে... প্রত্যেকেই ছিল ক্রিমিনাল। অ্যালির মা অ্যাম্বরের একটা ড্রাগ রিলেটেড কেসে কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু সত্যিকার অর্থে মন্দ মানুষ ছিল না সে। কথাটা এলিনা বা ভেরোনিকার বেলায় খাটে না। ওরা দু'জনেই সোশিয়োপ্যাথ... খুনের মামলার আসামী। এই তথ্যটা মাথায় রাখবেন।'

দম নিল সে। তারপর খেই ধরল কথার। 'ফোর্ট ডেট্রিক থেকে দু'বার পালানোর চেষ্টা করেছে বন্দিনীরা। প্রথমটা ব্যর্থ হয়, আর দ্বিতীয়টা সফল। প্রথমটা ছিল... যাকে বলে, সুন্দর প্রচেষ্টা... অ্যাম্বার আর অ্যালি ওটাই চেয়েছিল। ওটা যখন ঘটে, তখন অ্যালির বয়স সাত।' টিফানির দিকে ফিরল

লিয়ারি। 'এনেছেন ওগুলো? মি. রানাকে দেখতে দিন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা খাম বের করল টিফানি। তার ভেতর থেকে বেরুল ভাঁজ করা তিনটে কাগজ। প্রথমটা রানার হাতে তুলে দিল সে।

গুটি গুটি হরফে কী যেন লেখা কাগজটায়। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী এটা?'

টিফানি জবাব দিল না।

লিয়ারি বলল, 'পড়ুন। তা হলেই বুঝবেন।'

কাগজে চোখ বোলাল রানা।

টিফানি, আমি অ্যালি। জরুরি একটা কথা বলার জন্যে এ-চিঠি লেখাচ্ছি। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, কারণ তুমি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসো, তখন সারাক্ষণ আমাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়। মা বলেছে, আমাদের কথাবার্তা নাকি গোপনে রেকর্ডও করে রাখে ওরা। তাই চিঠি লেখাতে হচ্ছে। আমাদের সাহায্য করো, টিফানি। মা-র ধারণা, তুমি যদি কোনও পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানকার ঘটনা জানাও, তা হলে আমাদেরকে এরা মুক্তি দিতে বাধ্য হবে। যেভাবে আমাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তা অমানবিক। এভাবে চলতে পারে না। প্লিজ, টিফানি, কোনও একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলো। আমাদেরকে বাঁচাও। আমি জানি, তুমি বাকিদের মত নও, আমাদের জন্যে দরদ আছে তোমার ভেতর। প্লিজ, সাহায্য করো আমাদেরকে।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল রানা। একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে, কারণ অমন কড়া পাহারার ভেতরে অ্যালি চিঠি লিখল কীভাবে... গোপনে টিফানিকে দিলই বা কীভাবে! জিজ্ঞেস

করল, ‘এই চিঠি কি অ্যালি দিয়েছিল তোমাকে?’

মাথা নাড়ল টিফানি। ‘না। এক রাতে নিজের অফিসে বসে ছিলাম, ল্যাব রেজাল্টের কাগজপত্র দেখছিলাম... হঠাৎ কী যেন হলো, সবকিছু একপাশে সরিয়ে কাগজ-কলম তুলে নিলাম, খসখস করে লিখতে শুরু করলাম ওই চিঠি। একবারও মনে হয়নি, আমাকে দিয়ে কেউ ওটা লিখিয়ে নিচ্ছে; মনে হচ্ছিল কবি-সাহিত্যিকদের মত হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া আসায় সেটা লিখতে শুরু করেছি। লেখা শেষ হবার পর পড়ে দেখলাম ওটা, বোকা বনে গেলাম। ভাবলাম, মাথায় নিশ্চয়ই গোলমাল দেখা দিয়েছে।’

চিঠিটার দিকে আবার তাকাল রানা। করুণ এক আকুতি ফুটে উঠেছে ওতে। কল্পনায় সাত বছর বয়েসী অ্যালিকে দেখতে পেল, বন্দিশালার প্রকোষ্ঠে বসে করজোড়ে মিনতি করছে টিফানির কাছে... সাহায্য চাইছে।

‘এরপর কী করলে?’ জানতে চাইল ও।

‘কিছুই না,’ টিফানি বলল। ‘ব্যাপারটা মনের কোনও অদ্ভুত খেয়াল ভেবে সরিয়ে রাখলাম কাগজটা, নিজের কাজে ফিরে গেলাম। কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতে আবার তুলে নিলাম কাগজ-কলম, দ্বিতীয় একটা চিঠি লিখলাম। এই যে... এটা।’

আরেকটা কাগজ এবার রানার হাতে দিল সে। ওটা এরকম:

তোমার মাথায় গোলমাল দেখা দেয়নি, টিফানি, কিংবা এসব কল্পনা করছ না তুমি। সত্যিই আমি যোগাযোগ করছি তোমার সঙ্গে। মা বলল, এটা যে তোমার কল্পনা নয়, তার প্রমাণ দেখাতে। তোমার বসের ইমেইল অ্যাড্রেস জানো তো? দুটো পাসওয়ার্ড লাগে ওটা খোলার জন্যে— ৭১৬পিসি৪২ডি৭৭, এবং ৮০৫জে৫২টি০৯।

চেক করে দেখো। তা হলেই বুঝবে, পাসওয়ার্ডদুটো কোনোভাবেই তোমার জানার কথা নয়, ওটা শুধু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব... তোমার বসের মাথা থেকে। ইমেইল খোলা গেলে তুমি বুঝবে, সত্যি সত্যি আমি যোগাযোগ করছি তোমার সঙ্গে। প্লিজ, টিফানি, আমাদেরকে সাহায্য করো!

'ধরে নিচ্ছি, পাসওয়ার্ডদুটো কাজ করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিঃশব্দে সায় জানাল টিফানি, চেহারায় বেদনার ছায়া।

'মিডিয়ার কাছে যাবার কথা কি ভেবেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যাওনি।'

'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টিফানি। 'প্রথমত, অ্যালির ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। চিঠি লেখানোর বদলে ও তো আমাকে দিয়ে কাউকে খুনও করাতে পারত! দ্বিতীয়ত, আমাকে যেটা করতে বলা হয়েছে, তা ভেবে। নিজেই ভেবে দেখো, মিলিটারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হতো আমাকে... টপ সিক্রেট একটা প্রজেক্টের খবর ফাঁস করে দিতে হতো মিডিয়ার কাছে। এরপর আমার কপালে কী ঘটত? আমেরিকান সরকার কি এমনি এমনি ছেড়ে দিত আমাকে?'

'তাই প্রাণভয়ে চুপ করে রইলে তুমি? অমানবিক একটা গবেষণা চলতে দিলে?' রানার কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগ।

'ওভাবে বোলো না, প্লিজ!' অনুনয় করল টিফানি। 'আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে, রানা। তোমার মত ট্রেইণ্ড এসপিয়োনাজ এজেন্ট নই। সরকার বা মিলিটারির সঙ্গে টক্কর দেবার সাহস না পেলে তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না।'

'সরি,' লজ্জিত হলো রানা। 'আমি আসলে ওভাবে

বলতে চাইনি। যাক গে, এরপর কী করলে?'

'ঝাড়া দশ মিনিট বসে রইলাম মূর্তির মত। বসে বসে ভাবলাম। অ্যালি যা চাইছিল, তা করার সাহস তো পেলামই না, বরং ভাবলাম, ওর ক্ষমতার কথা চেপে গেলে কী ঘটবে। সন্দেহ নেই, ওটা একসময় না একসময় প্রকাশ পাবে, আর তখন আমার বসেরা যদি জানতে পারেন, আমি ব্যাপারটা জেনেও কাউকে বলিনি, তখন কী ধরনের শাস্তি দেয়া হতে পারে আমাকে। ভেবেচিন্তে একটাই করণীয় পেলাম... আমার বসকে গিয়ে দেখালাম চিঠিদুটো।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা।

'ভুল করেছিলাম আমি,' স্বীকার করল টিফানি। 'বিশ্বাস করো, সে-ভুল শোধরানোর জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজি।'

'ভুল তো বটেই। তোমরা নিশ্চয়ই খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলে সবখানে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী ঘটল?'

কম্পিউটারের কাছে গেল লিয়ারি। 'এটা,' বলল সে। স্লাইড-শোর প্লে বাটন চাপল।

মুখ ঘুরিয়ে নিল টিফানি। রানা মনোযোগ দিল প্রজেক্টরে ফুটে ওঠা ছবির দিকে। ঝিরঝিরে একটা রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে দেয়ালে। দেখে মনে হলো, কারাগারের কোনও সেল ব্লকের ছাতে লাগানো সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা। এক সারি কারাপ্রকোষ্ঠ দেখা যাচ্ছে ছবিতে। ন'টা প্রকোষ্ঠে রয়েছে একজন করে বন্দি—কালো জাম্পসুট পরা কিছু নারী। দশমটায় সাত বছর বয়েসী অ্যালি ও তার মা।

'ফোর্ট ডেট্রিকের ষোলো নম্বর বিল্ডিং,' বলল লিয়ারি, 'মানে, যেখানে ওদেরকে রাখা হয়েছিল, সেখানকার সিকিউরিটি ফুটেজের স্ক্রিনশট এগুলো।'

প্রকোষ্ঠগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে এলিনা আর ভেরোনিকাকে খুঁজে বের করল রানা। এরপর তাকাল কোনায় জ্বলজ্বল করতে থাকা টাইমস্ট্যাম্পের দিকে। তারিখটা পাঁচ বছর আগেকার। সময়: রাত সাড়ে এগারোটা।

ছবি বদলাতে শুরু করল। টাইমস্ট্যাম্প কয়েক সেকেণ্ড করে এগোচ্ছে প্রতিটায়। দ্বিতীয় ছবিটা স্বাভাবিক, কিন্তু তৃতীয় ছবিতে পরিস্থিতি বদলে গেল। হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বন্দিনীরা। উঠে দাঁড়িয়েছে। অ্যালিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে তার মা। চতুর্থ ফ্রেমে সিকিউরিটি ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন গার্ড উদয় হলো। অস্ত্র হাতে অ্যাম্বার আর অ্যালির প্রকোষ্ঠের দিকে এগোচ্ছে। বন্দিনীরা চেঁচাচ্ছে তাদেরকে লক্ষ্য করে। মায়ের কাঁধে মুখ গুঁজে রেখেছে অ্যালি।

ধারাবর্ণনা দিতে শুরু করল লিয়ারি। তার কণ্ঠ শীতল, আবেগহীন।

'আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন, মি. রানা, ডা. ক্যানট্রেলের রিপোর্টটা পাবার পর অ্যালিকে সেপারেট টেস্টিঙের জন্যে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওকে আনার জন্যে পাঠানো হয় পাঁচজন গার্ডকে। এরা ছিল অল্পবয়েসী, অনভিজ্ঞ। সত্যিকার কারাগারের কারারক্ষীদের মত বন্দি-সামলানোর অভিজ্ঞতা ছিল না কারও। শটগানে সত্যিকার বুলেট ভরেনি ওরা, লোড করেছিল বিনব্যাগ রাউণ্ড—দূর থেকে গুলি করা হলে ওগুলোর আঘাতে মরে না কেউ, কিন্তু পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে... ওয়েল, আঘাতটা ভয়াবহ। সরাসরি অ্যাম্বারের প্রকোষ্ঠে ঢোকে ওরা, অ্যালিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। দু'পাশের প্রকোষ্ঠের দুই বন্দিনীকে কেয়ারই করেনি ওরা। ফলে, গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একজন গার্ডের অস্ত্র কেড়ে নেয় এক বন্দিনী, ফায়ার ওপেন করে। দু'জন গার্ড আহত হয় তাতে, মাটিতে পড়ে যায়।

বাকি তিনজনের ভেতর দু'জন অ্যালিকে টেনেহিঁচড়ে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। অ্যাম্বার বাধা দেবার চেষ্টা করলে তৃতীয়জন তার মুখের কাছে শটগান তুলে ফায়ার করে—মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর থেকে। পুরো মুখমণ্ডল থেঁতলে যায় অ্যাম্বারের, ওখানেই মারা যায় সে, অ্যালির চোখের সামনে।

'এরপর যা ঘটল, তা ব্যাখ্যাতীত। আচমকা অ্যালিকে ছেড়ে দিল গার্ডেরা। ছুটে গিয়ে মায়ের মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল মাটিতে। ততক্ষণে অন্যপাশের প্রকোষ্ঠের মেয়েটা আহত এক গার্ডের শটগান কুড়িয়ে নিয়েছে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে। দু-দুটো শটগান থেকে ফায়ার করা হলো তিন গার্ডের ওপর, ওরা আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। শটগানের পরের গুলিতে দরজার তালা ভেঙে বেরিয়ে আসে দুই বন্দিনী, সবাইকে মুক্ত করে। গার্ডদের সবাইকে খুন করে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিল্ডিং থেকে বেরুবার চেষ্টা করে বন্দিনীরা। তবে তার আগেই সিকিউরিটি ক্যামেরার কল্যাণে ঘটনাটা জেনে গেছে সবাই। লাইভ অ্যামিউনিশন-সহ একটা টিম পাঠানো হয় ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে। ষোলো নম্বর বিল্ডিঙের করিডোরে শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ। প্রশিক্ষিত, সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে বিনব্যাগ রাউণ্ডঅলা শটগান নিয়ে পেরে ওঠার কথা নয় কয়েকটা মেয়ের, খুব শীঘ্রি মারা পড়ে ওদের সবাই।

'স্লাইডের দিকে লক্ষ করুন, মি. রানা। দু'জন বন্দিনী এই ব্যর্থ পলায়ন প্রচেষ্টায় যোগ দেয়নি—এলিনা ও ভেরোনিকা। নিজেদের প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়েই অ্যাম্বারের প্রকোষ্ঠে ঢুকেছে ওরা, অ্যালিকে লাশের পাশ থেকে সরিয়ে এনে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। কানে কানে কিছু বলছে সারাক্ষণ। তার ফলাফল পরের ফ্রেমে দেখতে পাবেন। শটগানধারী বন্দিনীদের হত্যা করার পর ওদেরকে গ্রেফতার

করার জন্যে এগোতে শুরু করেছে সিকিউরিটি টিম, হঠাৎ কী যেন হলো তাদের। বন্দুক ঘুরিয়ে একে অন্যকে গুলি করতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর মারা গেল সবাই। অবস্থা দেখে ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ দ্বিতীয় একটা টিমকে পাঠানো হলো, এদের অবস্থাও হলো প্রথম টিমের মত। নিজেরা গোলাগুলি করে খুন হয়ে গেল। শেষ যে-লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সে নিজের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করল।'

স্লাইড-শো শেষ। বন্ধ হয়ে গেল প্রজেক্টর। রানার দিকে ঘুরল লিয়ারি। 'সেদিন রাতে পুরো বেসজুড়ে এরপর যা ঘটেছে, সেটাকে গ্যাস-লাইন এক্সপ্লোশন বলে প্রচার করেছি আমরা, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সাতষট্টি জন মারা গেছে সে-রাতে, প্রত্যেকেই গুলির আঘাতে—নিজের কিংবা ঘনিষ্ঠ কোনও সহযোদ্ধার অস্ত্র থেকে। ষোলো নম্বর বিল্ডিঙে যেটার সূচনা ঘটেছিল, সেটা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো বেসে। বেঁচে গিয়েছিল শুধু কিছু নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ সিভিলিয়ান; এ ছাড়া ঘাঁটিতে যত মানুষের হাতে অস্ত্র ছিল, তাদের প্রত্যেকেই খুন হয়ে গেছে অবিশ্বাস্যভাবে। এর জন্যে দায়ী অ্যালিসন মিচেল। পাশে বসে সান্ত্বনা দেবার নামে ওকে পরামর্শ দিয়ে গেছে এলিনা আর ভেরোনিকা।

'চার মিনিট পর, সবকিছু যখন শেষ হয়ে গেল, ওদেরকে ঠেকাবার আর কেউ ছিল না। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে চড়েছে ওরা, গেট খুলে বিনা বাধায় চলে গেছে ফোর্ট ডেট্রিক থেকে। যাবার আগে শেষ একটা কাজ করেছে অ্যালি—তৃতীয় একটা নোট লিখিয়েছে ডা. ক্যানট্রেলকে দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি, নিজের অফিসে একাকী কাজ করছিলেন, গোলাগুলির আওয়াজ শুরু হতেই লুকিয়ে পড়েছিলেন ডেস্কের তলায়। ডা. ক্যানট্রেল, নোটটা দেখান মি. রানাকে।'

হাতে ধরা তৃতীয় কাগজটা এবার রানাকে দেখতে দিল

টিফানি। দুটো মাত্র শব্দ লেখা ওটায়।

তুমি দায়ী।

বত্রিশ

কাগজটার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল রানা। মনে পড়ে যাচ্ছে, শিকাগোর অ্যাপার্টমেণ্টে লাঞ্চের সময় হওয়া আলোচনার কথা। টিফানির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল অ্যালি। এলিনা তখন বলেছিল, আগামী এক সপ্তাহের ভেতরে কোনও বিপদ হবে না তার। কেন অতটা নিশ্চিত হয়ে বলছিল, সেটা বুঝতে পারছে এবার। টিফানির বিপদ আসলে লিয়ারির তরফ থেকে নয়, স্বয়ং অ্যালির তরফ থেকে আসবে। স্মৃতি ফিরতে যেহেতু এক সপ্তাহ লাগবে ওর, সে-সময়টায় বিপদ না হবারই কথা।

'গল্পটা এখনও শেষ হয়নি।' লিয়ারির কথায় সংবিৎ ফিরল রানার। 'ফোর্ট ডেট্রিকের ঘটনার এক সপ্তাহ পর, ওয়াশিংটন ডি.সি. ও তার আশপাশে, রিসার্চের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু মানুষ আত্মহত্যা করতে শুরু করলেন। এঁদের প্রত্যেকেই প্রজেক্টটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, বিশেষ করে ওখানে কী ঘটেছে, সেটা ঠিকমত বুঝবার জন্যে... পাল্টা ব্যবস্থা নেবার জন্যে এঁদেরকে খুব প্রয়োজন ছিল সরকারের। এলিনা আর ভেরোনিকার প্রশংসা করতেই হয়—মাঠ থেকে খুব দ্রুত মূল খেলোয়াড়দের সরিয়ে ফেলছিল ওরা, যাতে পুরো প্রজেক্টটাই বন্ধ হয়ে যায়। তা-ই

হয়েছিল। এরপরেও থামেনি ওরা, নজরদারি চালিয়ে গেছে। যখনই সরকার রিসার্চটা চালু করার চেষ্টা করেছে, আঘাত হেনেছে। শেষে আমার কোম্পানি আর সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্‌কে মাঠে নামানো হয়। ওদেরকে ফাঁকি দেবার কৌশল আবিষ্কার করি আমরা।'

'কৌশলটা কী? খুন?' ভুরু নাচাল রানা।

'না, মি. রানা। খুন করা গেলে তো বহু আগেই করা হতো। ওদেরকে নাগালেই পাওয়া যায়নি। আমরা একটা বিকল্প খুঁজে বের করি। মাইণ্ডরিডিঙের মাধ্যমে সব জেনে নেয় ওরা, কাজেই সেটাকে ট্যাকেল করার দিকে মনোযোগ দিই। ঢেলে সাজাই আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো—অসংখ্য স্তর ও শাখা-প্রশাখা দিয়ে। নিজের কাজের বাইরে কেউই তেমন কিছু জানবে না; টপ লেভেলের যারা বিস্তারিত জ্ঞান রাখে, তাদের পরিচয় থাকবে গোপন। রিসার্চ সাইটগুলো দাঁড় করানো হলো দুর্গম, প্রত্যন্ত সব এলাকায়, যেখানে সহজে পৌঁছুনো যায় না; নতুন কেউ তার ধারেকাছে গেলে চোখে পড়ে যাবে। সোজা কথায়, প্যারানয়েডের মত চলতে শুরু করলাম আমরা। এদিক থেকে ডা. ক্যানট্রেল অবশ্য আমাদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে ছিলেন।'

চকিতে টিফানির দিকে তাকাল রানা। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে চেয়ারে বসে আছে সে।

'ফোর্ট ডেট্রিকের ঘটনার এক ঘণ্টার ভেতর ওখান থেকে পালিয়ে যান ডা. ক্যানট্রেল,' বলল লিয়ারি। 'কারও সঙ্গে কথা বলেননি, পুলিশ বা মিলিটারির জন্যে অপেক্ষা করেননি। কাউকে কিছু না বলে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। সম্ভবত সে-কারণেই আজও বেঁচে আছেন তিনি।'

'ফ্লোরিডায় আমার এক বন্ধুর ভ্যাকেশন হোম ছিল,' জানাল টিফানি। 'ওখানে গিয়ে উঠি আমি। ছ'মাসের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাই পরিচিত দুনিয়া থেকে। কেউ জানত না

ওখানকার কথা। তাই অ্যালি কিংবা ওর দুই সঙ্গিনী খোঁজ পায়নি আমার। পেলে বাঁচতে দিত না।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'তোমাকে খুন করতে চাইলে ফোর্ট ডেট্রিকেই খুন করতে পারত অ্যালি। আত্মহত্যা করাতে পারত। তিন নম্বর নোটটা লেখাত না।'

'এ-নিয়ে আমিও ভেবেছি,' টিফানি বলল। 'আমাকে ও ঘৃণা করে, সন্দেহ নেই... কিন্তু খুন করার মত না। অন্তত তখন সে-ধরনের চিন্তা ছিল না ওর মাঝে। কাউকেই খুন করার মত মানুষ ছিল না ও। কিন্তু ওর সঙ্গে রয়েছে এলিনা আর ভেরোনিকার মত দুটো সাইকোপ্যাথ। এরা ওর মন বিষিয়ে তুলেছে, ওকে দিয়ে খারাপ কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের ক্ষমতা তো খুব বেশি কিছু না, স্রেফ মাইণ্ডরিডিং পর্যন্ত। কিন্তু স্বার্থোদ্ধারের জন্যে অ্যালি একটা মোক্ষম অস্ত্র। বাচ্চা একটা মেয়ে, ভালমন্দ বিচারের বয়স হয়নি, ওকে যা বোঝানো হচ্ছে তা-ই করছে। আর ওকে মোটিভেটেড রাখার জন্যে আমাকে বেছে নিয়েছে ওরা। এমনভাবে ব্রেইনওয়াশ করেছে ওর, অ্যালির জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য এখন আমাকে খুন করে প্রতিশোধ নেয়া... বাকি যা করানো হচ্ছে ওকে দিয়ে, সবই আমার কাছে পৌঁছুনোর জন্যে। স্লিপ ইন্টারোগেশনে এসবই বলেছে অ্যালি।'

'পাঁচ বছরে তোমাকে ও খুঁজে পায়নি কেন?'

'কারণ, ফ্লোরিডায় ছ'মাস লুকিয়ে থাকার পর ডা. ক্যানট্রেল যখন আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তাঁকে রক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়,' বলল লিয়ারি। 'নামধাম পাল্টে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় অ্যামারিলোতে। হাতেগোনা দু'চারজন ছাড়া কেউ সে-খবর জানত না।'

টিফানির দিকে তাকিয়ে মায়া হলো রানার। পাঁচ বছরের সার্বক্ষণিক আতঙ্কের ছাপ পড়েছে চেহারায়। অ্যালির আতঙ্ক। ডাইনোসরের পুতুল জড়িয়ে ধরে থাকা নিষ্পাপ এক

কিশোরীর সঙ্গে তা কিছুতেই মেলাতে পারছে না ও।

'অ্যালি যদি এতই শক্তিশালী হয়ে থাকে,' লিয়ারিকে জিজ্ঞেস করল ও, 'দু'মাস আগে ওকে আপনারা ধরলেন কীভাবে?'

বিব্রত দেখাল লিয়ারিকে। 'ইয়ে... ডা. ক্যানট্রেলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করি আমরা... তাঁকে কিছু না জানিয়ে। তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করি আমি, এরপর যাদের ওপর এলিনা আর ভেরোনিকা নিয়মিত নজর রাখছে, তেমন একজনকে কৌশলে জানিয়ে দিই ঠিকানাটা। এমনভাবে, যেন সে ঘটনাক্রমে ওটা জানতে পেরেছে। জানতাম, কোনোভাবে ঠিকানাটা পেলে অ্যালি আর চুপ করে বসে থাকবে না, হামলা করতে আসবে।'

'প্ল্যানটা ঠিক পছন্দ হলো না আমার,' রানা বলল। 'এক মাইল দূর থেকে মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারে অ্যালি। আপনারা ওকে লোকেট করার আগেই টিফানিকে আত্মহত্যা করাতে পারত!'

'ওঁরা আসলে আমার বাঁচামরা নিয়ে মাথা ঘামাননি,' ক্ষুব্ধ সুরে বলল টিফানি। 'ভেবেছেন, আত্মহত্যা করালেই ভাল। তা হলে শিয়োর হতে পারবেন, ওকে এক মাইলের ভেতর পাওয়া যাবে। অপারেশন চালাতে পারবেন সেই মোতাবেক।'

'না, না, আমরা আপনার মৃত্যু চাইনি,' তাড়াতাড়ি বলল লিয়ারি। কৈফিয়ত দিল, 'ঝুঁকি একটু বেশি নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ওকে ধরার জন্যে ওটুকু না নিয়ে উপায় ছিল না। তা ছাড়া, আপনার নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। বাড়ি, গাড়ি, অফিস... সবখানে ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। অ্যামারিলোর ওপরে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আধ ডজন ড্রোন উড়েছে, মিরাণ্ডা স্যাটেলাইট ফিক্স করে রাখা হয়েছে। আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেউ যেন আপনার কাছাকাছি পৌঁছুতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রেখেছিলাম

আমরা।'

'ধরে নিচ্ছি, ওতে কাজ হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। ফাঁদ পাতার এক মাসের মাথায়, ডা. ক্যানট্রেলের বাড়ির দু'ব্লক দূরে, একটা পার্কে অ্যালিকে খুঁজে পায় একটা ড্রোন। সব ড্রোনেই আমরা লো-পাওয়ারের মিসাইল বসিয়েছিলাম, মেয়েটাকে দেখতে পাওয়ামাত্র একটা মিসাইল ছোঁড়া হয়। ওর শরীরের পাঁচ মিটার দূরে সেটার বিস্ফোরণ ঘটাই আমরা। শকওয়েভে ছিটকে পড়ে অ্যালি, পাঁজরের তিনটা হাড় ভেঙে যায়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর আমাদের টিম গিয়ে কবজা করে ওকে। জ্ঞান যাতে না ফেরে, তার জন্যে নারকোটিক্স ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'বাকি দু'জন ছিল না ওর সঙ্গে?'

'থাকলেও কাছাকাছি ছিল না। আমরা ওদের হদিস পাইনি। অপারেশনের ওটাই ছিল একমাত্র দুর্বলতা।'

'দুর্বলতা তো বটেই,' টিফানি বলল। 'ওদের ভয়ে গত দু'মাস ধরে আমাকে বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে: ওরা আমার মন পড়ছে কি না। দু'জনেই খুব চালু, জানো? নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব থেকে যদি মাইণ্ডরিডিং করে, মাথায় কোনও ব্যথা হয় না। তাই বোঝাও যায় না, ওরা আশপাশে আছে কি না।'

সত্যিই টিফানির ওপর নজর রাখছিল ওরা, ভাবল রানা। কেন, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অ্যালিকে হারিয়ে নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, টিফানির মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া যাবে অ্যালির... ওকে উদ্ধার করা যাবে।

'হুম, সবই পরিষ্কার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'এবার তোমাকে শেষ একটা প্রশ্ন করব, টিফানি। তুমি কি সত্যিই অ্যালিকে বাঁচাতে চাও?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল টিফানি। 'ওর কোনও দোষ নেই। এসবের কিছুই ও স্বেচ্ছায় করেনি।'

'কিন্তু মেয়েটা বিপজ্জনক!' প্রতিবাদ করল লিয়ারি। 'শুধু আপনার জন্যে নয়, অনেক মানুষের জন্যে।'

'সমস্যাটার একটা সমাধান আছে!'

বিরক্ত হলো লিয়ারি। কীসের কথা বলছে টিফানি, তা বুঝতে পেরেছে।

'কী সমাধান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সমস্যার সূচনা যা দিয়ে হয়েছে, সেটাই,' বলল টিফানি। 'জিনেটিক ম্যানিপুলেশন। পাঁচ বছর সময় পেয়েছি আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে। যে-ড্রাগের প্রভাবে অ্যালি তার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা পেয়েছে, সেটার প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে। চাইলেই পুরো প্রক্রিয়াটা রিভার্স করে দিতে পারি আমরা।'

অপলকে চেয়ে রইল রানা।

'সময় লাগবে প্রচুর, কিন্তু কাজ হবে ওতে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল টিফানি। 'অ্যালিকে যদি আরেকবার জীবন্ত ধরা যায় আর কী।'

'এভাবে বলা উচিত হচ্ছে না আপনার,' লিয়ারি মাথা নাড়ল। 'অ্যানিমেল ট্রায়ালে কাজ হয়েছে মানে এ-ই নয় যে...'

'কাজ হবে, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি,' তাকে থামিয়ে দিল টিফানি। 'ক্ষমতাটা হারানোর পর কী ঘটবে, তা বলতে পারি না। হয়তো মানসিক বিপর্যয় হবে ওর, দীর্ঘদিন থেরাপি দিতে হবে। কিন্তু তারপরেও ছোট্ট একটা সম্ভাবনা থেকে যায়—কোনোদিন সুস্থ হবে ও, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে। আমাদেরকে সে-চেষ্টা করতেই হবে।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মেজর জেনারেল রাহাত খানও একই মত দিয়েছেন,' মুরল্যাণ্ড জানাল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিয়ারি।

'বেশ,' বলল রানা। 'তা হলে প্ল্যানটা কী? কিছু একটা

নিশ্চয়ই ঠিক করেছ তোমরা?'

'করেছি।'

'শোনাও।'

দৃষ্টি বিনিময় করল মুরল্যাণ্ড আর লিয়ারি।

'কী হলো?' রানা তাড়া দিল ওদেরকে।

'আরেকটা ফাঁদ পাতব আমরা,' লিয়ারি বলল। 'এবার টোপ হিসেবে ডা. ক্যানট্রেল আর আপনি... দু'জনেই থাকবেন। এতে কোনও জোরাজুরি নেই। চাইলে আপনি এতে অংশ না-ও নিতে পারেন। আপনার নামে যে-ম্যানহান্ট শুরু করা হয়েছিল, সেটা ইতিমধ্যে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জনসাধারণকে বলা হবে, বোমাবাজ লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে, ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। মানে, আপনি মুক্ত। যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন।'

'এসব শুনতে চাই না,' বলল রানা। 'আমি থাকছি। প্ল্যানটা খুলে বলুন আমাকে।'

'সরি, দোস্ত,' মুরল্যাণ্ড বলল, 'ওটাই জানানো যাবে না তোমাকে। অন্ধকারে থাকতে হবে, নইলে তোমার মাথা থেকে সব জেনে নেবে অ্যালি।'

ঠোঁট কামড়াল রানা। অভিজ্ঞতাটা নতুন। অন্ধের মত কোনও কাজে নামতে অভ্যস্ত নয় ও। তবে মিনিট দুয়েক ভেবেই বুঝতে পারল, আর কোনও উপায়ও নেই।

'শুধু এটুকু বলতে পারি,' লিয়ারি বলল, 'একটা বাড়িতে রাখা হবে আপনাদের—পূর্ব ক্যানসাসের ফার্ম ল্যাণ্ডে। বাড়ির আধমাইল দূরে একটা ব্যস্ত রাস্তা থাকবে, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেণ্ট আর স্টোর। চব্বিশ ঘণ্টাই মানুষ আনাগোনা করে ওখানে।'

প্ল্যানের একটু আভাস পেল রানা। 'হুম! আপনারা তা হলে অ্যালিকে আশ্বস্ত করতে চাইছেন যে, ভিড়ভাট্টার কাভার নিয়ে ওর পক্ষে আমাদের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব...

লকিঙের রেঞ্জের মধ্যে।'

'আমরা চাই, ও আরও কাছাকাছি পৌঁছাক,' হেঁয়ালি করল লিয়ারি। 'একদম কাছে!'

'মানে?'

টিফানি দিল জবাবটা। 'আমাকে অ্যালি কতটা ঘৃণা করে, তা তুমি জানো না, রানা। ঘৃণাটা এতই বেশি যে, আমাকে আত্মহত্যা করালে তৃপ্তি পাবে না ও। এল্ সেডেরোর ইন্টারোগেশনের সময় বলেছে, আমাকে ও নিজ হাতে খুন করতে চায়। জীবনের শেষ মুহূর্তটায় আমি যেন ওর চোখে চোখ রেখে মরি।' গলা ভেঙে গেল ওর।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল কামরায়।

গলা খাঁকারি দিল রানা। 'এসব জেনেও তুমি টোপ হতে চাইছ?'

'আমি নিরুপায়, রানা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে, অ্যালিকে সুস্থ করে তোলার জন্যে... ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হবে।'

মাথা নিচু করে ফেলল টিফানি।

'ব্রিফিং এখানেই শেষ,' বলল লিয়ারি। 'ডা. ক্যানট্রেল, মি. রানা, তৈরি হয়ে নিন। আপনাদেরকে আমরা ওই বাড়িতে নিয়ে যাব। ডা. ক্যানট্রেলের বসকে কৌশলে বাড়ির ঠিকানা, আর ওখানে যাবার একটা মিথ্যে অজুহাত জানিয়ে দেয়া হবে। অ্যালি যখন স্মৃতি ফিরে পাবে, নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরুবে ডা. ক্যানট্রেলকে। ঠিকানাটা জেনে নেবে সে। ততক্ষণ আমরা ওর অপেক্ষায় থাকব।'

'প্ল্যানটা মোটেই জুৎসই নয়,' মন্তব্য করল রানা। 'ফার্মহাউসটা যে একটা ফাঁদ, সেটা ও সহজেই বুঝতে পারবে।'

'তা তো পারবেই,' স্বীকার করল লিয়ারি। 'শুরুতে যদি না-ও বোঝে, আপনাদেরকে লক করামাত্র জেনে যাবে।'

‘তা হলে ফাঁদে পা দেবে কেন সে?’

‘হয়তো দেবে না। আবার দিতেও পারে। ফাঁদের ব্যাপারটা জেনে ফেলায় ওভার-কনফিডেন্ট হয়ে উঠতে পারে। হয়তো ভাববে, আমাদেরকে বোকা বানানো সম্ভব।’

‘ভাবলে একেবারে ভুল ভাববে না।’

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়ারি। ‘ঝুঁকি তো থাকেই।’

‘ভেরোনিকা ওকে বাধা দেবে না?’

‘দিলেও শুনবে ভেবেছেন?’ হাসল লিয়ারি। ‘এখন আর কচি খুকি নয় অ্যালি। এলিনা না থাকায় ভেরোনিকা একা। কেন ওর কথায় উঠবে-বসবে সে? শক্তির দিক থেকেও ভেরোনিকা ওর সামনে চুনোপুঁটি। এখন বরং ওর কথাতেই চলতে হবে ভেরোনিকাকে।’

চোখের সামনে অ্যালির নিষ্পাপ মুখটা ভেসে উঠল রানার। হিংস্র এক খুনির মত যে-চেহারা ওর সামনে তুলে ধরছে এরা, তা মানতে পারছে না কিছুতেই।

রানার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে লিয়ারি। শীতল গলায় বলল, ‘ওকে আপনি চেনেন না, মি. রানা। সত্যিকার অ্যালিকে ডা. ক্যানট্রেল চেনেন... আমি চিনি। ও কী করতে চায়, আর ওর পক্ষে কী করা সম্ভব, তা জানি শুধু আমরা। আমি এখনও বলব, এতসব ঝামেলায় না গিয়ে ওকে খতম করে দেয়াই ভাল।’

‘কক্ষণো না!’ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

‘আমিও তোমার সঙ্গে একমত,’ সুর মেলাল টিফানি। ‘এসব ঘটার আগে অ্যালির চেহারা আমি দেখেছি। জানি, ও কী হতে পারত। এখনও ওকে সে-জীবনে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব।’

হাল ছেড়ে দিল লিয়ারি। ‘বেশ, তা হলে উঠুন। রওনা হওয়া যাক।’

তেত্রিশ

পুরনো হ্যাচব্যাক গাড়িটা চালিয়ে ড্রাইভওয়ে থেকে বেরিয়ে এল জেফরি ফলসাম। মোড় নেবার আগে ঘুরে তাকাল তার ট্রেইলার হোমটার দিকে। দর্শনীয় কিছু নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে ওটাকেই নিজের বাড়ি বলে জানে সে। ওখানে আর কোনোদিন ফিরবে কি না জানে না জেফরি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ি নিয়ে নামল রাস্তায়। দ্বিতীয়বার ওদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করল পশ্চিম-অভিমুখী পথে।

একচল্লিশ বছর বয়স তার। পুরোটাই কাটিয়েছে ওয়াইওমিং রাজ্যের প্রত্যন্ত এক শহর ক্লোভারে। রেড সিটি নামে সামান্য বড় আরেকটা শহর রয়েছে দশ মাইল দূরে। তরুণ অবস্থায় বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল সে। মাতলামি, গুণ্ডামি, মারপিট... এসব ছিল নিত্যদিনের কাজ। বয়স ত্রিশ হবার পর বোধোদয় ঘটল, সব ছেড়ে দিল সে। যোগ দিল চাচার কাঠের দোকানে। মন দিল নানা ধরনের আসবাবপত্র তৈরির কাজে। শাইয়েনের বড় বড় বিল্ডিং কন্ট্রাক্টররা কিনে নিত সেসব আসবাবপত্র।

কাজটাকে ভালবেসে ফেলেছিল জেফরি। সৃষ্টির আনন্দ পেয়ে বসেছিল ওকে। একেকটা আলমারি, বুকশেলফ, খাট, টেবিল আর চেয়ারকে মনে হতো নিজের সন্তানের মত, পুলকে ভরে যেত হৃদয়। পুরনো জীবনটাকে ভুলে গিয়েছিল সে, আলিঙ্গন করেছিল নতুনটাকে। বাকি জীবন এ-ই করে

কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। কাঠমিস্ত্রীর কাজ করে ধনী হতে পারবে না জানত, কিন্তু দুঃখ হয়নি কোনও। মনের শান্তিটাই ছিল বড়।

সবকিছু বদলে গেল বছরখানেক আগে, যখন একটা ভুতুড়ে কণ্ঠ উদয় হলো তার মাথায়। ভূত... হ্যাঁ, ভূতই বটে, আর কোনও ব্যাখ্যা নেই এর। শুরুতে লড়েছে জেফরি, যুদ্ধ করেছে ওই ভূতের সঙ্গে। কিছুতেই মানতে চায়নি কণ্ঠটার অস্তিত্ব, কিংবা সেটার আদেশ-নির্দেশ। কিন্তু লাভ হয়নি। ধীরে ধীরে বশীভূত হতে হয়েছে ওই ভূতের কাছে, হতে হয়েছে তার হুকুমের চাকর। এক বছরের মাথায়, আজ, পরাস্ত এক মানুষে পরিণত হয়েছে সে; বিনা প্রশ্নে রওনা হয়েছে ভূতের হুকুম তামিল করতে।

হুকুমটা বেশ অদ্ভুত। আজ পর্যন্ত যত আদেশ তাকে দেয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই অদ্ভুত ছিল, কিছু ছিল রীতিমত ভয়ঙ্কর, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আজকেরটা সেগুলোর চেয়ে আলাদা। এখন পর্যন্ত যত কাজ তাকে দিয়ে করানো হয়েছে, সেগুলো সবই ছিল ক্লোভারে, কিংবা আশপাশের দু'চার মাইলের ভেতরে। অথচ হঠাৎ করে আজ তাকে বলা হয়েছে গাড়ি নিয়ে ক্যানসাসের উদ্দেশে রওনা হবার জন্যে। ওখানে পৌঁছে বিশেষ একটা শহরের বিশেষ একটা মোটেলে উঠতে হবে তাকে। এরপর অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

কী নির্দেশ আসতে পারে, জানে না জেফরি। কে দিচ্ছে এসব নির্দেশ, তাও জানে না। শুধু এটুকু জানে, যা-ই বলা হোক না কেন, সেটা পালন করতেই হবে তাকে। না করে উপায় নেই।

চৌত্রিশ

মাঝরাতের খানিক আগে হাতের বইটা বন্ধ করল রানা, বেরিয়ে এল ফার্মহাউসের বারান্দায়। উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে ভেসে আসছে উষ্ণ, আর্দ্র হাওয়া। বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে বাইরে নজর বোলাল ও। বাড়ির সামনের জমিন একটু ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রায় দু'শো গজ, ড্রাইভওয়েটা ঠিক তার মাঝ দিয়ে এগিয়েছে। চারদিকে ঘাসে ছাওয়া সমতল মাঠ। বিশাল প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, সবদিকেই অন্তত ছ'শো গজ খোলা জায়গা, ফলে গা-ঢাকা দিয়ে কারও পক্ষে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুনো সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই, এ-কারণেই ফাঁদ পাতার জন্যে জায়গাটা বেছে নিয়েছে লিয়ারি।

বাড়িটার বয়স অন্তত একশো বছর—বিবর্ণ চেহারা নিয়ে বহন করছে অতীতের স্মৃতি। উত্তরে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে টোপেকা নামের আধুনিক নগরী, হয়তো কয়েক বছরের ভেতরেই পৌঁছে যাবে এই বাড়ির লোকেশন পর্যন্ত। ব্যস্ত যে-সড়কের কথা বলেছে লিয়ারি, সেটা দক্ষিণে... দিগন্তের কাছে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। যেন নিয়ন আর সোডিয়াম বাতি লাগানো একটা ফিতে। অ্যালি ওখানে আছে কি না, কে জানে। দশদিন হলো ফার্মহাউসে উঠেছে ও আর টিফানি, ওদের খোঁজ পেতে এত সময় লাগার কথা নয় মেয়েটার।

অন্ধকারে, রানার ডানদিকে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল বারান্দায় ঝোলানো দোলনাটা। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঝট্ করে ওদিকে ঘুরে গেল ও, সবগুলো স্নায়ু টানটান হয়ে উঠেছে। পরমুহূর্তে ঢিল দিল পেশিতে। কেউ নেই। বাতাসে নড়ে উঠেছে প্রাচীন দোলনা—বাড়িটার সমান বয়স ওটার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ রাতের প্রকৃতি দেখল রানা, এরপর ফিরে গেল ভেতরে।

নিজের কামরায় ঘুমাচ্ছে টিফানি। একটা রুটিন করে নিয়েছে দু'জনে, যাতে যে-কোনও সময় অন্তত একজন জাগ্রত অবস্থায় থাকে। ফার্মহাউসে ওদেরকে রেখে যাবার সময় খুব বেশি কিছু বলে যায়নি লিয়ারি। শুধু কাছাকাছি থাকতে, এবং চোখকান খোলা রাখতে পরামর্শ দিয়ে গেছে। দু'জনকেই একটা করে সেলফোন দিয়ে গেছে—কন্ট্যাক্ট লিস্টে নিজের ফোন নাম্বার-সহ। বলে দিয়েছে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই যেন ওরা ফোন করে তাকে।

কিচেনে ঢুকল রানা। বিশাল প্যান্ট্রিতে মজুত করে রাখা হয়েছে অন্তত দু'মাস চলার মত শুকনো খাবার। অ্যাটাচড্ গ্যারাজে রয়েছে তিনটে অতিকায় ডিপ ফ্রিজ—মাছ, মাংস আর নানা ধরনের সবজিতে টইটম্বুর সেগুলো। গ্যারাজে দুটো গাড়িও আছে—একটা ফোর্ড এস্কেপ এস.ইউ.ভি, আর একটা শেভি ম্যালিবু সেডান। ফিউয়েল ট্যাঙ্ক ভরে রাখা হয়েছে, ইগনিশনে সারাক্ষণ ঝুলছে চাবি... যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সটকে পড়া যায়। নিয়ম করে গাড়িদুটো স্টার্ট দেয় রানা, ব্যাটারি যেন বসে না যায়।

কাউন্টারের ওপর পড়ে আছে টিফানির ল্যাপটপ কম্পিউটার—চার্জ হচ্ছে। জিনিসটা আনতে বাধা দেয়নি লিয়ারি, ব্যবহারেও কোনও নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। সন্ধ্যায় ওতে ইমেইল চেক করছিল টিফানি, খানিক পর ল্যাপটপ বন্ধ করে বেরিয়ে গিয়েছিল বারান্দায়। দোলনায় বসে দোল খেতে শুরু

করেছিল। স্ক্রিন ডোরের এপাশ থেকে ওর চাপা কান্না শুনতে পেয়েছে রানা, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে যায়নি। কখনও কখনও মানুষকে একা থাকতে দিতে হয়। বারান্দায় ঘণ্টাখানেক বসে ছিল টিফানি, তারপর ঘরে ঢুকে চলে গেছে নিজের কামরায়। শুয়ে পড়েছে।

ল্যাপটপটা একপাশে সরিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাতে শুরু করল রানা। ফ্রিজ থেকে পনিরের একটা চাকা নিয়ে এল, ছুরি দিয়ে কেটে নিল দুটো পাতলা স্লাইস। ধারালো ফলাটার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ও। এখন যদি অ্যালি ওকে লক করে, তা হলে কী ঘটবে? কিছু কি টের পাবে? নাকি যন্ত্রের মত ধারালো ছুরিটা ঢুকিয়ে দেবে নিজের গলায়, বুকে বা পেটে? আনমনে মাথা নাড়ল ও, ছুরিটা সরিয়ে রাখল নাগালের বাইরে। প্লেটে স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে।

চার ঘণ্টা পর টিফানি জেগে উঠলে নিজের কামরায় গেল রানা। পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার ডাক আর বাতাসে দুলতে থাকা ঘাসের মর্মর। তন্দ্রায় ঢলে পড়ল ও, আধো-ঘুমের ভেতর দেখতে পেল অ্যালিকে। মনে হলো, অ্যামারিলোর সেই অন্ধকার বাড়িটায় ফিরে গেছে ওরা, অ্যালি ঘুমাচ্ছে ওর কাঁধে মাথা রেখে। মুখের ওপর এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে চুল। অদ্ভুত এক মায়ায় মন ভরে উঠল রানার। নড়ল না, পাছে স্বপ্নটা ভেঙে যায়। ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত দৃশ্যটা মনের চোখ ভরে দেখল ও।

‘ওটা আর্কটারাস,’ বলল টিফানি।

দু’রাত পর। বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছে ও আর রানা, ঘনঘোর আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্র দেখছে।

‘দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আর্কটারাস একটা দানব

তারা,' বলে চলল টিফানি। 'আমাদের সূর্যকে যদি ওটার পাশে রাখো, মনে হবে বাস্কেটবলের পাশে একটা চেরি ফল রেখেছ।'

'তুমি জ্যোতির্বিজ্ঞানও পড়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল টিফানি। 'তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী একজনকে চিনতাম। সে-মেয়েটাই আমাকে এরকম অনেক ছোটখাট তথ্য বলেছে।'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেল সে। এরপর জানতে চাইল, 'অ্যালি যখন তোমার সঙ্গে ছিল, কেমন লাগত তোমার?'

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা। জীবনটা বদলে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্যে।'

বুকের কাছে দু'পা ভাঁজ করল টিফানি, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল হাঁটুদুটো। থুতনি রাখল হাঁটুর ওপর। উদাস গলায় বলল, 'অপরাধবোধের চেয়ে ভয়ঙ্কর অনুভূতি আর নেই। ঘুণের মত খেয়ে ফেলছে আমার ভেতরটা। এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি দিচ্ছে না। বলে বোঝাতে পারব না, রানা, ফোর্ট ডেট্রিকের ঘটনার জন্যে আমি কতটা দুঃখিত... কতটা কষ্ট পাচ্ছি। অ্যালি যদি সেটা জানত!'

অদ্ভুত এক বেদনা ফুটে উঠেছে তার গলায়। সান্ত্বনার সুরে রানা বলল, 'নিশ্চয়ই জানবে। ও তো মানুষের মন পড়তে পারে।'

'তাতে লাভ হবে কোনও? ও কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?'

এ-প্রশ্নের জবাব নেই রানার কাছে। অ্যালির কথা ভাবল, চোখের সামনে নিজের মমতাময়ী মাকে খুন হতে দেখেছে বেচারি। এ-ধরনের মানসিক আঘাত কাটানো সহজ নয়।

বাতাসের তোড় একটু বাড়ল। কেঁপে উঠে হাঁটুজোড়া আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল টিফানি। রানা তাকাল ওর

দিকে। ক্লান্ত মুখশ্রীর ভেতর কোথায় যেন অদ্ভুত কমনীয়তা লুকিয়ে আছে। বাতাসে কপালের ওপর লুটিয়ে পড়েছে এক গোছা চুল। রাতের আবছায়া পরিবেশে সেটাই যেন আবেদনময়ী করে তুলেছে ওকে। চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

ওকে অপলকে তাকাতে দেখে মুখ ঘোরাল টিফানি। চোখাচোখি হলো দু'জনের। টিফানির চোখে বিস্ময় ফুটল, পরক্ষণে লজ্জায় আনত হলো দৃষ্টি।

এক সেকেণ্ড পরেই পরস্পরকে চুমো খেতে শুরু করল ওরা—পাগলের মত। টিফানিকে শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধেছে রানা, ওর পিঠ খামচে ধরেছে মেয়েটা। নিঃশ্বাসে যেন আগুনের হলকা। সিঁড়ির ওপর বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে পড়েছে দু'জনে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে এল সমতল বারান্দায়।

রানার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টিফানি, হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো, ব্যস্ত হাতে খুলতে শুরু করল জামার বোতাম। আর তখুনি সচেতন হয়ে উঠল রানা। সমস্ত উত্তেজনা মিলিয়ে গেল নিমেষে, পরিষ্কার হয়ে এল মাথা।

'থামো!' কর্কশ গলায় বলে উঠল ও।

থমকে গেল টিফানি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'বারো দিন...' বলল রানা, 'বারোটা দিন একসঙ্গে আছি আমরা। এর ভেতর কিচ্ছু ঘটেনি আমাদের ভেতর।'

'এখন ঘটছে। তাতে সমস্যা কোথায়?'

'কিছু মনে কোরো না, টিফানি। তুমি সুন্দরী... কিন্তু একবারও তোমার প্রতি সেরকম আকর্ষণ অনুভব করিনি আমি।'

বিব্রত দেখাল টিফানিকে। 'ইয়ে... আমি সেকথা বলতে পারছি না।'

'আমাকে কাছে পেতে চেয়েছ তুমি? এভাবে?'

‘ঠিক তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ এসব কথা কেন?’

‘কী বলতে চাইছি সেটা ভেবে দেখো।’

এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে রইল টিফানি। তারপরেই আঁতকে উঠল। ‘ওহ্ গড!’

‘ঠিক ধরেছ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘এইমাত্র যা ঘটল, সেটা তুমি-আমি নিজ থেকে করিনি। আমাদেরকে দিয়ে করানো হয়েছে।’

‘তার মানে...’

‘অ্যালি,’ থমথমে গলায় বলল রানা। ‘ও এসে পড়েছে।’

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দু’জনে। অবিন্যস্ত পোশাক ঠিকঠাক করতে করতে পকেট থেকে সেলফোন বের করল রানা। কল করল লিয়ারির নাম্বারে। রিং হবার ফাঁকে দেখে নিল দক্ষিণের ঘেসো জমিটা—ওদিক থেকে আসার কথা অ্যালির। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। আকাশে চাঁদ নেই। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে আছে প্রান্তর।

দু’বার রিং হলো। জবাব নেই। তৃতীয় রিঙেও রিসিভ করা হলো না কল।

উদ্বেগ ফুটল টিফানির চেহারায়।

চারবার রিং হলো।

পাঁচবার।

‘লিয়ারির কিছু হয়ে যায়নি তো?’ শঙ্কা প্রকাশ করল টিফানি। ‘ওকে হয়তো খুন করে এসেছে অ্যালি। আমাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই!’

চুপ করে রইল রানা। ষষ্ঠবারের মত বাজছে রিং।

সাত...

দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। বারান্দাটা বড্ড অরক্ষিত। কানে ঠেকিয়ে রেখেছে সেলফোন। ওকে অনুসরণ করল টিফানি।

আটবারের মত রিং হলো ওপাশে। সাড়া নেই কারও।

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে দিল রানা। আর চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। চাইলে লিয়ারিই ফোন করতে পারবে ওকে।

লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে আছে ও আর টিফানি। আলো নেভানো। জানালা দিয়ে প্রান্তরের অনেকটাই দৃষ্টিগোচর হয়। পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'প্রথমে তোমাকে লক করেছে ও, তারপর আমাকে,' বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বলল টিফানি। 'তোমাকে ওভাবে তাকাতে দেখে তাই অবাক হয়েছিলাম। এরপর তো আমার ওপরেই ভর করল। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।'

'একসঙ্গে দু'জনকে লক করতে পারে না ও,' রানা বলল। 'তাই পালা করে আমাকে আর তোমাকে লক করেছে। কৌশলটা ভালই বেছেছে, এমন একটা কাজে জড়িয়েছে আমাদেরকে, যেটা একবার শুরু করে দিতে পারলে আর লকিঙের দরকার হয় না। নিজ থেকেই চলতে থাকে। গাড়ির ইঞ্জিনের মত।'

'কিন্তু কেন? খেলতে চাইল আমাদের নিয়ে?'

'উঁহুঁ। আমাদের মনোযোগ ফেরাতে চেয়েছে, যাতে খোলা জায়গাটা নির্বিঘ্নে পেরোতে পারে... বাড়িতে পৌঁছুতে পারে।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল টিফানির। অ্যালি কেন বাড়িতে ঢুকতে চায়, তা বুঝতে পারছে—ওকে নিজ হাতে খুন করার জন্যে!

নিঃশব্দে সায় দিল রানা। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। খুব অল্প সময়ের জন্যে ওদেরকে লক করেছিল অ্যালি, তারপরেই ক্ষান্ত দিয়েছে। কেন? এখন... এ-মুহূর্তে ওদেরকে লক না করার কারণ কী? ইচ্ছে করলেই ওদেরকে অচল করে বসিয়ে রাখতে পারে ও, করছে না কেন? জবাবটা

জানা নেই রানার। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল। তাকাল সেলফোনের নিষ্প্রাণ স্ক্রিনের দিকে। অসহায় বোধ করছে।

'আমরা এখন কী করব, রানা?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল টিফানি।

দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের দু'হাজার একত্রিশ মাইল ওপরে, মহাশূন্যে ভাসতে থাকা মিরাণ্ডা টোয়েণ্টি সিক্স স্যাটেলাইট আচমকা চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্যানসাসের টোপেকার উত্তরে, ঘাসে ভরা চারণভূমির দিকে তাক করল সব ইকুইপমেণ্ট। মাইক্রোস্কোপিক অ্যাডজাস্টমেণ্টে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লেন্স প্ল্যাটফর্ম, ভিউয়িং ফ্রেম লক হলো পূর্ব-নির্ধারিত টার্গেটের ওপর। স্যাটেলাইটের অনবোর্ড কম্পিউটারে কমাণ্ড দেয়া আছে—টার্গেটের আশপাশে কোনও ধরনের মুভমেণ্ট দেখা দিলেই এ-কাজ করতে হবে।

টার্গেটটা একটা চৌকোনা ফার্মহাউস, ঘাসে ঢাকা জমির মাঝখানে অবস্থিত। ঋতু ও এলাকাকে ধর্তব্যে রেখে দ্রুত একটা হিসেব কষল কম্পিউটার—ঘাসগুলো *বুটেলুয়া গ্রাসিলিস* প্রজাতির হবার সম্ভাবনা-শতকরা ৯৭.৪৪১ ভাগ। সেই ঘাস মাড়িয়ে দুটো ছায়ামূর্তি পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে বাড়িটাকে লক্ষ্য করে। মিরাণ্ডার অ্যানালিসিস বলছে, ওদের একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং অন্যজন অপ্রাপ্তবয়স্ক। দু'জনেই স্ত্রীলিঙ্গের মানুষ।

মিরাণ্ডা টোয়েণ্টি সিক্সের কমিউনিকেশন মডিউল চালু হয়ে উঠল। বারো দিন, চার ঘণ্টা, সাতাশ মিনিট ও একচল্লিশ সেকেণ্ড আগে পাওয়া কমাণ্ড অনুসারে ইমেজ ডেটা পাঠাতে শুরু করল নিচের সিকিউর ডাউনলিঙ্কে।

পঁয়ত্রিশ

তিন মিনিট হলো লিয়ারিকে ফোন করেছে রানা, জবাব পায়নি। নিজের ফোন থেকে টিফানিও চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি। সমস্যাটা ফোনের ভেবে রানার নাম্বারে কল করেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছে ওটা।

এখন এক জানালা থেকে আরেক জানালায় ছুটছে দু'জনে, নজর বোলাচ্ছে চারদিকের প্রান্তরে। ফার্মহাউসের দিকে কেউ এগিয়ে আসছে কি না, দেখতে চাইছে।

'কোনও মানে হয় না,' কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বলল টিফানি। 'ওদেরকে আমরা যদি দেখতেও পাই, লাভ কী?'

লিভিং রুমের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কী করতে চাও?'

'দু-দুটো গাড়ি আছে গ্যারাজে,' টিফানি বলল। 'পালানোর চেষ্টা করলে কেমন হয়? হেডলাইট নিভিয়ে যদি মাঠের ওপর দিয়ে ফুল স্পিডে ছুটি, দু'মিনিটের মধ্যেই অ্যালির লকিং রেঞ্জের বাইরে চলে যেতে পারব।'

'তার আগেই ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে আমাদেরকে আবার লক করে ফেলবে ও।'

'এখানে বসে থাকলে সেটা এমনিতেও করবে,' কেঁপে উঠল টিফানি।

'শান্ত হও,' ওকে বলল রানা। 'লিয়ারির কী হয়েছে, তা জানি না আমরা। সে যদি মারাও গিয়ে থাকে, তার মানে এই

নয় যে, প্ল্যানটার বারোটা বেজেছে। আমরা পালাবার চেষ্টা করলেই বরং ওটায় ব্যাঘাত ঘটবে। একটু ধৈর্য ধরো, এমন সুযোগ বার বার আসবে না।'

পাল্টা কিছু বলতে চাইছিল টিফানি, থমকে গেল জানালায় চোখ পড়ায়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও বাইরে তাকাল। দুটো ছায়ামূর্তি! মাঠের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা কদম ফেলে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, তবে তার প্রয়োজনও নেই। দু'জনের আকার-আকৃতি আর উচ্চতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে পরিচয়।

এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল টিফানি। ওর হাতের তালু ঘামছে। মুঠোয় মৃদু চাপ দিয়ে ওকে সাহস জোগাতে চাইল রানা।

থামার কোনও লক্ষণ নেই দুই ছায়ামূর্তির মাঝে, মাঠের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। ওদের হাঁটার ভঙ্গিতে কী যেন একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল রানা। সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেল না ও, তার আগেই শুরু হয়ে গেল নরক গুলজার।

প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল একটা আলোয়। তার পিছু পিছু ভেসে এল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। সেটা এতই তীব্র যে, চুর চুর করে ভেঙে পড়ল দক্ষিণদিকের সমস্ত জানালার কাঁচ।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল টিফানি। ওকে জড়িয়ে ধরল রানা—নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে পিঠ ঘোরাল জানালার দিকে, যাতে ছুটে আসা কাঁচের টুকরোয় আহত না হয় মেয়েটা। আলোর তীব্রতা কমে এলে আড়চোখে তাকাল বাইরে।

আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। আবারও আলোকিত হলো প্রান্তর। দুই ছায়ামূর্তি ইতিমধ্যে উল্টো ঘুরে গেছে, প্রাণপণে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। তৃতীয় বিস্ফোরণ হলো, এরপর

চতুর্থটা। নিয়মিত ছন্দে বিস্ফোরণ ঘটছে তাদের চারপাশে, যেন শুরু হয়েছে কোনও আতশবাজির খেলা।

'হচ্ছেটা কী?' চেঁচিয়ে উঠল টিফানি।

'প্ল্যানের বাস্তবায়ন,' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা।

শব্দ আর আলোর ফুলঝুরির মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলেছে অ্যালি ও ভেরোনিকা—দক্ষিণে, যেদিক থেকে ওরা এসেছে। কিন্তু ষাট ফুট যেতেই পরাস্ত হলো দু'জনে। পুরু সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে প্রান্তর। দুই পলাতকের চারপাশে... যেখানে যেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে... সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে এই ধোঁয়া। ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একদম মাঝখানে পড়ে গেছে অ্যালি আর ভেরোনিকা। আলোর শেষ ঝলকানিতে ওদেরকে টলে উঠতে দেখল রানা, দু'জনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

নেমে এল অন্ধকার। নীরবতা।

কান ঝন ঝন করছে রানার। সেলফোনের রিংটোন প্রথমে শুনতে পেল না, ভাইব্রেশনে টের পেল, ওটা বাজছে। ফোন বের করে দেখল, ডিসপ্লেতে ভেসে উঠেছে লিয়ারির নাম্বার।

'কোথায় ছিলেন আপনি?' কল রিসিভ করে ধমকে উঠল ও।

'সরি,' সকৌতুকে বলল লিয়ারি। প্রসন্ন কণ্ঠ। 'ইচ্ছে করেই জবাব দিইনি। ভেবেছিলাম, আপনারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে অ্যালির সাহস আরও বেড়ে যাবে।'

ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। হেলিকপ্টারের টার্বাইন চালু হচ্ছে।

'লিভিং রুমের কাউচের মাঝখানের কুশনটা তুলে ফেলুন,' লিয়ারি বলল। 'তলার খোপে দুটো গ্যাস মাস্ক পাবেন।'

মাস্কদুটো বের করল রানা, একটা তুলে দিল টিফানির

হাতে।

'আমি দশ মাইল দূরে আছি,' জানাল লিয়ারি। 'তিন থেকে চার মিনিটের ভেতর ফার্মহাউসে পৌঁছুব। তার আগে অ্যালি বা ভেরোনিকার জ্ঞান ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই, তারপরেও সতর্ক থাকা ভাল। ডা. ক্যানট্রেলকে বলুন, গ্যারাজ থেকে যে-কোনও একটা গাড়ি নিয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়তে। যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। সব ঠিকঠাক থাকলে আমরা পরে যোগাযোগ করব তাঁর সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, বলছি। আর আমি?'

'ওখানেই থাকুন। শীঘ্রি দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে।'

ভাঙা জানালা দিয়ে ইতিমধ্যে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ঘরে। গ্যাস মাস্ক পরে ফেলেছে টিফানি, রানাও পকেটে ফোন রেখে নিজেরটা পরল।

'কী ব্যবহার করেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল টিফানি। মাস্কের আড়াল থেকে যান্ত্রিক শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ।

'গ্যাস মর্টার শেল,' রানা বলল। 'লঞ্চারগুলো দূর থেকে অপারেট করা যায়। রেঞ্জ, দশ মাইল।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জনে। আবছা আলোয় মেঘের মত লাগল মাঠের ওপর স্থির হয়ে থাকা গ্যাসটাকে। টিফানিকে লিয়ারির নির্দেশ শোনাল রানা। দ্বিধা দেখা দিল টিফানির মাঝে।

'আমি থাকছি এখানে,' ওকে বলল রানা। 'অ্যালির দিকে খেয়াল রাখব। প্রমিজ।'

'আমি ভাবছি গ্যাসের কথা,' বলল টিফানি। 'ওতে অ্যালির কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

'আশা করি হবে না। ওকে খুন করতে চায় না লিয়ারি। তুমি এখন যাও। ফিরে আসা নিরাপদ মনে হলে আমি ফোন করব তোমাকে।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড দোনোমনো করল টিফানি। এরপর দ্বিধা ঝেড়ে পা বাড়াল গ্যারাজের দিকে। খানিক পর শোনা গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। গ্যারাজের দরজা খুলে গেল, সেডান নিয়ে বেরিয়ে এল ও। রানার দিকে হাত নাড়ল একটু, চলে গেল ড্রাইভওয়ে ধরে। গাড়ির টেইললাইট অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওদিকে চেয়ে রইল রানা।

হেলিকপ্টারের সিটে বসে স্ট্র্যাপ আটকাতে আটকাতে নতুন একটা নাম্বারে কল করল লিয়ারি। হেডসেটের সঙ্গে কানেক্ট করে নিল ফোনটা। দ্বিতীয়বার রিংশেষে শোনা গেল একটা ভারী কণ্ঠস্বর।

'চার্লটন বলছি।'

'সবকিছু ঠিক,' তাকে বলল লিয়ারি। 'অ্যালিকে নিউট্রালাইয় করা হয়েছে। রানা আছে ওর সঙ্গে। ডা. ক্যানট্রেলকে আমি ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছি, তবে সময় হলে ওঁকে আবার ডেকে নেয়া যাবে।'

'ওরা কিছু আঁচ করেনি তো?' জিজ্ঞেস করল চার্লটন।

'না, দু'জনেই অন্ধকারে।'

কল্পনায় চার্লটনকে দেখল লিয়ারি—কানাডিয়ান রকির দুর্গম কম্পাউণ্ডে আরাম করে বসে আছে। আর এদিকে সে কিনা... মুখের ভেতরটা তেতো লাগল তার। কিন্তু কিছু করার নেই, পরিস্থিতি তাকে ওই লোকের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করেছে। যেখানে বীজ বপন করা হয়েছে, সেখানেই ফুল ফোটাতে হবে।

'বুঝতে পেরেছি,' চার্লটন বলল। 'আমাদের কণ্ট্রোল অ্যাসেট পাঁচ মিনিটের ভেতর আকাশে উড়বে। ত্রিশ মিনিটের মত লাগবে টার্গেট এরিয়ায় পৌঁছুতে। এরপর শুরু হবে আসল কাজ।'

কণ্ট্রোল অ্যাসেটের নমুনা লিয়ারি দেখেছে—কালো রঙের

পিপের মত একটা যন্ত্র... সেলফোন টাওয়ারের গায়ে আটকানো অবস্থায়। তবে আজ যেটা পাঠানো হচ্ছে, সেটা থাকবে একটা সি-ফাইভ গ্যালাক্সি এয়ারক্র্যাফটের কার্গো হোল্ডে। ওখান থেকেই অপারেট করা হবে ওটা।

'আবার বলছি,' হেডসেটে শোনা গেল চার্লটনের কণ্ঠ, 'বড় সমস্যাটা মিটিয়ে দেব আমরা, কিন্তু তাতে তোমার বিপদ কাটছে না। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, আলবার্ট ফুলার, আর ববি মুরল্যাণ্ড... এরা রয়ে যাচ্ছে পেছনে। কীভাবে ঠেকাবে ওদেরকে?'

'রিল্যাক্স,' ক্রূর হাসি ফুটল লিয়ারির ঠোঁটে। 'আজ রাতে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করতে চলেছি আমরা। প্রমাণ ছাড়া কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা। আর যদি বাড়াবাড়ি করেই, ওদের মুখ বন্ধ করার মত প্রচুর কৌশল জানা আছে আমার।'

'তা আর বলতে!' চার্লটনও হাসল ওপাশ থেকে।

কয়েক মিনিট পর, এক হাজার মাইল দূরে, টেলিফোনের শব্দে কাঁচা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রিসিভার কানে ঠেকাতেই শুনতে পেলেন হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির প্রধান আলবার্ট ফুলারের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

'একটা দুঃসংবাদ আছে, অ্যাডমিরাল।'

'কী হয়েছে?'

'খানিক আগে রানাদের ফার্মহাউসে আক্রমণ করতে গিয়েছিল অ্যালিসন মিচেল...'

'লিয়ারির প্ল্যান ফেল করেছে?'

'না, স্যর। প্ল্যান ঠিকমতই এগিয়েছে। সমস্যা অন্যখানে।'

'কী সমস্যা?'

'আপনার কথামত লিয়ারির ফোনে আড়ি পেতে

রেখেছিলাম আমি। খানিক আগে একটা কল ইন্টারসেপ্ট করেছি। যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করতে চলেছে সে। রানা, অ্যালি, ভেরোনিকা, বা টিফানি ক্যানট্রেল... কাউকেই বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছে তার নেই।'

'কী!' ধড়মড় করে উঠে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'থামাও ওকে!'

'আমাদের হাতে সময় নেই, স্যর। ওরা যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওখানে। তারপরেও একটা টিম রেডি করছি আমি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন...'

'রানাকে সাবধান করে দিতে হবে। তা হলে হয়তো কিছুটা সময় পাব আমরা। ওকে যে-সেলফোনটা দেয়া হয়েছে, সেটার নাম্বার কি আছে তোমার কাছে?'

'আছে, স্যর। কিন্তু ওটায় নির্ঘাত আড়ি পেতে রেখেছে লিয়ারি। আমরা রানাকে সতর্ক করতে গেলেই টের পেয়ে যাবে।'

ঠোঁট কামড়ালেন অ্যাডমিরাল। কী করা যায়? আচমকা বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

'মুরল্যাণ্ড কোথায়?' বললেন তিনি। 'খবর দাও ওকে।'

মাঠের ওপর যেন জমাট বেঁধে আছে সাদা ধোঁয়া। তবে মৃদু বায়ুপ্রবাহে ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে, ভেসে যাচ্ছে পশ্চিমে। হেলিকপ্টার চলে এলে রোটরের ধাক্কায় পুরোপুরি কেটে যাবে। দেরি নেই তার। কপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা, জোরালো হচ্ছে ক্রমশ। খুব শীঘ্রি দেখা যাবে।

বাড়ি থেকে একশো গজ চলে এসেছে রানা। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে দেখতে পেল অ্যালি আর ভেরোনিকাকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। দৌড়াতে শুরু করল ও। গোলমালের আভাস পাচ্ছে। কপালের দু'পাশে শীতল

অনুভূতিটা হচ্ছে না ওর, অথচ অ্যালির কাছাকাছি গেলেই সেটা হবার কথা—মেয়েটা জেগে বা ঘুমিয়ে থাকুক। এর মানে কী? খারাপ কিছু হয়ে যায়নি তো ওর?

হেলিকপ্টারের আওয়াজ বেড়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ওটাকে দেখতে পেল রানা—বড়জোর দু'মাইল দূরে। চলে আসবে এক্ষুণি। অ্যালির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। চুল সরিয়ে ঘাড়ের ক্যারোটিড আর্টারি স্পর্শ করল, চেক করল পালস।

বেঁচে আছে মেয়েটা। নাড়িস্পন্দন স্বাভাবিক। তা হলে কপালে কিছু অনুভব করছে না কেন?

আচমকা কেঁপে উঠল রানা। খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের পেছনের খাটো চুলগুলো। মনে পড়ে গেল জানালা দিয়ে দেখা ছায়ামূর্তিদুটো। কী নিয়ে খটকা লেগেছিল, তা বুঝতে পারছে এবার। একসঙ্গে পা ফেলছিল না ওরা। একজন এগোলে অন্যজন থেমে যাচ্ছিল। যেন পালা করে দুটো পুতুলকে হাঁটাচ্ছিল কেউ।

তাড়াতাড়ি অজ্ঞান দেহটাকে চিৎ করল রানা। মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল চুল। যা ভেবেছে তা-ই। অ্যালি নয়, অচেনা একটা চেহারা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। এক টানে মুখ থেকে খুলে ফেলল মাস্ক, ছুটতে শুরু করেছে একই সঙ্গে। পৌঁছুতে চাইছে পরিষ্কার বাতাসে। হাতে ফোন বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, দৌড়াতে দৌড়াতেই ডায়াল করল লিয়ারির নাম্বারে। হেলিকপ্টার ততক্ষণে ফার্মহাউসের প্রায় ওপরে চলে এসেছে।

একবার রিং হলো। তারপরেই খুট করে কানেক্ট হলো কলটা।

'হেলিকপ্টার ঘোরান!' চেঁচাল রানা। 'জলদি! আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে ও... পাল্টা ফাঁদ পেতেছে।

পালান এখান থেকে!'

কথাটা বলতে না বলতে বদলে গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ। খসে পড়তে শুরু করল আকাশ থেকে। ফোনের ইয়ারপিসে শোনা গেল চেঁচামেচি। কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাইলট আর কো-পাইলট। ঘুরপাক খেতে খেতে ফার্মহাউসের ওপর দিয়ে উড়ে গেল কপ্টার—কেউ এখন আর ওটাকে ওড়াচ্ছে না। মাঠের দূর প্রান্তে গিয়ে ভারী পাথরের মত আছড়ে পড়ল মাটিতে। ইস্পাত থেঁতলে যাওয়ার বিশ্রী শব্দ শোনা গেল, তারপরেই বিস্ফোরিত হলো পুরো কাঠামো। আগুনের একটা গোলা যেন লাফিয়ে উঠল ওখানে। দূর থেকেও শকওয়েভ আর তাপের হলকা অনুভব করল রানা।

অপলকে তাকিয়ে রইল ও। ফোন এখনও ধরে রেখেছে কানে, কিন্তু লাইন কেটে গেছে। ধরাধাম ত্যাগ করেছে অ্যালেক্স লিয়ারি। রানা বুঝতে পারছে, কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে অ্যালি, পাইলট আর কো-পাইলটকে লক করে ক্র্যাশ করিয়েছে হেলিকপ্টার। কিন্তু কোথায়? ভাবনাটা বেশিক্ষণ রইল না মাথায়। ধ্বংসস্তূপের লকলকে শিখা যেন মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে ওকে।

পাঁচ সেকেণ্ড পেরুল।

রানা জানে না কী করবে। এমন পরিস্থিতিতে করবার আছেই বা কী? আরও কয়েক সেকেণ্ড কাটার পর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল ও। ফোনটা পকেটে রাখল, হাত থেকে ফেলে দিল গ্যাস মাস্ক। ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল মাঠ ছাড়িয়ে সামনে। যেখানে রানা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গ্যাস নেই বললেই চলে, কিন্তু পঞ্চাশ গজ দূরে ভাসছে ঘন কুয়াশার মত। ওখানে ঢুকলেই ঘুমিয়ে পড়বে ও।

চিন্তাটা কেন এল, জানে না রানা, শুধু মনে হলো ওটাই করা উচিত। ওটাই করতে চায় ও।

হাঁটতে শুরু করল রানা। প্রতি পদক্ষেপ ওকে নিয়ে চলেছে গ্যাসের মেঘের গভীর থেকে গভীরে। শ্বাসের সঙ্গে বুভুক্ষের মত টেনে নিচ্ছে বিষাক্ত, ঘুমপাড়ানি বায়ু।

ছত্রিশ

বরফশীতল পানির স্পর্শে চেতনা ফিরে এল রানার। ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যেতে চাইল দেহ, বুকের ভেতর যেন দামামা বাজছে। ঠকঠক আওয়াজ তুলে মেঝেতে আছড়ে পড়ল একটা বালতি। চোখ খুলল ও। ফার্মহাউসের ডাইনিং রুম, হাতে হাতকড়া, বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা চেয়ারে। ডাইনিং টেবিলটা একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, রানা এখন কামরার ঠিক মাঝখানে।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালি, তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত দ্বিধায় কাটল। কীভাবে এখানে এল, বুঝতে পারছে না রানা। আবছাভাবে হেলিকপ্টার ক্র্যাশের কথা মনে পড়ছে, এরপর ও হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছিল সাদা ধোঁয়ার মেঘটার ভেতর... কেন? কেন করতে গেল ও-কাজ? চোখ বুজে ভাবতে চাইল ও। হঠাৎ খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া। কারণটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছে পুরোপুরি। চোখ মেলে অ্যালির দিকে তাকাল। কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে মেয়েটা।

এক দেখাতেই বুঝল রানা, এই অ্যালি সেই অ্যালি নয়।

বিশাল এক পরিবর্তন ঘটে গেছে মেয়েটির মাঝে। বদলে গেছে চাহনি, হাবভাব। অসহায়, ভয়ার্ত বা স্নেহের কাঙাল কোনও কিশোরী দাঁড়িয়ে নেই ওর সামনে। জানতে ইচ্ছে হলো, পুরনো অ্যালি... যে-অ্যালিকে ও চেনে... তার কিছু কি অবশিষ্ট আছে এই মেয়েটির মাঝে?

রানার চিন্তা পড়তে পেরে একটু যেন কৌতুকের ছায়া পড়ল অ্যালির চোখে। পরক্ষণে সেখানে ভর করল শীতলতা।

'টিফানিকে যেতে দিতে হয়েছে,' বলল সে। গলার স্বর নরম, কিন্তু আবেগহীন। 'ওকে থামালে তুমি সব বুঝে ফেলতে। সতর্ক করে দিতে হেলিকপ্টারটাকে।'

একপাশে সরিয়ে রাখা টেবিলটার দিকে গেল অ্যালি, তুলে নিল একটা সেলফোন। রানারটাই। কাছে এসে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

'টিফানির নাম্বার জানো তুমি। ওকে কল করো। বলো, ফার্মহাউসে ফিরে আসা নিরাপদ।'

'সরি, অ্যালি,' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি ও-কাজ করব না। চাইলে জোর খাটাতে পারো, কিন্তু নিজ থেকে আমি ফোন করছি না কিছুতেই।'

থমথমে চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল অ্যালি। মনে হলো, লক করতে চলেছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলেও কিছু ঘটল না। হঠাৎ করে টিফানিকে ফোন করার কোনও ইচ্ছে জাগ্রত হলো না রানার মাঝে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যালি। বলল, 'জোর করে কথা বলালে সেটা যথেষ্ট কনভিন্সিং না-ও হতে পারে। আমি চাই, তুমি স্বেচ্ছায় ফোনটা করবে।'

'অসম্ভব। তুমি খামোকা সময় নষ্ট করছ। আমি ফোন করব না।'

'আমার ধারণা, তুমি করবে,' বলল অ্যালি। কণ্ঠে মিশে আছে বিষাদের সুর। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ফোনটা।

এক পলকের জন্যে ওটার পাশে একটা সার্জিক্যাল স্কালপেল দেখতে পেল রানা।

'যদি ভেবে থাকো, টর্চার চালিয়ে আমাকে রাজি করাতে পারবে,' বলল ও, 'তা হলে মস্ত ভুল করছ।'

'না, করছি না,' বলল অ্যালি। 'আমি জানি, নির্যাতন সহ্য করার সব ধরনের কৌশল জানা আছে তোমার। নির্যাতনের মুখে যাতে ভেঙে না পড়ো, সেজন্যে আলাদা ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে তোমাকে।' হাসল মৃদু। 'তবে ওতে এক জায়গায় খুঁত রয়ে গেছে। নির্যাতনের বিশেষ একটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে তুমি দুর্বল।'

'যা খুশি করতে পারো, আমি ফোন করছি না।'

'ভুলটা ওখানেই করছ তুমি, রানা। আমি কিছু করব না। করবে তুমি... আমার সঙ্গে।'

ভ্রূকুটি করল রানা, কথাটার অর্থ বুঝতে চাইছে।

এগিয়ে এসে ওর কোলের ওপর দু'পা ছড়িয়ে বসে পড়ল অ্যালি। দু'হাত দিয়ে ধরল ঘাড়ের পেছনটা। মুখটা চলে এল রানার মুখের ছ'ইঞ্চি দূরে।

'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা,' বলল সে। 'যা কিছু করেছ আমার জন্যে... এরপর তোমাকে কষ্ট দিতে ভাল লাগবে না আমার। তাই বলছি, এখনও সময় আছে, টিফানিকে ফোন করো। ব্যাপারটা নোংরা হবার আগেই।'

চুপ করে রইল রানা।

'বেশ,' বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি। ওর দু'হাত নেমে গেল চেয়ারের পেছনে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ক্লিক করে আওয়াজ হলো—হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলে গেছে। রানার দু'হাত মুক্ত হয়ে গেল।

কোল থেকে উঠে দাঁড়াল অ্যালি। পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল টেবিলের কাছে। পেছনে হাত দিয়ে তুলে আনল স্কালপেল। ধারালো ফলাটা দেখল বাতির আলোয়।

দ্রুত হিসেব কষে নিল রানা—ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ঝাঁপ দিলে ওটুকু পেরুতে এক সেকেণ্ডও লাগবে না, চোয়াল বরাবর এক ঘুসিতে অজ্ঞান করে ফেলা যাবে অ্যালিকে। ভেরোনিকা কোথায় কে জানে, কিন্তু তাকে নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে...

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই নিজের ভেতর পরিবর্তন অনুভব করল ও। কিছু করার ইচ্ছে যেন উড়ে গেল দমকা বাতাসে।

'অযথা ভাবছ,' বলল অ্যালি। 'তোমার যে-কোনও প্ল্যান আমি দানা বাঁধার আগেই ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারি।'

আবারও সেই বিষাদের সুর ফুটে উঠেছে ওর গলায়। কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা বিরাজ করল।

'কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর স্কালপেলটা কেড়ে নিয়ে তুমি আমাকে আক্রমণ করবে,' এবার বলল অ্যালি। 'না করে উপায় থাকবে না তোমার।'

অপলক চোখে তাকিয়ে রইল রানা। মুখ ফুটে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যা বলতে চায় তা মেয়েটা এমনিতেই শুনতে পাচ্ছে।

'একটামাত্র ফোন করে এসব এড়াতে পারো তুমি,' ওকে বলল অ্যালি।

'আমার মন পড়তে পারছ তুমি,' বলল রানা। 'তারপরেও বুঝতে পারছ না, আমি কিছুতেই কাজটা করব না?'

'এ-মুহূর্তে কী ভাবছ, তা জানি। কিন্তু ত্রিশ সেকেণ্ড পর কী ভাববে, তা জানি না। তুমিও জানো না।'

'জানি। টিফানিকে আমি ডাকব না।'

'দেখা যাক।'

পরমুহূর্তে ঘটল ব্যাপারটা। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মত অনুভূতিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। ভয়াবহ এক ক্রোধে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল রানা। দুনিয়া অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে, অ্যালিকে ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পেল না ও। জেগে উঠল তীব্র ঘৃণা, জিঘাংসা! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর, হাত থেকে কেড়ে নিল স্কালপেলটা।

চিৎকার করে উঠল অ্যালি। আতঙ্কে চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে ওকে টেবিলের ওপর আধশোয়া করে ফেলল রানা। স্কালপেল চালাল ওকে লক্ষ্য করে। শেষ মুহূর্তে দু'হাত তুলে বাধা দিল মেয়েটা। গায়ে লাগল না আঘাত, তার বদলে বাম বাহুতে পড়ল ধারালো ফলার আঁচড়। কেটে গেল ওর শার্টের হাতা আর চামড়া, গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো। তাজা রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল অ্যালি।

রক্ত দেখে আরও যেন উন্মাদ হয়ে উঠল রানা। থাবড়া দিয়ে সরিয়ে দিল অ্যালির দু'হাত, বাম হাতে মুঠো করে ধরল ওর চুল। হ্যাঁচকা টান দিতেই পেছন দিকে হেলে গেল মেয়েটার মাথা, উন্মুক্ত হয়ে গেল গলা। সেদিকে স্কালপেল নিয়ে গেল রানা—জবাই করতে চলেছে অ্যালিকে! একদম শেষ মুহূর্তে... ফলাটা যখন গলার চামড়া স্পর্শ করেছে... সব বদলে গেল আবার।

বানভাসী খড়কুটোর মত সব ক্রোধ ভেসে গেল রানার ভেতর থেকে। যেন একটা সুইচ টিপে বন্ধ করা হয়েছে কোনও যন্ত্র। চমকে উঠল ও, হাত থেকে স্কালপেল ফেলে দিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে গেল পেছনদিকে। থামল না, পেছাতে পেছাতে কামরার দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল, পারলে দেয়ালের ভেতরেই সেঁধিয়ে যেতে চায়। চোখজোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, বিশ্বাস করতে পারছে না নিজেকে। দেয়ালে পিঠ ঘষটে বসে পড়ল মেঝেতে।

ক্ষণিকের জন্যে যেন পশু হয়ে গিয়েছিল রানা।

অনুভূতিটা এখনও থিকথিকে পদার্থের মত লেপ্টে রয়েছে শরীরে, দূর করতে পারছে না। কী করতে চলেছিল, তা ভাবলেই কেঁপে উঠছে। বাচ্চা একটা মেয়ে... নিরস্ত্র... কসাইয়ের মত তার গলায় ছুরি চালাতে যাচ্ছিল ও! একবিন্দু প্রতিরোধ অনুভব করেনি বিবেকের!

দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ। শোনা গেল ভেরোনিকার গলা।

'অ্যালি...'

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো অ্যালি। গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি ঠিক আছি। তুমি পাহারায় থাকো।'

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল অ্যালি। বাহুর ক্ষতটা পরীক্ষা করল—বেশ গভীর, রক্ত পড়ছে। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে পেঁচিয়ে বাঁধল জায়গাটা। তারপর চেয়ার টেনে বসল রানার মুখোমুখি।

'টিফানিকে ফোন করো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

'আ... আমি পারব না।'

'নিশ্চয়ই পারবে!'

'না!' মাথা নিচু করে রেখেছে রানা। অ্যালির দিকে তাকাতে পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অ্যালি। এরপর যখন কথা বলল, বেশ নরম শোনাল ওর কণ্ঠ।

'কলোর‍্যাডোর লুসেরো বলে কোনও জায়গা চেনো?'

মাথা নাড়ল রানা।

'আমার মা বলত ওই জায়গাটার কথা... সবসময়। ছোটবেলায় নানা-নানুর সঙ্গে ওখানে ক্যাম্পিঙে গিয়েছিল মা। পাহাড়ি এলাকা, ঘোড়ায় চড়া যায়, ক্লাইমিং করা যায়... একটা লেক আছে, সেখানে ক্যানু ভাড়া করে ভেসে বেড়ানো যায়। মায়ের কাছে স্বর্গের মত লেগেছিল জায়গাটা। বিশেষ

করে রাতের বেলা লেকটা নাকি অদ্ভুত দেখাত। পানির ওপর কুয়াশা ভাসত, তখন ক্যানু নিয়ে বেরুলে মনে হতো মেঘের রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। টিফানিকে মেসেজটা পাঠাবার আগে মা আমাকে শেষ কী কথা বলেছিল, জানো? বলেছিল, ফোর্ট ডেট্রিক থেকে ছাড়া পেলে সবার প্রথমে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। রাতের বেলায় ক্যানুতে চড়ে লেকে বেড়াব আমরা।'

গলা ধরে এল অ্যালির।

'খুব বেশি কিছু তো চায়নি আমার মা,' বলল সে। 'বন্ধনহীন স্বাভাবিক একটা জীবন... যাতে ইচ্ছে হলেই আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারে। সেটা কি তার অন্যায় ছিল?'

গলা খাঁকারি দিল রানা। 'টিফানি জানত না তোমার মায়ের ভাগ্যে অমন কিছু ঘটবে। ও তো...'

'কিছু জানার প্রয়োজনও ছিল না ওর। ছোট্ট একটা অনুরোধ করেছিলাম আমি—বাইরের কারও সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যে। সেটা কি খুব কঠিন?'

'ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও ভয় পেত।'

'অন্য কেউ আমার সঙ্গে বেঈমানী করেনি, রানা। টিফানি করেছে।'

'তার জন্যে ওর অনুতাপের শেষ নেই। ও ভাবতে পারেনি, ব্যাপারটার পরিণাম এত ভয়াবহ হবে...'

'আমি শেষ পর্যন্ত ওখানে গেছি, রানা... লুসেরোতে। বছরখানেক আগে। এখনও ক্যানু ভাড়া দেয় ওরা। রাতের বেলাতেও।'

'টিফানি তোমার মাকে খুন করেনি, অ্যালি,' মরিয়া কণ্ঠে বলল রানা। 'যারা করেছে, তারা সবাই মারা গেছে। তুমি তাদেরকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছ। এমনকী লিয়ারিও মারা গেছে হেলিকপ্টার ক্র্যাশে। ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে!'

'না, যায়নি!' চোখজোড়া জ্বলে উঠল অ্যালির। চোয়াল শক্ত হলো। 'ডাকো ওকে।'

'তুমি জানো, আমি সেটা করব না।'

'মত পাল্টাতে পারো তুমি। আরও অনেক কিছুই আছে, যা আমি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারি। আমার সঙ্গে ওসব করার চেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে হবে তোমার। কেমন হবে, যদি সেসময় আমার জায়গায় তোমার প্রিয় লুবনা আভান্তিকে দেখতে পাও? সহ্য করতে পারবে?'

কেঁপে উঠল রানা। শিউরে উঠেছে শরীর।

'ফোন করো,' থমথমে গলায় বলল অ্যালি।

'না, প্লিজ়! আমাকে বাধ্য কোরো না।'

'দুটো পথ তোমার সামনে, রানা। হয় আমার কথা শুনবে, নয়তো...'

'তারচেয়ে মেরে ফেলো আমাকে। আত্মহত্যা করাও। আমি তাতেও রাজি।'

'না, রানা। আর যা-ই করি, আমি তোমাকে খুন করতে পারব না।'

কথাটায় পুরনো অ্যালির সুর খুঁজে পেল রানা। স্মৃতিভ্রষ্ট অ্যালি... সহজ-সরল অ্যালি... যে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছিল ওকে, ভালবেসেছিল। মনের কোণে আশার আলো উঁকি দিল ওর। সেই অ্যালি যদি এখনও বেঁচে থাকে এই অ্যালির মাঝে, তা হলে হয়তো সব শেষ হয়ে যায়নি। টিফানিকে হয়তো বা ক্ষমা করতে পারবে সে।

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না,' বলল অ্যালি।

'আমি আশাবাদী মানুষ,' মলিন হাসি হেসে বলল রানা।

'তা হলে ডাকো টিফানিকে।'

'না, অ্যালি। আমি ডাকব না। যা খুশি করতে পারো তুমি... করাতে পারো আমাকে দিয়ে। কিন্তু জেনে রেখো, যদি জঘন্য কিছু করাও, আত্মহত্যা করব আমি। এখন না

পারলে পরে। আজ নাহলে আগামীকাল। আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী হবে। তুমিই হবে আমার খুনি।'

রীতিমত জুয়া খেলছে রানা। দর কষাকষি করতে চাইছে নির্দয়, নিষ্ঠুর অ্যালির ভেতরে লুকিয়ে থাকা নরম মনের অ্যালির সঙ্গে।

ওর চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মেয়েটা। তারপর শ্বাস ফেলল শব্দ করে। বলল, 'তা হলে আর একটা পথই খোলা রইল আমার সামনে।'

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর পরিবর্তন টের পেল রানা। যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল ও। টেবিলের কাছে গিয়ে তুলে নিল ফোন, ডায়াল করল টিফানির নাম্বারে।

'হেডলাইট!' বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে জানাল ভেরোনিকা।

চোখ পিটপিট করল রানা, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। হাতঘড়ি দেখল—কীভাবে জানি বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। কী করেছে এতক্ষণ, বলতে পারবে না। ওকে লক করে রেখেছিল অ্যালি।

'শেভি ম্যালিবু,' আবার শোনা গেল ভেরোনিকার গলা। 'ড্রাইভওয়ে ধরে আসছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যালি। দরজার দিকে এগোল।

'এ-কাজ কোরো না, অ্যালি,' পেছন থেকে বলল রানা। 'তুমি এমন নও।'

থামল অ্যালি। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

'রাগ, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা—এসব ওই ভেরোনিকা আর এলিনা ঢুকিয়েছে তোমার ভেতরে... তাও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে,' বলল রানা। 'তোমার মা বেঁচে থাকলে তোমাকে এমন হতে দিত না।'

‘দুর্ভাগ্যক্রমে, রানা,’ করুণ গলায় বলল অ্যালি, ‘আমার মা বেঁচে নেই।’

জানালা আলোকিত হয়ে উঠল হেডলাইটের আলোয়। দরজা ঠেলে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল ও। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে রানাও উঠে দাঁড়াল মেঝে থেকে, ওকে অনুসরণ করল।

বাড়ির সদর দরজা খুলে ধরে রেখেছে ভেরোনিকা। হাতে শটগান। অ্যালি দোরগোড়ায় পৌঁছুতেই সে তির্যক দৃষ্টি হানল কয়েক গজ পেছনে থাকা রানার দিকে। শটগান ঘোরাল ওদিকে।

‘ওর প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে, কী বলো?’

‘ওকে গুলি কোরো না!’ বলল অ্যালি।

বিস্ময় ফুটল ভেরোনিকার চেহারায়। ‘কেন?’

‘আমি বলছি, তাই।’

হুকুমের সুরে কথাটা বলল অ্যালি। নীরবে সেটা মেনে নিল ভেরোনিকা। লিয়ারির অনুমান তা হলে মিথ্যে ছিল না, ভাবল রানা। এখন আর ভেরোনিকার কথায় চলছে না মেয়েটা, বরং তার ইচ্ছে অনুসারে চলতে হচ্ছে ভেরোনিকাকে। শটগান নামিয়ে নিল সে। অ্যালিকে বেরিয়ে যেতে দিল, এরপর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি দূরে থাকো।’

ওদের পিছু পিছু বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। দাঁড়াল কয়েক হাত তফাতে। প্রান্তর থেকে ইতিমধ্যে মিলিয়ে গেছে ঘুমপাড়ানি গ্যাস। হেলিকপ্টারের ধ্বংসস্তূপটা জ্বলছে ধিকি ধিকি। টিফানির গাড়িটা থেমে গেছে বাড়ির সামনে এসে। সন্দেহ নেই, রেঞ্জের মধ্যে ওকে পাওয়ামাত্রই লক করেছে অ্যালি, বাধ্য করেছে আসতে। নইলে ক্র্যাশ করা হেলিকপ্টারটা দেখেই বিপদ আঁচ করার কথা ছিল টিফানির, উল্টো ঘুরে পালানো উচিত ছিল।

সিঁড়ি ধরে বারান্দা থেকে নেমে গেল ভেরোনিকা, শটগান তাক করে রেখেছে গাড়ির দিকে। অ্যালি গিয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। হেডলাইট নিভে গেল, বন্ধ হলো গাড়ির ইঞ্জিন। দরজা খুলে নেমে এল টিফানি। ভেরোনিকার দিকে দৃষ্টিপাত করল না, মাথা তুলে সরাসরি তাকাল অ্যালির দিকে।

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। সবকিছু স্থির হয়ে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালি আর টিফানি, পলক ফেলছে না। টিফানির চেহারা বেদনার্ত, ঝুলে পড়েছে দু'কাঁধ—পরাজিত ভঙ্গিমা। মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু অন্তরের ভাষায় যা বলছে, তা বুঝতে পারছে রানা পরিষ্কার। ক্ষমা চাইছে... দুনিয়ার সবচেয়ে নিখাদ ক্ষমাপ্রার্থনা, যেখানে কোনও অভিনয় নেই, কোনও ছলচাতুরি নেই, নেই কোনও লুকোছাপা। নিজের সমস্ত অপরাধবোধ আর অনুতাপ উজাড় করে দিচ্ছে টিফানি।

ভেরোনিকার চেহারায় বিভ্রান্তি ফুটতে দেখল রানা, পালা করে তাকাচ্ছে অ্যালি আর টিফানির দিকে। তার এই বিভ্রান্তির কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না। টিফানির ভাবনাগুলো পড়তে পারলেও অ্যালি সেগুলো কীভাবে নিচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছে না সে।

'কী হলো?' খানিক পর অধৈর্য গলায় বলে উঠল ভেরোনিকা। 'অপেক্ষা করছ কেন?'

জবাব দিল না অ্যালি।

দু'পা এগিয়ে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, দশ ফুট দূর থেকে তাকাল অ্যালির দিকে। পাশ থেকে দেখছে, কিন্তু তাও পরিষ্কার দেখল, চোখ ছলছল করছে মেয়েটার।

সিঁড়ি ধরে এক ধাপ উঠে এল ভেরোনিকা। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'এটাই তুমি চাইছিলে, অ্যালি। ও অনুতপ্ত কি অনুতপ্ত নয়, তাতে কিছুই যায়-আসে না। নাহয় মন থেকেই ক্ষমা চাইছে, তাতে ও যে-অন্যায় করেছে, তা মুছে যাচ্ছে

না।’

এবারও অ্যালি নিরুত্তর। ভেরোনিকার দিকে ফিরেও তাকাল না, তাকিয়ে আছে টিফানির দিকে।

‘অ্যালি!’ চেঁচিয়ে উঠল ভেরোনিকা।

এবার নড়ে উঠল মেয়েটা। যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। চোখের পাতা ফেলে দূর করল ছলছল ভাবটা। তারপর তাকাল ভেরোনিকার দিকে।

‘শাস্তি পেতেই হবে ওকে,’ কঠিন গলায় বলল ভেরোনিকা। ‘কোনও ক্ষমা নেই। ক্ষমা দেখানো মানে হেরে যাওয়া।’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যালি। এরপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। ‘ঠিক বলেছ।’

স্বস্তি ফুটল ভেরোনিকার চেহারায়। ‘কীভাবে সারতে চাও কাজটা?’

শটগানের দিকে ইশারা করল অ্যালি। ‘ওটা ওর হাতে দাও।’

ক্রূর হাসি ফুটল ভেরোনিকার ঠোঁটে। এগিয়ে গিয়ে টিফানির দিকে বাড়িয়ে ধরল শটগান। অস্ত্রটা ধরার কোনও চেষ্টা করল না টিফানি। এখনও অ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে সে, করুণা ভিক্ষা করছে।

হঠাৎ বদলে গেল সে। পিঠ সোজা হয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে ভেরোনিকার হাত থেকে নিয়ে নিল শটগানটা। জীবনে কোনোদিন আগ্নেয়াস্ত্র ধরেছে কি না সন্দেহ, অথচ অদ্ভুত এক সাবলীলতা দেখা গেল ওর মধ্যে। সেফটি অফ করে স্লাইড রিলিজ চাপল। অ্যাকশন খুলে দেখে নিল, ভেতরে শেল আছে কি না। এরপর এক ঝটকায় আবার বন্ধ করল অ্যাকশন, কক করল শটগান।

মুখে হাসি নিয়ে পিছিয়ে এসেছে ভেরোনিকা—টিফানির আশুমৃত্যুর কথা ভেবে পুলকিত। আচমকা ওর দিকে অস্ত্রটা

তুলল টিফানি, ট্রিগার চাপল। কান ফাটানো আওয়াজ হলো। বুলেটের আঘাতে উড়ে গেল ভেরোনিকার মাথার খুলির অর্ধেকটা। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ।

থামল না টিফানি। আবার কক করল শটগান। ব্যারেল এবার ঘুরে গেল অ্যালির দিকে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'এসব শেষ হওয়া দরকার,' ফিসফিসাল অ্যালি।

সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে পড়ল ও। দু'হাঁটু ভাঁজ করে নিয়ে এল বুকের কাছে, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মাথা গুঁজল হাঁটুর ওপরে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল টিফানি।

দুই লাফে সিঁড়িতে পৌঁছুল রানা। অ্যালির সামনে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। পিঠ মেলে দিয়েছে বর্মের মত। সিঁড়ির একপাশে সরে গেল টিফানি, রানার বুকের তলা দিয়ে গুলি করতে চাইছে অ্যালিকে। রানাও সরল, আবারও আড়াল করল মেয়েটাকে।

'থামো, অ্যালি!' বলল ও। 'এ-কাজ কোরো না। ছেড়ে দাও টিফানিকে।'

'সব শেষ হওয়া দরকার,' ভেজা গলায় বলল অ্যালি। 'আমি চাই এসব চিরতরে শেষ হয়ে যাক। আমাকে মরতে দাও, রানা।'

'না, অ্যালি। তোমাকে মরতে হবে না। সব এমনিতেই শেষ হয়ে গেছে।'

'কিছুই শেষ হয়নি, রানা। রয়ে গেছে অনেকে। বেঁচে থাকলে আমাকে খুঁজে বের করবে ওরা।'

'কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না। আমি সেটা দেখব—কথা দিচ্ছি। যতদিন বেঁচে আছি, তোমার কোনও ক্ষতি হতে দেব না। প্লিজ, এভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়ো না। অন্তত আমার জন্যে হলেও বেঁচে থাকো। আরেক

লুবনাকে আমি হারাতে পারব না কিছুতেই।'

কেঁপে উঠল অ্যালি, কাঁদতে শুরু করেছে। টিফানি থমকে গেল।

'প্লিজ, অ্যালি!' অনুনয় করল রানা। 'আমার জন্যে তুমি বাঁচতে পারবে না?'

ওকে জড়িয়ে ধরল অ্যালি। কাঁদছে শব্দ করে। রানারও চোখ ভিজে উঠল। পেছন থেকে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠল টিফানি, অ্যালির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল শটগান। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওদের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসে অ্যালির পাশে বসল। এবার রানাকে ছেড়ে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল অ্যালি। দু'জনেই কাঁদছে অঝোরে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল ওভাবে। কান্নার তোড় কমে এল অ্যালির, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে কেবল। টিফানির আলিঙ্গনে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল ও, যেন জ্ঞান হারিয়েছে।

সেলফোনের রিংটোন শুনতে পেল রানা—ডাইনিং রুমে বাজছে। ধরবে কি ধরবে না, দ্বিধায় ভুগল।

'আমি আছি ওর সঙ্গে,' নরম গলায় বলল টিফানি।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রানা। ডাইনিং রুমে গিয়ে রিসিভ করল কল।

'হ্যালো?'

'রানা? আমি ববি।'

'এদিকে সব ঠিক আছে, ববি...'

'দাঁড়াও, আগে আমার কথা শোনো,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তোমাকে বলতে বলেছেন, কেউ না আসা পর্যন্ত তোমরা যেন ফার্মহাউসে থাকো। ওকে? ওখান থেকে বেরিয়ো না। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।'

‘আর কিছু?’

‘না। আবার বলছি, ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ো না।’

‘এটাই মেসেজ?’

‘হ্যাঁ। টেক কেয়ার।’

লাইন কেটে গেল। ফোনটা পকেটে রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বারান্দায় ফিরল রানা। টিফানির বুকে অচেতনের মত পড়ে আছে অ্যালি, সেদিকে ফিরে তাকাল না। তার বদলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল বাড়ির চারপাশে।

‘রানা?’ ডাকল টিফানি।

জবাব দিল না ও। চোখ ছোট করে তাকাচ্ছে দূরে। পশ্চিমে, মাইলখানেক দূরে, একটা নিচু ঢালের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে একজোড়া হেডলাইট। সেটার পেছনে আরও দু'জোড়া আলো দেখা গেল—খানিকটা দূরে, কিন্তু সেগুলোও যে এদিকে আসছে, কোনও সন্দেহ নেই। পুবে তাকাল, ওদিকেও একই অবস্থা। আঁধারের গায়ে ফুটে উঠেছে সারি সারি আলো। সব মিলিয়ে ডজনখানেক গাড়ি ছুটে আসছে ফার্মহাউস লক্ষ্য করে, লক্ষণটা ভাল নয়।

‘আমাদেরকে এখান থেকে সরে যেতে হবে,’ থমথমে গলায় বলল রানা। ‘এক্ষুণি।’

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অ্যালিকে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল ও।

‘কেন?’ বিভ্রান্ত গলায় জানতে চাইল টিফানি।

‘শটগানটা নাও,’ বলল রানা। ‘গাড়িতে ওঠো। জলদি।’

ঝটপট সিঁড়ি ধরে নেমে গেল টিফানি, কুড়িয়ে নিল শটগানটা। এরপর এগোল গাড়ির দিকে।

‘প্যাসেঞ্জার সাইডে ওঠো,’ পেছন থেকে বলল রানা।

তা-ই করল টিফানি। ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসল। শটগানটা ঠেস দিয়ে রাখল কনসোলের সঙ্গে। নিচু হয়ে ওর কোলে অ্যালিকে তুলে দিল রানা। এরপর দৌড়ে

গিয়ে উঠল ড্রাইভিং সিটে। ইগনিশনে চাবি লাগানোই রয়েছে, মোচড় দিয়ে চালু করল ইঞ্জিন।

'কী হয়েছে, রানা?' ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল টিফানি।

'ববি মুরল্যাণ্ড ফোন করেছিল,' তাকে বলল রানা।

'তো?'

'সিলভারফিন বলেনি। ওটা আমাদের পরিচয়-সঙ্কেত।'

সাঁইত্রিশ

নিজের প্রিয় স্পটটায় দাঁড়িয়ে আছে চার্লটন। অফিসের জানালায়, ওঅর্কফ্লোরের ওপরে। অনুভব করছে চাপা উত্তেজনা।

পুরো ওঅর্কফ্লোর জ্যান্ত হয়ে উঠেছে আজ রাতে। বারোটা স্টেশনই চালু করা হয়েছে। লালচে আলোয় প্রতিটা স্টেশনের ভেতর শুয়ে আছে একজন করে কণ্ট্রোলার, মাথায় লাগানো ইলেকট্রোডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে যার যার সাবজেক্ট বা মার্ককে।

এক সপ্তাহ আগে সূচনা হয়েছে এই অপারেশনের—অ্যালেক্স লিয়ারির অনুরোধে। তিনটে অ্যান্টেনা সাইট থেকে একজন করে মার্ক বেছে নিয়েছে সব কণ্ট্রোলার, তাদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে ক্যানসাসের টোপেকায়। অপেক্ষা করতে বলেছে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল ও ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে। অপারেশনের এই অংশটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিল চার্লটন, কারণ অ্যান্টেনাগুলোর

রেঞ্জের বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে কণ্ট্রোলাররা, যতক্ষণ না ক্যানসাসের আকাশে বিমানযোগে পাঠানো হচ্ছে আরেকটা কণ্ট্রোল অ্যাসেট। ততদিন মুক্ত, স্বাধীন থাকবে মার্করা। মাথার ভেতর ভুতুড়ে কণ্ঠ শুনতে না পেয়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে তারা, অনির্দিষ্টকালের জন্যে অচেনা জায়গায় অপেক্ষা না-ও করতে পারে। কে জানে, কণ্ট্রোলারদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পালিয়েও যেতে পারে ওরা।

তবে সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছুই ঘটেনি। আধঘণ্টা আগে, কণ্ট্রোল অ্যাসেট জায়গামত পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন রি-এস্টাবলিশ হয়েছে মার্কদের সবার সঙ্গে। যেখানে থাকতে বলা হয়েছিল, সেখানেই অপেক্ষারত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদেরকে। একজনও এদিক-ওদিক যায়নি। গর্ব অনুভব করছে চার্লটন... বুনো প্রাণীকে পোষ মানাবার মত গর্ব।

মাঠের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে শেভি। ড্রাইভওয়ে ধরে মেইন রোডে পৌঁছুবার চেষ্টা করেনি রানা, ওদিকে শত্রুরা ওত পেতে থাকতে পারে। তার বদলে গাড়ি নিয়ে ফার্মহাউসকে পাশ কাটিয়েছে, ছুট লাগিয়েছে পেছনের মাঠের ওপর দিয়ে। হেডলাইট জ্বালেনি। চেষ্টা করছে ওদের ফার্মটার এলাকা পেরিয়ে পেছনের ফার্মটায় পৌঁছুতে। সেখানে বিকল্প রাস্তা পাওয়া যাবে মেইন রোডে ওঠার জন্যে।

দু'শো গজের মত নিরাপদে এগোল গাড়ি, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল। অন্ধকারে একটা গর্তে চাকা পড়েছিল, পরক্ষণে তুমুল গতির কারণে লাফ দিয়ে উঠে এসেছে। রানার মনে হলো, চারটে চাকাই শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে। মাটিতে নামার পর একদিকে এত বেশি কাত হয়ে গেল গাড়ি, প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। টিফানি তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল।

হেডলাইট জ্বেলে দিল রানা। অন্ধকারে ড্রাইভ করা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে। জোড়া আলোকরশ্মি সামনে ছুটে যেতেই দেখা গেল বড় বড় গাছের দীর্ঘ এক সারি—দুই ফার্মের মাঝে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িকে ডানে-বামে নিল রানা, আলো ফেলল ঘন বৃক্ষসারির বিভিন্ন জায়গায়... কিন্তু দৃশ্যমান কোনও ফাঁকফোকর পেল না যেখান দিয়ে ওদের শেভি সীমানা অতিক্রম করতে পারে।

শত্রুপক্ষের প্রথম গাড়িটা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ফার্মহাউসে। বাড়ির পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল ওটা, সোজা ছুটে এল শেভিকে লক্ষ্য করে। ওটার পিছু পিছু উদয় হলো আরও দুটো গাড়ি।

গাড়ির মুখ ঘোরাল রানা, মাঠের পশ্চিমপ্রান্ত লক্ষ্য করে ছুটল এবার। ওদিকে আরেকটা ফার্ম আছে, সেখানে উত্তরমুখী একটা রাস্তা থাকার কথা। শেভিকে দিক বদলাতে দেখে ধাওয়াকারীরাও মুখ ঘোরাল—কোনাকুনি পথে এগিয়ে আসছে পলাতকদের বাধা দিতে। রেঞ্জের মধ্যে পেতেই গুলি ছুঁড়ল একটা গাড়ির ড্রাইভার। সেটা উড়ে গেল শেভির ওপর দিয়ে।

মাথা ঘুরিয়ে চকিতে তাকাল রানা—আরও একটা গাড়ি যোগ হয়েছে প্রথম তিনটের সঙ্গে। বাকিগুলোও খুব পেছনে নেই, দেখা যাচ্ছে ওগুলোর আলোকরশ্মি। আবারও গুলি করা হলো ওদের উদ্দেশে... এবার একাধিক গাড়ি থেকে। তিনটে বুলেট ওদের নাগাল পেয়ে গেল, আঘাত করল সামনের একটা দরজায়, যেদিকে আরোহী বসে, তবে তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারল না।

'পায়ে হেঁটে চেষ্টা করলে কেমন হয়?' ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল টিফানির গলা।

'দু'মিনিটও টিকব না,' ওকে বলল রানা।

কোথাও থেকে আরেকটা গুলি হলো, বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। রানা শান্ত রইল, বিপদের সময় অস্থির হওয়া ওর স্বভাব নয়।

'মাথা নামিয়ে রাখো,' বলল ও। সামনেটা দেখার জন্যে ঝুঁকে আছে হুইলের ওপর, অতিরিক্ত চাপ পড়ায় গোঙাচ্ছে ইঞ্জিন। 'খোলা জায়গাটা যদি পেরিয়ে যেতে পারি, সামান্য সুযোগ আছে।'

অ্যালিকে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি হয়ে গেল টিফানি। আর তখুনি চিৎকার করে উঠল রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। সামনের উঁচু ঘাসগুলো কেমন যেন অন্যরকম। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল বিপর্যয়।

হঠাৎ করে নিচু হয়ে গেল গাড়ির নাক, যেন ডাইভ দিল নিচের দিকে। ফ্রন্ট এণ্ডের চারপাশে ছিটকে উঠল একরাশ পানি, ভিজিয়ে দিল উইণ্ডশিল্ড আর ছাত পর্যন্ত। নিজের অজান্তে চেঁচিয়ে উঠল টিফানি—অ্যালিকে নিয়ে সামনে ছিটকে পড়েছে সে। উইণ্ডশিল্ডের সঙ্গে নাক-মুখ ঠুকে যাচ্ছিল, রানা তড়িৎগতিতে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠেকাল ওকে।

ধাম করে এবার গাড়ির পেছনদিক আছড়ে পড়ল। আবারও পানি ছিটকাল। বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে শুরু করেছে নিচ থেকে, নৌকার মত দুলছে গাড়ি, তলাচ্ছে ধীরে ধীরে।

সোজা হয়ে চারদিকে তাকাল রানা। কাঁচের ওধারে উঁচু উঁচু ঘাসের ডগা, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, গ্রাস করে ফেলেছে একটা অগভীর ডোবাকে। স্বল্প আলোয় ডোবা আর ঘাসে ঢাকা জমির মাঝে পার্থক্য ধরতে পারেনি ও।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ডোবার তলা স্পর্শ করল শেভির চাকা। সাইড উইণ্ডোর মাঝ বরাবর উঠে এসেছে পানি। কেশে উঠে থেমে গেল ইঞ্জিন। নোংরা পানির ভেতর মিটমিট করছে হেডলাইটের আলো। শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে

রানা, ঘাসের ডগাগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষের আগুয়ান গাড়ির হেডলাইটে।

'কী করব আমরা?' ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল টিফানি। হ্যাণ্ডেল টেনে খুলতে চাইল দরজা, কিন্তু লাভ হলো না। পানির চাপ ঠেসে ধরে রেখেছে দরজাটাকে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শ্বাস ফেলছে অ্যালি। অচেতন অবস্থাতেই টিফানিকে জড়িয়ে ধরে আছে সে, শিশুর মত।

ঝুঁকে শটগানটা তুলে নিল রানা। গাড়ির সংকীর্ণ অভ্যন্তরে জিনিসটা নাড়াচাড়া করা মুশকিল। অস্ত্রটা কোলের কাছে আনার আগেই বাইরে ইঞ্জিনের আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠল। একটা গাড়ি এসে থামল ডোবার কাছে। দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

স্থির হয়ে গেল রানা। দৃষ্টি বিনিময় করল টিফানির সঙ্গে। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। রাতের নীরবতায় বিস্ফোরণের মত শোনাল শব্দটা। ঠক করে শেভির ছাতে বাড়ি খেল বুলেট, বাউন্স করে ছিটকে পড়ল বিশ ফুট সামনের পানিতে।

'নিচু হয়ে থাকো,' টিফানিকে বলল রানা। 'মাথা তুলো না।'

অ্যালিকে কোল থেকে নামাল টিফানি, শোয়াল পায়ের কাছে। এরপর নিজে ঝুঁকে গেল ওর ওপর।

আড়চোখে বাইরে তাকাল রানা, হেডলাইটের আলোয় একটা ছায়া নড়তে দেখল। রাইফেল রিলোড করতে করতে ডোবার কিনারে ঘুরছে আততায়ী, চলে আসতে চাইছে ওর পাশটায়, যাতে ভালমত লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে পারে।

শটগান কক করল রানা। সাবধানে জানালার কাঁচ একটু নামাল, যাতে পানি না ঢোকে গাড়িতে। ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বের করল শটগানের ব্যারেল। ঘাস সরিয়ে রাইফেলধারী দৃষ্টিসীমায় বেরিয়ে আসতেই ট্রিগার চাপল। লোকটার বুকে

লাগল গুলি, ছিটকে পেছনদিকে পড়ে গেল সে।

পরের ত্রিশ সেকেণ্ডে আরও কয়েকটা গাড়ি এসে থামল। তবে প্রথমজনের মত বোকামি করল না ওগুলোর আরোহীরা। আড়াল থেকে পজিশন নিতে শুরু করল। হতাশায় ঠোঁট কামড়াল রানা। সব শেষ হতে চলেছে। চারপাশ থেকে গুলি করে ওদেরকে খতম করবে খুনিরা।

ওর ধারণাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই প্রথম গুলিটা ছুটে এল উল্টোপাশ থেকে। বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল প্যাসেঞ্জার সাইডের উইণ্ডো। গলগল করে ডোবার গন্ধময় পানি ঢুকতে শুরু করল ওখান দিয়ে।

স্বপ্নের জগতে ভেসে চলেছে অ্যালি। শরীরে আরামদায়ক এক উষ্ণতা... রানার কাছে এলেই এমন অনুভূতি হয় ওর। অদ্ভুত ওই মানুষটা যেন পৃথিবীর সব মমতা নিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে ওকে। রানাই কি? বুঝতে চাইল ও। না, অন্য কেউ। আজ আরেকজন উদয় হয়েছে ওর জন্যে মমতা নিয়ে। টিফানি। সে-ই জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

টিফানির মমত্ব ভিন্ন এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে অ্যালির মাঝে। মনে পড়ে যাচ্ছে বহুদিন আগের স্মৃতি, যখন আরেকজন নারী ওকে এভাবে ধরে রাখত। অদ্ভুত এক প্রশান্তি পাচ্ছে ও, তার মাঝে হারিয়ে যেতে দিয়েছে নিজেকে। যা-খুশি ঘটুক, কিছু যায়-আসে না। এই ভালবাসা, স্নেহ আর মমতা পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই ওর...

হঠাৎ কুঁকড়ে গেল অ্যালি। উষ্ণতা মিলিয়ে গেছে মুহূর্তে, তার বদলে শরীরে শীতল স্পর্শ টের পাচ্ছে। চোখ পিটপিট করল, সামনে সব ঘোলা। পানিতে ডুবে গেছে ও। দুটো হাত খামচে ধরেছে ওর পোশাক, পানি থেকে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। চাপা গুমগুম আওয়াজ শুনতে পেল, যেন বিস্ফোরণ ঘটছে কাছে কোথাও।

টান খেয়ে পানি থেকে বেরিয়ে এল অ্যালি। সম্পূর্ণ সচেতন, চোখের পলকে পড়ে নিল রানা আর টিফানির মন। পরিষ্কার বুঝল, মরণফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা। বাইরে থেকে আবারও গুলির আওয়াজ ভেসে এল, এবার চুরমার হয়ে গেল পেছনের জানালার কাঁচ।

রানাকে অসহায় দেখাচ্ছে। হাতে শটগান থাকলেও সেটা কাজে লাগাতে পারছে না সে। বড় করে শ্বাস ফেলল অ্যালি, যা করার এবার ওকেই করতে হবে।

উইনচেস্টার রাইফেলের বোল্ট টানল জেফরি ফলসাম, খালি কেসিংটা ফেলে দিল ঘাসে, সেখানে ভরল নতুন একটা শেল। ডানে, দশ ফুট দূরে উপুড় হয়ে থাকা লোকটাও রিলোড করছে তার রাইফেল।

লোকটা অচেনা, তাকে আগে কোনোদিন দেখেনি জেফরি, তবে দু'জনেই যে একই পথের পথিক, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। শুধু ওরা দু'জন নয়, আরও জনাতিনেক অস্ত্রধারী লোক একইভাবে পজিশন নিয়েছে ডোবার ধারে। কয়েকটা গাড়ি এখনও এসে পৌঁছায়নি, দূরে সেগুলোর আলো দেখতে পেয়েছে জেফরি—নিঃসন্দেহে সেগুলোর আরোহীদেরও পরিচয় এক।

ওরা সবাই ভুতুড়ে কণ্ঠের ভৃত্য।

ব্যাপারটা আরও আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল জেফরির। মহাক্ষমতাবান ওই ভুতুড়ে কণ্ঠের মালিক স্রেফ একজনকে দাস বানিয়ে ক্ষান্ত দেবে কেন? তার জায়গায় ও থাকলেও আজ্ঞাবহ চাকরের বাহিনী গড়ে তুলত। কঠিন কাজে পাঠাত একাধিক লোক, যাতে ব্যর্থতার ভয় না থাকে। এখানে তা-ই ঘটছে।

একদিক থেকে এতজনের আগমন জেফরির জন্যেও ভাল বটে। মানুষ খুন করতে বেরিয়েছে, দলে ভারী হলে অপরাধের

দায়ও ভাগাভাগি হয়ে যায়। কে জানে, খুনটা হয়তো তাকে নিজ হাতে করতেই হবে না। তার হয়ে বাকিরাই সেরে দেবে কাজটা।

উইনচেস্টার তুলে কাঁধে ঠেকাল জেফরি। কক করে চোখ রাখল সাইটে। ডোবায় আটকে পড়া গাড়িটার একটা জানালা খুঁজে নিল। কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই বদলে গেল মনের ভাব। মাথা ঘুরিয়ে ডানের লোকটার দিকে তাকাল সে। কেন যেন অসহ্য লাগছে লোকটাকে, ঘৃণায় রি রি করছে দেহ।

জেফরির দৃষ্টি যেন অনুভব করল লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?'

'চোপ, শালা!' গাল দিয়ে উঠল জেফরি।

রাগে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ। উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে এল জেফরির দিকে। জেফরিও দাঁড়াল, ঘুরে মুখোমুখি হলো লোকটার।

'তোমার সমস্যাটা কী?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব না দিয়ে আচমকা নড়ে উঠল জেফরি। রাইফেলের বাট দিয়ে সরাসরি আঘাত হানল লোকটার মুখে। থ্যাচ করে বিজাতীয় একটা শব্দ হলো, নাক থেঁতলে গেছে লোকটার। গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। পেছনে উল্টে পড়ল সে। কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হলো না জেফরি, রাইফেল সোজা করে গুলি করল ভূপাতিত লোকটার বুকে। এক গুলিতে পরপারে পাঠিয়ে দিল তাকে।

'হচ্ছেটা কী?' খুব কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, ঘটনাটা দেখতে পেয়েছে সে।

পাঁই করে সেদিকে ঘুরল জেফরি, আরেকটা গুলি ছুঁড়ল কণ্ঠস্বরের উৎসের দিকে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এল ওখান থেকে। দূরে ঘাসের ভেতর থেকে দুটো ছায়াকে লাফিয়ে উঠতে দেখল জেফরি, বিপদ টের পেয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। দ্রুত রাইফেল রিলোড করে তাদের উদ্দেশে আরও

দুটো গুলি করল জেফরি। প্রথমটা মিস হলো, দ্বিতীয়টা আঘাত হানল একজনের কাঁধে। ছুটন্ত অবস্থায় আধপাক ঘুরে গেল লোকটা, আছড়ে পড়ল মাটিতে।

যেন পাগল হয়ে গেছে জেফরি, রক্তলাল চোখে তাকাচ্ছে প্রান্তরের দিকে। এগোতে থাকা গাড়িগুলো দেখে যেন মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। আবার রাইফেলে শেল ভরল, ঝুঁকে তুলে নিল নিহত লোকটার রাইফেল, এরপর দু'হাতে দুই রাইফেল নিয়ে উন্মাদের মত গুলি করতে থাকল গাড়িগুলোর দিকে।

ব্রেক কষে থেমে গেল গাড়িগুলো। আরোহীরা দরজা খুলে টপাটপ নেমে পড়ল, গাড়ির চেসিসের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল জেফরি, রাইফেলে গুলি ভরতে শুরু করল। জানে, একাকী এতজনের সঙ্গে পেরে উঠবে না, তাও হাল ছাড়ল না। কী যেন হয়েছে ওর। মনের ভেতর চেপে বসেছে তীব্র প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকতে ডোবার কাছ ঘেঁষতে দেবে না কাউকে।

আচ্ছন্নের মত টিফানির কোলে পড়ে আছে অ্যালি, কাদাপানির মাঝে। শঙ্কিতভাবে ওর শরীর চেক করছে টিফানি, দেখতে চাইছে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না, রানাও ঝুঁকে পড়েছে ওর ওপর; কিন্তু সেসব কিছুই টের পাচ্ছে না ও। ওর সমস্ত মনোযোগ এখন ডোবার কিনারের রাইফেলধারী লোকটার ওপর। তার সাহায্যে ঠেকাতে চাইছে হামলাকারীদের। যদি লোকটা খুন হয়ে যায়, তা হলে নতুন কাউকে খুঁজে নেবে।

হঠাৎ সচকিত হলো অ্যালি। রাইফেলধারী লোকটার মাথায় অদ্ভুত কী যেন রয়েছে। প্রথমে খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন টের পাচ্ছে। যেন একটা দ্বিতীয় দরজা... যে-দরজা দিয়ে ও লোকটার মাথায় অনুপ্রবেশ করেছে, তার চেয়ে আলাদা। দরজাটা খোলা। ওপারে কী আছে, জানে না অ্যালি। কিন্তু এ-জিনিস ও আগেও অনুভব করেছে, তবে কারও মাথার

ভেতরে নয়। অনুভব করেছে ইউটাহ্-র মরুভূমিতে... সেলফোনের সেই টাওয়ারটায় হাত রেখে!

দরজার ওপাশটা একটা সুড়ঙ্গের মত। মরুভূমির সুড়ঙ্গটা চলে গিয়েছিল মাটির তলায়, কিন্তু এখানকারটা লাফ দিয়ে উঠেছে ওপরে। আকাশের বুক চিরে চলে গেছে দূরে। সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল অ্যালি, যেন বুলেটের মত ওর দৃষ্টি ছুটে চলল ওটার দৈর্ঘ্য ধরে। এক পলকের জন্যে একটা বিমান দেখতে পেল ও, তারপরেই দেখা দিল নতুন একটা সুড়ঙ্গ। এটা আবার নিচে নেমে গেছে। দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটা অনেক লম্বা, বহুদূর গিয়ে মিলেছে প্রত্যন্ত এক জায়গায়।

মরুভূমির সেই সুড়ঙ্গের মাথায় একজন মানুষকে পেয়েছিল অ্যালি। তখন বোঝেনি তার অর্থ। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। ওর স্মৃতি ফিরে এসেছে। ও জানে, সুড়ঙ্গের অপরপ্রান্তে কারা বসে আছে... ওখানে বসে তারা কী করে বেড়ায়।

ঠোঁটের কোণে এক টুকরো নিষ্ঠুর হাসি ফুটল অ্যালির। এবার ওদেরকেই ওদের ওষুধের একটু স্বাদ দেয়া যাক।

জানালা থেকে ফিরে ডেস্কের কাছে গেল চার্লটন, লিয়ারিকে ফোন করবে, অনেকক্ষণ হলো তার তরফ থেকে কোনও খবর আসেনি... এমন সময় চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে এল ওঅর্কফ্লোর থেকে। তাড়াতাড়ি আবার জানালার কাছে ছুটে গেল সে।

নিচের একটা স্টেশন থেকে ভেসে আসছে চিৎকার, ওটা জেমস কারভার নামে এক কন্ট্রোলারের, তবে সে চেঁচাচ্ছে না। চেঁচাচ্ছে অল্পবয়েসী এক তরুণী অ্যাসিসটেন্ট, স্টেশনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কেন চেঁচাচ্ছে, তাও পরিষ্কার।

শুয়ে নেই কারভার, উঠে দাঁড়িয়েছে, কপাল থেকে খুলে ফেলেছে সব ইলেকট্রোড। সারা মুখ রক্তাক্ত, স্টেশনের লাল

আলোয় মনে হচ্ছে মুখে রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভূত। এক সেকেণ্ড লাগল রক্তের উৎসটা বুঝতে। শান্তভাবে, যেন বুঝেশুনে, আঙুলের নখ দিয়ে মুখে আঁচড় কাটছে কারভার। হাতের পেশি শক্ত হয়ে ওঠা দেখে বোঝা গেল, আঁচড়গুলো কাটছে সর্বশক্তিতে—তুলে আনছে চামড়া-মাংস... সৃষ্টি করছে গভীর ক্ষত। যেন নিজের মুখটাই খুবলে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করছে লোকটা।

হঠাৎ করেই যেন অ্যাসিসটেন্টকে দেখতে পেল কারভার। দু'চোখে ফুটে উঠল খুনে দৃষ্টি। মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল সে। উল্টো ঘুরে প্রাণপণে দৌড় দিল অ্যাসিসটেন্ট। তাকে ধাওয়া করল কারভার।

চার্লটন ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। অফিসের দরজা খুলে ল্যাণ্ডিঙে বেরিয়ে এল, একেক লাফে দু'তিনটা করে ধাপ পেরুল সিঁড়ির, কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর নেমে এল ওঅর্কফ্লোরে।

তরুণী অ্যাসিসটেন্ট এদিকেই ছুটে আসছে, তাকে পাশ কাটাল চার্লটন, পিছু পিছু ছুটে আসা কারভারকে লক্ষ্য করে রাগবি খেলোয়াড়ের মত ঝাঁপ দিল, তাকে জাপটে ধরে আছড়ে ফেলল মেঝেতে। হুঁক করে শ্বাস বেরিয়ে গেল কারভারের, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্যে অচল হয়ে গেল, সেই সুযোগে তার গায়ের ওপর চড়ে বসল চার্লটন। শরীর মোচড়াল কারভার, মুক্তি পেতে চাইছে, কিন্তু তাকে মেঝেতে আটকে রাখল সে।

'কী হয়েছে ওর?'

মুখ তুলল চার্লটন। নিজের স্টেশনের দরজায় বিস্মিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল শেফার্ড, প্রশ্নটা করেছে সে-ই।

জবাব দেবার আগেই অকস্মাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ল কারভার। মুহূর্তকাল পরেই যেন ফিরে এল বাস্তবে। টের পেল কী অবস্থা নিজের। ব্যথায় কাতরে উঠল সে, দু'হাত তুলে

চেপে ধরল ক্ষত-বিক্ষত মুখ।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল মাইকেল। মনে হলো সাহায্য করতে আসছে, কিন্তু থমকে গেল কয়েক কদম এগিয়ে। চোখের দৃষ্টি বদলে গেল তার। মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ওঅর্কফ্লোরের মাঝখানে, একটা চওড়া স্টিলের পিলারের ওপর। সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেল ওদিকে। সামনে গিয়ে পিলারটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে, ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো, মাথা দিয়ে কোনও কাঠের তক্তা ভাঙতে চলেছে একজন কারাতে মাস্টার।

আঁতকে উঠল চার্লটন। চেঁচাল, 'না, মাইকেল!'

কে শোনে তার কথা! ঊর্ধ্বাঙ্গ পেছনদিকে হেলিয়ে দিল মাইকেল, এরপর পেণ্ডুলামের মত মাথা দুলিয়ে সজোরে আঘাত হানল পিলারের গায়ে—কপাল নয়, পুরো মুখমণ্ডল দিয়ে। স্টিলের ওপর কপাল, নাক আর থুতনির সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ হলো, থেবড়ে গেল মুখটা। যখন সোজা হলো মাইকেল, তার সারা মুখে রক্তের ধারা বইছে। ব্যথাতুর কোনও আওয়াজ করল না সে, বরং আবারও পেছনে হেলালো দেহ... আবারও পুরো মাথা দিয়ে আঘাত করল পিলারের গায়ে। এবারের আওয়াজটা হলো ভেজা, ভোঁতা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল মাইকেল, রক্তমাংসের তালে পরিণত হওয়া চেহারা নিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

এবার বাকি সব কন্ট্রোলার বেরিয়ে এসেছে তাদের স্টেশন থেকে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ওঅর্কফ্লোরে কর্মরত অ্যাসিসটেন্ট আর টেকনিশিয়ানরা। জমে গেছে তারা, বিস্ফারিত চোখে মাইকেলের কাণ্ড দেখছে... কিন্তু কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না।

কারভারের গায়ের ওপর এখনও বসে আছে চার্লটন। মাইকেল পড়ে যেতেই তার দিকে ঘুরে গেল সবার চোখ, দৃষ্টিতে নীরব জিজ্ঞাসা। অসহায় বোধ করল চার্লটন, দেবার

মত কোনও জবাব নেই তার কাছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সবার মুখের দিকে পালা করে তাকাল... আর তারপরেই একটা পরিবর্তন এল তার মাঝে। চেহারা থেকে মুছে গেল অসহায়ত্ব, সেখানে দেখা দিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ। কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

কারভারকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চার্লটন। গলা চড়িয়ে বলল, 'এখান থেকে বেরিয়ে যাও সবাই। এক্ষুণি! এটা আমার হুকুম।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জটলার মাঝে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই, তাদেরকে চলে যেতে বলে যেন দয়া দেখিয়েছে চার্লটন। ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতর খালি হয়ে গেল ওঅর্কফ্লোর। গুরুতর আহত মাইকেল আর কারভারকেও সরিয়ে নিয়ে গেল। বিশাল বিল্ডিংটায় একা হয়ে গেল চার্লটন।

ঘুরে গেল সে। সিঁড়ি ধরে উঠে গেল তার অফিসের ল্যাণ্ডিঙে, যাতে ওপর থেকে পুরো ওঅর্কফ্লোরটা দেখতে পায়। নিচে নজর বোলাল সে, দৃষ্টি আটকে গেল দূর প্রান্তের একটা ছায়ার ওপর। জিনিসটা একটা ফিউয়েল ট্যাঙ্ক—ওখানে বিল্ডিঙের জেনারেটর ও ফার্নেস চালাবার জন্যে তরল জ্বালানি রাখা হয়। ট্যাঙ্কটা বিশাল—আঠারো চাকার ট্যাঙ্কার ট্রাকের ট্যাঙ্ক ওটা, সি-ফাইভ কার্গো বিমানে করে উড়িয়ে আনা হয়েছে। মোটা মোটা হোসের সাহায্যে বিল্ডিঙের হিটিং ও পাওয়ার সিস্টেমের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে ট্যাঙ্কটার।

সিঁড়ি দিয়ে আবারও নিচে নেমে এল চার্লটন। দৌড়াতে শুরু করল ট্যাঙ্কের দিকে। কাছে যেতে ভালমত দেখতে পেল হোসগুলো—ট্যাঙ্কের আউটফ্লো পোর্টের সঙ্গে হেভি-ডিউটি ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো। বিশ ফুট দূরে রয়েছে একটা ইউটিলিটি শেলফ। ওদিকে এগিয়ে গেল সে। তাক হাতড়ে খুঁজে নিল একটা রেঞ্চ, সেটা নিয়ে একটা হোসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রেঞ্চটা অ্যাডজাস্ট করে বসাল ক্ল্যাম্পের বোল্টে,

ঘোরাতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে ঢিলে হলো ক্ল্যাম্প, এক পর্যায়ে খুলে গেল হোসটা। আউটফ্লো পোর্ট দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে এল গ্যাসোলিন, আছড়ে পড়ল ওঅর্কফ্লোরের মেঝেতে। ঝাঁঝালো গন্ধে চার্লটনের নাক আর ফুসফুস জ্বালাপোড়া করে উঠল, চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল পানি। কোথায় যেন একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। কিন্তু কোনোকিছুর পরোয়া করল না সে, সংকল্পে অটল রইল।

হাত থেকে রেঞ্চ ফেলে দিয়ে উল্টো ঘুরল চার্লটন, হাঁটতে শুরু করল। ফিউয়েলের ধারায় পিঠ ভিজে গেল তার, অথচ সরে যাবার কোনও চেষ্টা করল না। ইতিমধ্যে মেঝের অনেকখানি ভিজে গেছে, গ্যাসোলিনের স্তর পড়ে গেছে... ধীরে ধীরে তরল গ্যাসোলিন ছড়িয়ে পড়ছে পুরো ওঅর্কফ্লোরে। ছপ্ ছপ্ করে সেই গ্যাসোলিন মাড়িয়ে এগিয়ে চলল চার্লটন। কাঁচঘেরা স্টেশনগুলো পেরুতে শুরু করল শীঘ্রি। প্রথম কয়েকটার দিকে ফিরে তাকাল না, তার গন্তব্য সে ঠিক করে ফেলেছে।

মাইকেলের স্টেশনের সামনে পৌঁছে একটু থামল চার্লটন, তারপর আবার পা বাড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। জানে, যা সে খুঁজছে, তা এখানে পাওয়া যাবে—একজন ধূমপায়ীর স্টেশনে। ছোট্ট কামরাটার কোনায় একটা ডেস্ক রয়েছে, সরাসরি ওটার কাছে চলে গেল সে। ঝুঁকে ওপরের ড্রয়ারটা খুলল। ভেতর থেকে উঁকি দিল এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা গ্যাস লাইটার।

কয়েক মিনিট পর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ওঅর্কফ্লোরের বিল্ডিং।

গোলাগুলি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে, আশপাশে হাজির হওয়া গাড়িগুলোর আওয়াজও মিলিয়ে গেছে ধীরে ধীরে।

কোনও এক বিচিত্র কারণে হামলা ও লড়াই থামিয়ে চলে গেছে অস্ত্রধারী লোকগুলো। অ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে রানা; বুঝতে পারছে, এসব ওরই কীর্তি। টিফানির কোলে ধ্যানমগ্নের মত পড়ে আছে মেয়েটা, কোথায়-কাকে বশ করছে কে জানে।

রহস্যটা টিফানিও আঁচ করতে পেরেছে। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'ও কি...'

'কোনও সন্দেহ আছে?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

ছপাৎ করে কাছে কোথাও ছিটকে উঠল পানি। কেউ একজন নেমে এসেছে ডোবায়। ঝট্ করে সোজা হলো রানা, শটগানের ব্যারেল বের করল ভাঙা জানালা দিয়ে। আর তখুনি চোখ খুলল অ্যালি।

'না, গুলি কোরো না,' বলে উঠল সে। 'ও আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।'

'কে?'

'যে আসছে।' নিঃশব্দে হাসল অ্যালি। 'রিল্যাক্স, রানা। বিপদ কেটে গেছে। এবার সত্যি সত্যি ব্যাপারটার ইতি টেনেছি আমি।'

'কীভাবে?'

জবাব দিল না অ্যালি। ওর মুখের হাসিটা চওড়া হলো কেবল।

'হ্যালো?' পুরুষকণ্ঠের ডাক ভেসে এল বাইরে থেকে। 'আপনারা ঠিক আছেন?'

'হ্যাঁ,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'কিন্তু কে আপনি? এখানে কী চান?'

'আমার নাম জেফরি ফলসাম। আমি আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি...'

আটত্রিশ

ওয়াশিংটন ডি.সি.। এক সপ্তাহ পর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর জন্যে উইলার্ড হোটেল যেন এক জীবন্ত ইতিহাস। একশো বছরেরও বেশি পুরনো এই হোটেলটা কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। বনেদি এই স্থাপনায় যেন-তেন কারও প্রবেশাধিকার নেই। বছরভর হোটেলটা মুখর হয়ে থাকে কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর প্রভাবশালী অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পদচারণায়। বিভিন্ন প্রয়োজনে উইলার্ড হোটেল তাঁদের প্রথম পছন্দ।

ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তার ব্যতিক্রম নন। অফিসের বাইরে লাঞ্চ-ডিনার সারতে হলে, কিংবা কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হলে তিনি উইলার্ড হোটেলে চলে আসেন। আজও এসেছেন। রেস্টুরেন্টের একটা টেবিল দখল করে নীরবে সারছেন দুপুরের খাওয়া।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন! হোয়াট আ নাইস সারপ্রাইয!'

উচ্ছ্বসিত একটা কণ্ঠ শুনে মুখ তুললেন অ্যাডমিরাল। মার্কিন সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে।

'গুড আফটারনুন, মি. সেক্রেটারি,' স্মিত হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'নাইস টু মিট ইউ।'

‘আপনি দেখছি একাকী লাঞ্চ করছেন,’ বললেন সেক্রেটারি। ‘আমি আপনার সঙ্গে বসলে কোনও আপত্তি আছে?’

‘কী যে বলেন, আপনার সঙ্গ পেলে আমি খুব খুশি হব।’

‘ধন্যবাদ।’

চেয়ার টেনে অ্যাডমিরালের মুখোমুখি বসলেন সেক্রেটারি। বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিলেন। এরপর বললেন, ‘আপনাকে এখানে দেখব, আশা করিনি।’

‘ভুল বললেন,’ নীরস কণ্ঠ অ্যাডমিরালের। ‘আমি যে এখানে প্রায়ই লাঞ্চ করি, সেটা সবাই জানে। সেজন্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছেন আপনি।’

চোখের পলকে কাঠিন্য ভর করল সেক্রেটারির গলায়। ‘কী বলতে চান?’

‘অভিনয় থামাতে পারেন, মি. সেক্রেটারি। আপনি কেন এসেছেন, আমি জানি। ইন ফ্যাক্ট, গত ক'দিন থেকেই আমি অপেক্ষা করছি, আপনি কখন যোগাযোগ করেন।’

‘কী বলতে চান?’

‘বলতে চাই যে, একটা বিশেষ প্রজেক্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ব্যাপারে জানা আছে আমার।’

‘জানেন?’ ক্রুদ্ধ দেখাল সেক্রেটারিকে। ‘তা হলে আর কথা ঘুরিয়ে লাভ কী? প্রশ্নটা সরাসরিই করি। মেয়েটা কোথায়?’

‘দুঃখিত,’ মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। ‘আমার জানা নেই। ইচ্ছে করেই খোঁজ নিইনি। বলা যায় না, পোষা মাইণ্ডরিডার দিয়ে আমার মাথা থেকে ওটা জেনে নিতে পারেন আপনি।’

‘তার কোনও প্রয়োজন নেই, অ্যাডমিরাল। আপনার পেট থেকে কথা বের করার আরও অনেক কায়দা জানা আছে আমার। এমন প্যাঁচে ফেলব, আপনার পরিচয়... আপনার

পজিশন... কোনোকিছুই কাজে আসবে না। রাষ্ট্রদ্রোহিতা খুব খারাপ একটা জিনিস। কী করেছেন আপনি, কোনও আইডিয়া আছে? জানেন, কত বড় ক্ষতি করেছেন দেশের?'

'এবারও ভুল বলছেন,' অ্যাডমিরাল নির্বিকার। 'আমি কিছুই করিনি, করেছে অ্যালিসন মিচেল নামের মেয়েটা। তাও দেশের ক্ষতি করেনি, করেছে আপনার ক্ষতি। মাইণ্ডরিডিং আর মাইণ্ড-কন্ট্রোলের যে-অবৈধ গবেষণা চালাচ্ছিলেন আপনারা, সেটার বারোটা বাজিয়েছে। সবগুলো অ্যান্টেনা সাইট বন্ধ হয়ে গেছে আপনাদের, কানাডিয়ান রকির কন্ট্রোল সাইট ধ্বংস হয়ে গেছে, এমনকী আপনাদের চিফ রিসার্চারও মারা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ও যতক্ষণ বেঁচে আছে, দ্বিতীয়বার প্রজেক্টটা চালু করতে পারছেন না আপনারা।'

রাগে ফুঁসতে শুরু করেছেন সেক্রেটারি। বললেন, 'আমার ক্ষতি? ওই প্রজেক্ট কীসের জন্যে চালানো হচ্ছিল বলে মনে হয় আপনার?'

'দয়া করে দেশের দোহাই দেবেন না। মানুষের ওপর অমানুষিক গবেষণা চালাবার অধিকার দেশ আপনাকে দেয়নি। মাইণ্ড-কন্ট্রোল বা মাইণ্ডরিডিঙের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বেলাতেও একই কথা খাটে।'

'নীতিকথা শোনাচ্ছেন আমাকে? এসব বুলি আউড়ে আপনি আর আপনার সাগরেদ মাসুদ রানা আমেরিকার ক্ষতি করবেন, আর আমরা সেটা বসে বসে সহ্য করব?'

'শুনে খুশি হবেন, কথাগুলো আমাদের কারও নয়, স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের। জী, ঠিকই শুনছেন। আপনাদের কীর্তি আমি তাঁকে জানিয়েছি, এবং সব শুনে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

থমকে গেলেন সেক্রেটারি। 'প্রেসিডেন্ট?'

'হ্যাঁ,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'তাঁকে না জানিয়ে আপনারা যে এমন একটা প্রজেক্ট চালাচ্ছিলেন, এটা তিনি

মোটেই সহজভাবে নেননি। আপনাকে পদচ্যুত করে লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে চেয়েছিলেন তিনি, শুধুমাত্র কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্যে তাঁকে নিবৃত্ত করেছি আমি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার কথা বললেন না? অভিযোগটা আমার বিরুদ্ধে নয়, বরং আপনার বিরুদ্ধেই উঠেছে।'

'আ... আমি রাষ্ট্রদ্রোহী?'

'অবশ্যই। আমেরিকার একটা টপ সিক্রেট স্যাটেলাইট নেটওঅর্কের নিয়ন্ত্রণ আপনি অবৈধভাবে তুলে দিয়েছিলেন একজন প্রাইভেট কন্ট্রাক্টরের হাতে। এর ফলে অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। দেশের স্বার্থ দেখেননি আপনি, বরং বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন মাতৃভূমিকে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়? অ্যান্টেনা সাইটের মাধ্যমে নিরপরাধ কিছু মানুষকে দিয়ে যা যা করিয়েছেন, সেসব নাহয় বাদই দিলাম।'

মুখের ভাষা হারালেন সেক্রেটারি। খাবার সার্ভ করার জন্যে বেয়ারা এসে পড়ায় অ্যাডমিরালও চুপ হয়ে গেলেন। লোকটা চলে গেলে মুখ খুললেন আবার।

'আপনার জন্যে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে পরিষ্কার কয়েকটা নির্দেশ আছে, মি. সেক্রেটারি। সেগুলো জানাব বলেই গত কয়েকদিন থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

'কী নির্দেশ?'

'প্রথমত, মাইণ্ডরিডিং এবং মাইণ্ড-কন্ট্রোলের এই গবেষণা চিরতরে থামাতে হবে আপনাকে। সেটা শুধু নীতির প্রশ্নে নয়, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেও। আপনাদের এই রিসার্চের ফলে যেসব মাইণ্ড-কন্ট্রোলার তৈরি হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। যে-কোনও মুহূর্তে আমেরিকার বিরুদ্ধেই ওরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। সেটা যদি না-ও হয়, শত্রু কোনও দেশ ওই রিসার্চ ডেটা চুরি করে নিজেরা মাইণ্ড-কন্ট্রোলার তৈরি করে বসতে পারে। তারচেয়ে এই গবেষণাকে আগে বাড়তে

না দেয়াই ভাল।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, অ্যাডমিরাল,' বললেন সেক্রেটারি। 'সাদার্ন অ্যাসোশিয়েটস্ বহুদিন আগেই একদল মাইণ্ড-কন্ট্রোলার তৈরি করেছে।'

'তারা এখনও শিশু, আপনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় নির্দেশটা ওদের ব্যাপারে। আমরা জানি, মাইণ্ড-কন্ট্রোলের ক্ষমতা অবদমিত করে রাখার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, অ্যানিমেল টেস্টিঙে তাতে সাফল্যও পাওয়া গেছে। কাজেই প্রেসিডেন্ট চান, বাচ্চাগুলোকে জিনেটিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন আপনারা। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করবেন, আর কখনও কোনও মাইণ্ড-কন্ট্রোলার তৈরি করবেন না। যদি রাজি থাকেন, তা হলে কোনও অ্যাকশন নেয়া হবে না আপনার বা আপনার সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে।'

চোয়াল শক্ত হলো সেক্রেটারির। 'দিস ইজ ব্ল্যাকমেইল। এভাবে প্রগতি ঠেকানো যায় না। জিনেটিক্স নামক প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলে গেছে, এখন সেটার ডালা বন্ধ করার কোনও কায়দা নেই।'

'না থাকুক, কিন্তু বাক্স থেকে অশুভ কিছু বেরুলে সেটাকে তো ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারি আমরা!'

'ব্ল্যাকমেইল করে?' হাসলেন সেক্রেটারি। 'আজ নাহয় আমাকে বেকায়দায় পেয়েছেন, কিন্তু অন্য কেউ যদি কাজটায় হাত দেয়, তাকে কীভাবে থামাবেন?'

'সে-ব্যবস্থা তো আছেই,' হেঁয়ালির সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

এক সেকেণ্ড লাগল কথাটার অর্থ বুঝতে। এরপর তিক্ত স্বরে সেক্রেটারি বললেন, 'অ্যালিসন মিচেল?'

'হ্যাঁ। ও মাঠে থাকছে। জিনেটিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ওর ক্ষমতা কেড়ে না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আপনি বা

আপনার সঙ্গীরা যদি প্রেসিডেন্টের নির্দেশগুলো না মানেন, গোপনে কিছু করার চেষ্টা করেন, ও জানতে পারবে। ভাগ্যক্রমে যদি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনও মাইণ্ড-কন্ট্রোলার তৈরিও করেন, অ্যালি তাকে ঠেকাবে।'

'আর আপনার ধারণা, কেউ ওর নাগাল পাবে না?'

'না। কারণ অ্যালি এখন আর একা নয়। খুব যোগ্য একটা ফার্ম ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে—রানা এজেন্সি। ওরা তাকে লুকিয়ে রাখবে, প্রয়োজনে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবে।'

'রানা এজেন্সি!' চোয়াল ঝুলে পড়ল সেক্রেটারির। 'আপনারা বিদেশি একটা ফার্মের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়েছেন?'

'স্বদেশি এজেন্সিগুলোর ওপর যদি ভরসা করা না যায় তো কী আর করা! তা ছাড়া আমরা আসলে এজেন্সিটার হাতে নয়, রানার হাতে অ্যালির দায়িত্ব দিয়েছি। ওকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়, মেয়েটাকে ও কখনোই কারও স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার হতে দেবে না। ইতিমধ্যে সে-প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অ্যালিও ওকে বিশ্বাস করে।'

'কাজটা আপনারা ভাল করলেন না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন সেক্রেটারি। 'যদি ভেবে থাকেন, মুখ বুজে সব মেনে নেব আমি...'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে এখুনি সাবধান করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি, মি. সেক্রেটারি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'মাসুদ রানা, অ্যালিসন মিচেল অথবা ডা. টিফানি ক্যানট্রেলের গায়ে যদি ফুলের টোকাও পড়ে, তার জন্যে আপনাকে দায়ী করা হবে। কাজেই মুখ বুজে সব মেনে নেয়াই আপনার জন্যে মঙ্গল।'

দাঁত কিড়মিড় করলেন সেক্রেটারি।

'আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,' তাঁকে বললেন

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'নিকুচি করি খাবারের!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সেক্রেটারি। ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল চেয়ার। সেদিকে ফিরে তাকালেন না। উল্টো ঘুরে হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন। বেরিয়ে গেলেন রেস্টুরেন্ট থেকে।

বেয়ারা ছুটে এসেছে আওয়াজ শুনে। চেয়ার ওঠাতে ওঠাতে জিজ্ঞেস করল, 'এনি প্রবলেম, অ্যাডমিরাল? উনি কিছু না খেয়ে এভাবে চলে গেলেন কেন?'

'হঠাৎ করে বদহজম হয়েছে ওঁর,' মুচকি হেসে বললেন হ্যামিলটন। 'সহজে ওটা সারবে বলে মনে হয় না।'

ক্যানসাস থেকে ওকলাহোমা-গামী ইন্টারস্টেট ৩৫-এর পাশের একটা নির্জন মোটেলের সামনে ঠিক রাত দুটোয় থামল একটা সাদামাটা চেহারার টয়োটা সেডান। ভেতরে দু'জন আরোহী। মোটেলের দিকে ফিরে সাঙ্কেতিক ভঙ্গিতে দু'বার হেডলাইট জ্বালল-নেভাল ড্রাইভার। কয়েক মুহূর্ত পরেই খুলে গেল মোটেলের একটা কামরার দরজা। তিনটে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল সেখান দিয়ে। রানা, অ্যালি আর টিফানি।

গত সাতদিন ধরে চলার ওপর রয়েছে ওরা। রাত নামলে থামছে কোনও হোটেল বা মোটেলে। আজ যেমন এখানে থেমেছে। তবে এ-ই শেষ। আজ রাতের পর এমন অনিশ্চিতভাবে ছোটাছুটি থামতে চলেছে ওদের।

স্বাভাবিক পদক্ষেপে টয়োটার দিকে এগিয়ে গেল তিনজনে। গাড়ির দুই আরোহীও নেমে পড়েছে ততক্ষণে। কাছে যেতেই সম্মান জানাল রানাকে।

'কেমন আছ তোমরা?' বলল রানা। 'আশা করি, ওদিককার খবরাখবর সব ভাল? রেডিয়োতে কোডেড মেসেজ পাঠিয়েছে ববি, তাই তোমাদেরকে খবর দিলাম।'

'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' জানাল ড্রাইভার।

‘এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,’ বলল রানা। ‘এ হলো অ্যালি, আর ইনি ডা. টিফানি ক্যানট্রেল। অ্যালি-টিফানি, এরা হলো...’

‘আমি জানি,’ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল অ্যালি। ‘বিপুল ওসমান আর গালিব হোসেন—তোমার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অপারেটর। সেই সঙ্গে বিসিআই এজেন্টও বটে।’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বিপুল আর গালিব। এরপর বিপুল বলল, ‘ওরেব্বাপরে, ওর সম্পর্কে যা শুনেছি, তা দেখছি একবিন্দু মিথ্যে নয়।’

গালিব হাসল। বলল, ‘কেমন আছ, অ্যালি? আমাদের সঙ্গে যেতে কোনও আপত্তি নেই তো?’

‘না, আপত্তি নেই,’ বলল অ্যালি। ‘তোমরা খুব ভাল, আমি বুঝতে পারছি। রানা খুব ভরসা করে তোমাদের ওপর।’

রানার দিকে তাকাল টিফানি। দুখী গলায় বলল, ‘তা হলে সত্যি সত্যি আলাদা হয়ে যাচ্ছি আমরা?’

‘হ্যাঁ,’ রানা বলল। ‘তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই এ-ব্যবস্থা। বিপুল আর গালিব তোমাদেরকে নিরাপদ কোনও জায়গায় নিয়ে যাবে, নাম-ধাম পাল্টে লুকিয়ে রাখবে। কোথায়, সেটা ওরা ছাড়া কেউ জানবে না... আমিও না। কাজশেষে অ্যালি ওদেরকেও ভুলিয়ে দেবে সব। একমাত্র এভাবেই তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।’

‘জানি।’

‘সরি, বাকি জীবন সম্ভবত গা-ঢাকা দিয়ে কাটাতে হবে তোমাদেরকে।’

‘তাতে কোনও সমস্যা নেই।’

‘সারাজীবনের জন্যে বাঁধা পড়তে চলেছ অ্যালির সঙ্গে। আপত্তি নেই তো?’

‘প্রশ্নই ওঠে না, রানা। আমার কারণে যাকে হারিয়েছে ও, তার জায়গা পূরণ করা তো আমারই দায়িত্ব! যদিও জানি না,

ওর মায়ের অভাব কোনোদিন পূর্ণ করতে পারব কি না।'

'কেউ যদি পারে তো সেটা তুমি,' দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলল রানা। 'ওকে তুমি কতটা ভালবাসো, তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

'আমি জানি,' বলে উঠল অ্যালি।

হাসল রানা। 'তা তো বটেই।'

'অ্যালি,' টিফানি বলল, 'রানাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল অ্যালি। 'কারণ রানাকে ছেড়ে যাচ্ছি না আমরা। যত দূরে যাই... যেখানেই যাই... ও কোনও না কোনোভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল রানার। ঝুঁকে অ্যালিকে জড়িয়ে ধরল ও।

গলা খাঁকারি দিল বিপুল। 'আমাদেরকে রওনা হতে হয়, মাসুদ ভাই। অনেক দূর যেতে হবে।'

কপালে চুমো খেয়ে অ্যালিকে আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিল রানা। টিফানির গালেও চুমো খেল। বলল, 'ভাল থেকো। কখনও আমাকে প্রয়োজন মনে হলেই ফোন কোরো রানা এজেন্সির যে-কোনও ব্রাঞ্চে। ছুটে চলে আসব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যালি আর টিফানি। বিপুল আর গালিবের পিছু পিছু উঠে পড়ল গাড়িতে। জ্যান্ত হয়ে উঠল টয়োটার ইঞ্জিন, হেডলাইট জ্বলে উঠল। জানালার কাঁচে দু'হাত ঠেকিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে অ্যালি। এতক্ষণ হাসিখুশি থেকেছে, কিন্তু হঠাৎ করে চোখ ছলছল করছে ওর।

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা,' মাথার ভেতর ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

◆◆◆

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ আনিস-উজ-জামান (সাজিদ)
২৬৬ মেরাদিয়া, ঢাকা ১২১৯। মোবা: ০১৯০৯-৯৮৭৭৯৫

আমার কয়েকটি প্রশ্ন মাসুদ রানার কাছে, আপনি রানার থেকে জেনে নিয়ে আমাকে জানাবেন। আচ্ছা, স্যর, রডরিক, ল্যাম্পনির কথা কিংবা রানার ফিশিং বোট জলকুমারীর কথা (*আই লাভ ইউ, ম্যান* উপন্যাস) রানার মনে আছে কি? রডরিক সব সময় রানাকে বলত: 'আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের মতই তোমাকে ভালবাসি।' বা রানার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিছুটা ধাপ্পাবাজ-ঠকবাজ অথচ রানার অসাধারণ ভাল বন্ধু মাইকেল (*মুক্ত বিহঙ্গ*)—ওর কথা কি রানা কখনও কোনও বিষণ্ন সন্ধ্যায় ভাবে? বা রানার সীমাহীন ভাল বন্ধু, যে পাগলা শেয়ালের কামড়ে (জলাতঙ্ক হয়ে) মারা যায় (*দংশন*)—ওর কথা কি কখনও গভীর রাতে রানার মনে পড়ে? কিংবা *জলরাক্ষস*-এ যে ভিলেন ছিল, পরে বন্ধু হয়ে যায়, তার কথা ভেবে কি রানার চোখে দু'ফোঁটা পানি আসে?

আর একজনের কথা বলছি। রানা কি হাজার তারার মাঝে সেই বড় তারাটা দেখতে পায়? তাকে কি এখনও কেউ বলে—ঘুমিয়ে পোড়ো না, বন্ধু? সেই কোকিল কি এখনও ডাকে? ফুলের গন্ধে ভারী বাতাস কি এখনও তার দেহ জড়িয়ে ধরে? হ্যাঁ, অসাধারণ সেই কিশোরী, ভাল মেয়ে লুবনা (*অগ্নিপুরুষ*)—তার কথা বলছি, যে ভীষণ সুন্দর গানটা রানাকে শুনিয়েছিল—তার কথাও কি রানা বর্তমানে দু'দণ্ড ভাবে?

❋ অবশ্যই ভাবে। মানুষ যখন, এ থেকে রানার মুক্তি নেই। তবে এই পৃথিবীতে ওদের মত আরও মানুষ নিশ্চয়ই আছে। সারা দুনিয়ার অলিতে গলিতে ও এখনও তাদের খুঁজে বেড়ায়।

আপনার সুন্দর চিঠিতে এত সুন্দর একটা মনের ছবি ফুটে উঠেছে

যে, বার বার পড়েছি ওটা। যতবার পড়েছি, ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার এ. এ. নোমান
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

মাসুদ রানা, এক কিংবদন্তীর নাম! ঠিক কবে প্রথম মাসুদ রানা পড়ি তা এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। *জাপানি ফ্যানাটিক* পড়ে যে মুগ্ধতার, মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা আজও অমলিন। শৈশব থেকে কৈশোর, এখনও এই তরুণ বয়সে মাসুদ রানার নতুন বই হাতে নিলে যে শিহরন অনুভব করি তার তুলনা নেই। চির যুবক, চির তরুণ মাসুদ রানার স্রষ্টা আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনও পরিসীমা নেই, তাঁর কল্যাণেই আমরা পরিচিত হয়েছি মায়াবী চোখের সেই যুবকের সাথে যে কাছে টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না! জয়তু মাসুদ রানা।

❋ আপনার ভালবাসার চিঠি আমার বাকি জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। দোয়া করি, আপনার ওই শিহরন যেন মাসুদ রানা ছাড়িয়ে আরও অনেক ভিন্নধর্মী মন-ছোঁয়া বইতেও ছড়িয়ে পড়ে।

মোহতাসিম হাদী রাফী
পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর

শক্তি দাও, বিধাতা, অনন্ত কাল ধরে জ্বলছে হৃদয়
হয়তো কেউ বোঝে না কত সত্য এ প্রণয়

মাসুদ রানার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রাইমারি থেকে হাইস্কুলে ওঠার এক মাহেন্দ্রক্ষণে। তারপর একসঙ্গে কখনও বা আমেরিকা থেকে রাশা, আবার কখনও ইজরায়েল থেকে বাংলাদেশ। একসঙ্গে ছুটে চলা আর কখনও শেষ হয়নি। কখনও যেন না হয় সে প্রার্থনাই চিরকাল অন্তরে গেঁথে রাখি। এ প্রণয় যে বড় শক্ত হয়ে বুকে গেঁথে আছে। প্রাইমারি থেকে হাইস্কুলে ওঠা একটা বাচ্চার একটা বইয়ের কাছে কী-ই বা দাবি থাকতে পারে? কোনও দাবি ছিল না। তবুও যেন অনেক দাবি, অনেক আবদার মিটে গেছে। মাসুদ রানার সঙ্গে থেকে থেকে সেই বাচ্চাটা কীভাবে যেন শিখে গেছে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা কী। এখন সেই বাচ্চাটা হাইস্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলেছে, ক'দিন পরই কলেজে উঠবে। এখনও কোনও দাবি নেই, কোনও আবদার নেই। জানে, না চাইতেই সব মিটে যাবে। ভাল থাকুক মাসুদ রানা। ভাল থাকুন তার স্রষ্টা। ধন্যবাদ, কাজীদা।

❋ একটি কিশোর তার তারুণ্যে পৌঁছেই এত সুন্দর করে মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করবে, আমার জন্যে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তুমি অনেক বড় হবে, ভাই। দোয়া রইল।

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

ডার্ক মেডিউসা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: কাজী মায়মুর হোসেন

গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে ছোট্ট ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে
জড়িয়ে গেল রানা আর্ট গ্যালারির নৃশংস ঘটনায়।
তাতে পেল ইতালির মানুষের অঢেল ভালবাসা।
জানত না, ঠিক পরদিনই পরিণত হবে ও খলনায়কে!
প্রশ্ন হলো: রানা যদি না করে থাকে তা হলে
কে খুন করল ইতালির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে?
ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স?
কেন দুর্ধর্ষ এসএএস মেজর নোরা গোল্ডফিল্ডকে
ওর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা?
কী চায় ওর কাছে নিষ্ঠুর রাশান মাফিয়া ডন? সার্বক্ষণিক
তাড়া ও গুলি খেয়ে আহত, মহাবিরক্ত রানা
এখন জানতে চায়, কী কারণে মরিয়া হয়ে
ওকে খুন করতে চাইছে এরা! কয়েকটি
দেশের সশস্ত্র পুলিশ, দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ মেজর ও ভয়ঙ্কর
রাশান মাফিয়ার বিরুদ্ধে একা
কতটুকু করতে পারবে ও?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা'র বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই পোস্ট যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/১/১৯ দস্যুর সমাধি+আকাশদস্যু+ভৌতিক মুখোশ+
জমিদারবাড়ি হত্যা-রহস্য+ভয়াল দ্বীপে তিন গোয়েন্দা
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৪৮) শামসুদ্দীন নওয়াব

দস্যুর সমাধি: ওই অবোধ শিশুর মত বৃদ্ধ আসলে কে? কেন বলে সাগরে তলিয়ে যাওয়া জাহাজের কথা? তদন্তে নামল কিশোর, মুসা ও রবিন। সব বাধা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা দস্যুদের সমাধির ভেতর!

আকাশদস্যু: হিমালয়ের দুর্গম এক উপত্যকায় আচমকা উদয় হচ্ছে পুরানো, ভুতুড়ে এক বিমান। ফলে, নিখোঁজ হচ্ছে বৈমানিক, লাপাত্তা হচ্ছে উড়োজাহাজ। ডাকোটা প্লেনে চেপে হিরু চাচার সঙ্গে রহস্যের তদন্ত করতে চলল তিন গোয়েন্দা এবং শামিল হলো রুদ্ধশ্বাস অভিযানে।

ভৌতিক মুখোশ: ভৌতিক এক মুখোশ বশ করতে চাইছে মুসাকে। ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছে নানান অপকর্ম। রুখে দাঁড়াল মুসা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। পাশে পেল প্রিয় দুই বিশ্বস্ত বন্ধু কিশোর ও রবিনকে।

জমিদারবাড়ি হত্যা-রহস্য: হত্যাকাণ্ড ঘটেছে লুনেনবার্গ ম্যানরে। খুনী ধরাছোঁয়ার বাইরে। তদন্তে নামল কিশোর। ধূর্ত হত্যাকারীকে যেভাবে হোক দাঁড় করাবে বিচারের কাঠগড়ায়। ক্রমেই জড়িয়ে গেল ও জটিল এক রহস্যে।

ভয়াল দ্বীপে তিন গোয়েন্দা: কে বা কারা দিল ওই অদ্ভুত ধাঁধা! পুরাকীর্তি লুঠেরা দল স্ফিঙ্কস্, বদমাশ শুঁটকি টেরি না তৃতীয় কোনও পক্ষ? কী রহস্য বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে মাকাটাও দ্বীপ! ওখানে গেলে ফেরে না কেন কেউ? হাজারো বিপদ ডিঙিয়ে পাতাল-গুহায় ঢুকে তিন গোয়েন্দা বুঝল, এবার বুঝি মরতেই হচ্ছে ওদেরকে!

আরও আসছে

২৭/১/১৯ রহস্যপত্রিকা (৩৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা) ফেব্রুয়ারি, ২০১৯